এপার ওপার

রূপক সাহা

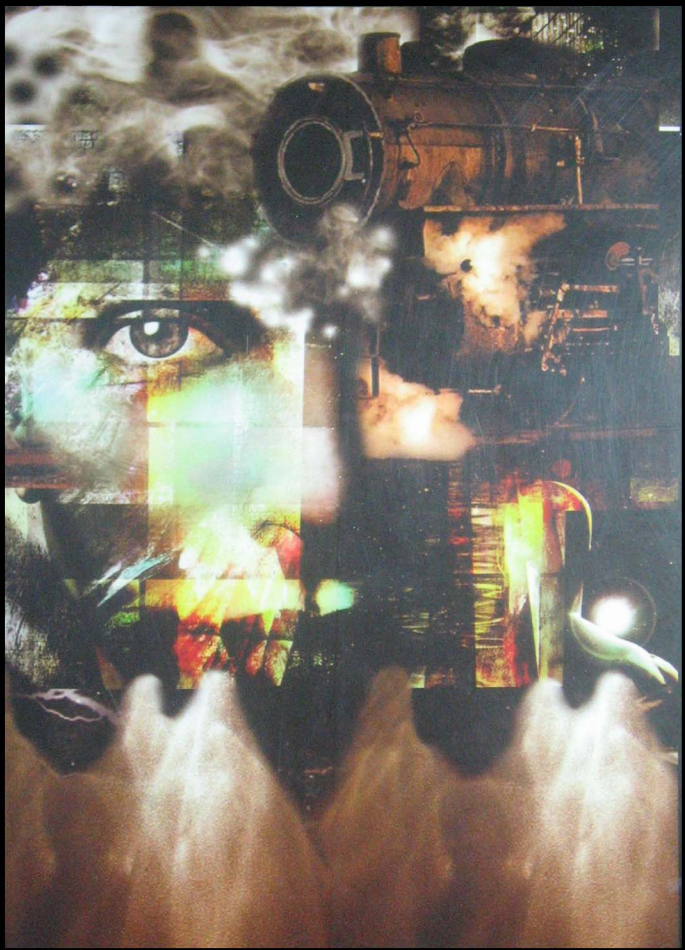

এপার ওপার

রূপক সাহা

সপ্তর্ষি প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ | জানুয়ারি ২০১৪
গ্রন্থস্বত্ব | লেখক
প্রচ্ছদ | প্রণব রায়

অক্ষরবিন্যাস | অ্যাডওয়েভ কমিউনিকেশন ৯৮৩০৫ ৭২৫৫৮
প্রকাশক | স্বাতী রায়চৌধুরী
সপ্তর্ষি প্রকাশন
৫১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রক | সিদ্ধেশ্বরী কালিমাতা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র | ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট। কল ৭০০ ০০৯
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কল ৭০০ ০৭২
ও যোগাযোগ | চলভাষ : ৯৮৩০৩ ৭১৪৬৭
ই-মেল saptarshiprakashan@hotmail.com
ওয়েবসাইট www.saptarshiprakashan.com
www.clickforboi.in

সপ্তর্ষি-র বই পাবেন | দে'জ, দে বুক স্টোর, বুকফ্রেন্ড,
চক্রবর্তী অ্যান্ড চ্যাটার্জি, নব গ্রন্থ কুটির, বলাকা (কলেজ স্ট্রিট)
বুকস্, নিউ সেন্ট্রাল বুক হাউস (শিলিগুড়ি),
পুস্তকমহল (ভুবনডাঙা, শান্তিনিকেতন)
মুক্তধারা (গোলমার্কেট, নিউদিল্লি ১)

বিমলেন্দুবিকাশ সাহা-কে

১

জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। হাসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের ভিতরেই সেটা টের পাচ্ছিল পাণ্ডু। বাইরে বেরতেই ঠান্ডা বাতাস এসে ওর মুখে ঝাপটা মারল। ডাক্তারদের চেম্বার প্রায় একশো গজ দূরে। অন্যদিন করিডোর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে ও চেম্বারে চলে যায়। নাইট ডিউটি থাকলে অন্তত বার কয়েক তো ওকে বেরোতেই হয় রোগীদের দেখার জন্য। কিন্তু আজ করিডোরের এক পাশে বেশ কয়েকজন অসুস্থ মানুষ কম্বল গায়ে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। সকাল থেকে একের পর এক রোগী এসেছে। দুপুরের মধ্যে বেড সব ভর্তি। জায়গা দিতে না পেরে সুপার সাহেব শেষ পর্যন্ত কুড়ি-বাইশ জনকে করিডোরে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের অনেককে স্যালাইন দিতে হচ্ছে।

কাল রাতে আদিবাসীদের মহল্লায় কী যেন একটা পরব ছিল। ডিউটি করতে এসে পাণ্ডু অনেক রাত পর্যন্ত মাদলের শব্দ শুনেছে। পরবে সারা রাত্তির ধরে নাচ গান চলে। চোলাই মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে মরদগুলো। মদে বোধ হয় বিষাক্ত কিছু মেশানো ছিল। সকাল থেকে অর্ধচেতন মরদগুলোকে নিয়ে এসে ভর্তি করছে তাদের পরিবারের লোকজন। দুপুরে পাণ্ডু শুনেছে, একজন ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছে। মা-বউদের কান্নার রোল হাসপাতালের কোয়ার্টারে বসেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিকেলের দিকে জেলার হেল্‌থ অফিসার একবার হাসপাতাল ঘুরে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন, চিকিৎসার যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

করিডোরের দু'পাশটা কাল পর্যন্ত ফাঁকা ছিল। ঠান্ডায় যাতে রোগীরা কষ্ট না পায়, তার জন্য আজ তেরপল দিয়ে খানিকটা অংশ ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন সুপার সাহেব। তাই কনকনে ভাবটা নেই। মাফলারটা গলায় ভালোভাবে জড়িয়ে করিডোর দিয়ে খুব সাবধানে হাঁটতে লাগল পাণ্ডু। যাতে কোনও রোগীর গায়ে পা না লাগে। রাত প্রায় দশটা বাজে। পুরো হাসপাতাল এখন নিঝুম পুরী। আজকাল সন্ধে সাতটা থেকেই অবশ্য পুরো হাসপাতাল চত্বর শুনশান হয়ে যায়। কেননা, তার পর বহিরাগত কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। মেন গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। হাসপাতালে কিছুদিন আগে রাতের দিকে দু'টো বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এক, রোগিনীর উপর বলাৎকার। দুই, প্রসূতি বিভাগ থেকে সদ্যোজাত শিশু চুরি। তার পর থেকে সুপার সাহেব অনেক সাবধান হয়ে গিয়েছেন। নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

করিডোরে হলুদ আলোর বাল্ব লাগানো রয়েছে বেশ খানিকটা তফাতে। আলোগুলো সিলিং থেকে ঝুলছে। হাওয়ায় দুলছে বলে করিডোরে আলো-ছায়ার খেলা দেখতে পেল পাণ্ডু। নোনাধরা দেওয়াল। তার উপর চুনকাম করা। কত রহস্যময়

আঁকিবুকি তাতে। হাসপাতালটা সেই ইংরেজ আমলের। প্রায় একশো বছরের পুরোনো। কুড়ি একর জমির উপর তৈরি। গোটা ছয়েক বড়ো বড়ো ওয়ার্ড। সেই সঙ্গে ডাক্তার আর নার্সদের আলাদা কোয়ার্টার। পুরো হাসপাতাল চত্বর গাছ-গাছালিতে ভর্তি। মাইল দেড়েক দূরে বড়ো রেলওয়ে জংশন। ইংরেজরা নাকি এই শিসপাহাড়ি জায়গাটাকে এই কারণেই বেছে নিয়েছিলেন হাসপাতালের জন্য। যাতে ট্রেনে করে ওড়িশার নানা প্রান্ত থেকে পেশেন্ট আসতে পারে।

মেদিনীপুর সদর হাসপাতাল থেকে পাণ্ডু যখন প্রথম এখানে আসে, তখন ওর কান্না পেত। সন্ধের পর এত নির্জন জায়গাটা। কিন্তু, এখন ও অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। ও ঠিক করেছে, যতদিন চাকরি করবে এই শিসপাহাড়িতেই থাকবে। যাবেই বা আর কোথায়! সাত কুলে কেউ নেই। বিধবা মা ওকে মানুষ করেছিলেন। মেদিনীপুরে থাকার সময়ই তিন দিনের জ্বরে তিনি মারা যান। সত্যি কথা বলতে কী, মা চলে যাওয়ার পর মেদিনীপুরে আর মন টেকেনি পাণ্ডুর। নিজেই তদবির করে এমন একটা হাসপাতালে চলে এসেছে, যেখানে কেউ বদলি হয়েও আসতে চায় না। শিসপাহাড়ির নাম শুনলেই আঁতকে ওঠে। জনবিরল জায়গা, তবে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি আছে শিসপাহাড়িতে। স্থানীয় আদিবাসীরা পুজো করেন শিসদেবতাকে। তাঁর দাপটেই নাকি এখানকার জনজীবন নিস্তরঙ্গ। পাণ্ডুর ধারণা, শিসদেবতা শিসপাহাড়িতে যাকে তাকে ঠাঁই দেন না। তাঁর পছন্দের লোক ছাড়া।

করিডোরের শেষ প্রান্তে পৌঁছেই পাণ্ডু দেখল, সিস্টার ফুলমণি দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছেন। হাসপাতালের সিনিয়র নার্স, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু দেখে মনে হয়, পঁয়তাল্লিশ। মুখোমুখি হতেই সিস্টার ফুলমণি বললেন, 'তুর খোঁজেই সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে যাইনছিলাম ডাগদার।'

ফুলমণির চোখ মুখে উদ্বেগ। সেটা লক্ষ করে পাণ্ডু বলল, 'কী হয়েছে সিস্টার?'

'একবার ইমার্জেন্সিতে যিতি হবেক। পেশেন্ট এসেইনছে। দেখবি চল ক্যানে।'

হাতঘড়ির দিকে পাণ্ডু একবার নজর দিল। এই সময় ইমার্জেন্সিতে থাকার কথা ডাঃ কুন্তী মহাপাত্রর। মেয়েটা ওর থেকে বছর তিনেকের ছোটো। বছর খানেক আগে ভুবনেশ্বর থেকে এই হাসপাতালে এসেছে। জীবনের দ্বিতীয় চাকরি, খুব সিনসিয়ার। অল্প কয়েকদিনের মেলামেশায় পাণ্ডুর ধারণা হয়েছে, মেয়েটা মানুষের সেবা করতেই এসেছে। ফাঁকি দেয় না। পেশেন্টদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে। সিস্টার ফুলমণিকে ও জিজ্ঞেস করল, 'ডাঃ কুন্তী ইমাজেন্সিতে নেই?'

'ছিলক। অ্যাখুন কোয়াটারে যেইনছে। তু বাপ কথা বাড়াইস না। ইখনি যা, পেশেন্টের কুন্ডিশন ভালো না।

অ্যাক্সিডেন কেস।'

এত রাত্তিরে সাধারণত কোনও পেশেন্ট আসে না। অ্যাক্সিডেন্ট ভিক্টিম ছাড়া। শিসপাহাড়ির রাস্তায় মারাত্মক বাঁক। অনেক সময় গাড়ি খাদে পড়ে যায়। মুখোমুখি সংঘর্ষও হয়। বোধ হয় সেই রকম কোনও দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে। নিশ্চয়ই সিরিয়াস

কেস। না হলে সিস্টার ফুলমণি ডাকতে আসতেন না। পাণ্ডু বলল, 'মোবাইলে ফোন করে দিলেও তো পারতেন আমাকে। নিজে আসতে গেলেন কেন?'

সিস্টার বললেন, 'তুর মোবাইল কুথায় রে? সুইচ অফ কইরে রেখেনছিস যে।'

এ হে হে। পাণ্ডুর মনে পড়ল, সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ঢোকার পর ও সত্যিই মোবাইল ফোন বন্ধ করে রেখেছিল। একজন আদিবাসী মহিলার প্রসব যন্ত্রণার কথা শুনে ও তখন ছুটে গিয়েছিল। সিজারিয়ান করতে হবে কি না, তা নিয়ে ধন্ধে পড়েছিল। কিন্তু আধ ঘন্টা অপেক্ষা করার পরই মহিলার নর্মাল ডেলিভারি হয়ে যায়। পাণ্ডু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। শিসদেবতার উদ্দেশে ও তখন প্রণাম জানিয়েছিল। পাণ্ডুর বিশ্বাস, শিসদেবতার আশীর্বাদ ছাড়া, শিসপাহাড়িতে কোনও নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয় না। বরাবর ও একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছে, হাসপাতালে একজনের জন্ম হলে... একজন পেশেন্ট অবধারিতভাবে মারা যায়। কখনও কখনও তার ঠিক উলটোটা হয়। কোনও পেশেন্ট মারা গেলে, সেই দিনই কোনও প্রসূতি বাচ্চার জন্ম দেয়। আজ যেমন হল।

'কী ভাবজিস রে বাপ।' প্রশ্নটা করে কৌতূহলী চোখে তাকালেন সিস্টার ফুলমণি। তার পর বললেন,'পেসেন্ট তুর কথা জিগাইছিল বটে। তুকে চিনে। মোকে শুধাইছিল, পাণ্ডু আছে?'

নিশ্চয়ই শিসপাহাড়ির কেউ নয়। তা হলে ডাগদারবাবু বলত, পাণ্ডু নয়। কোনও বাইরের লোক হবে। ভেবে পাণ্ডু বলল, 'চলুন, গিয়ে দেখি।'

'তু যা ক্যানে। মো মেটারনিটি ওয়ার্ডে যাইনছি। ইখনি আসনছি।'

কথাগুলো বলেই আর দাঁড়ালেন না সিস্টার ফুলমণি। করিডোর দিয়ে উলটো দিকে পা বাড়ালেন। পাণ্ডুও ইমার্জেন্সিতে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে এসে দাঁড়াল। ইমার্জেন্সিতে যাওয়ার জন্য টাইলস বসানো সরু রাস্তা আছে। কিন্তু সেই রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুরপথে যেতে হয়। তার থেকে কম সময়ে ওখানে পৌঁছানো যায়, লনের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে। তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য ভিজে ঘাসের উপর দিয়ে পাণ্ডু হাঁটতে লাগল। উঁচু গাছগুলো বাতাসে মাথা নাড়াচ্ছে। এক একটা গাছ একেক রকম ভাবে। পাতা সরসর করে নড়ছে। বাতাসে কেমন যেন ফিসফিসানির রহস্য। নিজের কোয়ার্টার থেকে পাণ্ডু যখন এই দৃশ্যটা দেখে, তখন কেন জানি না, ওর মনে হয়, গাছেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। শুধু চাঁদনি রাতেই গাছদের এই কথা বলার ইচ্ছে আর ছটফটানি ও দেখতে পায়। দিনের বেলায় কোনওদিন দেখতে পায়নি। গাছগুলো তখন গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দ্রুতপায়ে পাণ্ডু ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে এসে ঢুকল। বাইরের সিঁড়িতে ডাঃ দশরথ নায়েক দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। বোধ হয় ওরই প্রতীক্ষায় ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স। ময়ূরভঞ্জ জেলার ছেলে। সদ্য ডাক্তারি পাস করেছে। এরই মধ্যে ইনটার্নশিপ সেরে সবে হাউস স্টাফ হয়েছে। আগে দশরথ ওর সামনে সিগারেট ধরাতে লজ্জা পেত। লজ্জাটা পাণ্ডুই ভাঙিয়ে দিয়েছে। কাছে গিয়ে দশরথকে ও জিজ্ঞেস করল, 'শুনলাম, নতুন পেশেন্ট এসেছে?'

'হ্যাঁ স্যার। হেড ইনজুরি। ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়েছি।'

'কীভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল, বুঝতে পারলে কিছু?'

'না স্যার। ভদ্রলোক কীভাবে এখানে এলেন, তাও কেউ জানে না। এই সিঁড়ির কাছে এসে কোলাপ্‌স্‌ করে যান। তখনই কারও চোখে পড়েছিল। সারা শরীরের পোশাক ভিজে চপচপ করছিল। শুনলাম, বেডে নিয়ে যাওয়ার সময় সিস্টার ফুলমণিকে একবার শুধু আপনার কথা বলেছিলেন। তার পর থেকে আনকনশাস।

পেশেন্টকে দেখলে স্যার মনে হয়, আপনি চিনতে পারবেন। আমার মনে হয়, এখনই এমআরআই করিয়ে নিলে ভালো হত। একটু কমপ্লিকেটেড কেস।'

'চলো, গিয়ে দেখি।'

হাসপাতালের ভেতরে সিগারেট খাওয়ার নিয়ম নেই। অর্ধেক সিগারেট ফেলে দিতে যাচ্ছিল দশরথ। পাণ্ডু বলল, 'ফেলে দিচ্ছ কেন দশরথ? ওটা শেষ করে ভেতরে এসো।'

ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের দিকে খানিকটা এগোতেই হঠাৎ পাণ্ডুর চোখে পড়ল সোরেনকে। জোসেফ সোরেন, আদিবাসী ক্রিশ্চান ছেলে। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বছর। কেমন যেন জড়সড় হয়ে অন্ধকার গাছতলায় দাঁড়িয়ে। হাসপাতালের বাইরে ছোটোখাটো একটা বাজার আছে। সেখানে ওষুধের দোকানের পাশেই সোরেনের ফলের দোকান। ও থাকে মাইল দুয়েক দূরে এক গ্রামে। ফলের ডালাগুলো নিয়ে রোজ যাতায়াত করা ওর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই রোজ রাতে সুপার সাহেব নিজের কোয়ার্টারে ঢুকে যাওয়ার পর ফলের ডালা সোরেন রাখতে আসে হাসপাতালের ভিতর। সব থেকে নিরাপদ জায়গা মর্গ। এয়ার কন্ডিশনড বলে ফল নষ্ট হয় না। চুরি যাওয়ার সম্ভাবনাও কম। ভয়ে কেউ মর্গের দিকে যায় না। সকালে সুপার সাহেব আসার আগেই সোরেন ফলের ডালা সরিয়ে নিয়ে যায়। মাঝে মধ্যে নাইট ডিউটি করে বলে পাণ্ডু ব্যাপারটা জানে। সোরেনকে দেখে পাণ্ডু বলল, 'এখনও বাড়ি যাসনি কেন রে?'

দু' পা এগিয়ে এল সোরেন। তার পর ফিসফিস করে বলল, 'তুকে ইকটা কথা বলার লেগে দাঁয়ড়ে আছি ডাগদার।'

শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল পাণ্ডু। সোরেন ফিসফিস করে কথা বলার লোক না। একটু ডাকাবুকো টাইপের ছেলে।

মিশনারি স্কুলে নাকি ছয় ক্লাস পর্যন্ত পড়াশুনো করেছিল। অন্য আদিবাসীদের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। ঈশ্বরে বিশ্বাসী, প্রতি রোববার গির্জায় যায়। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে আলো তেরচাভাবে সোরেনের মুখে এসে পড়েছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার পাণ্ডু লক্ষ করল, আতঙ্কের ছাপ। একটু অবাক হয়েই ও বলল, 'কী কথা রে? তোর কী হয়েছে?'

মর্গের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সোরেন নিচু গলায় বলল, 'লাশঘর ঠেনে কী দেখে আইলাম জানিস জাগদার? তেনারা সব লাইন দিয়া বেইরনছে। জংশনে যাবেক বটে।'

শুনে হাসি পেল পাণ্ডুর। কী বোকা বোকা কথা বলছে সোরেন! বোধ হয় বিকেল থেকেই হাড়িয়া খাচ্ছে। ওর মুখে অবশ্য হাড়িয়ার গন্ধ পাচ্ছে না পাণ্ডু। ও আরও জানে, সোরেন বাজে কথা বলার লোক না। তেনারা সব লাইন দিয়ে বেইরনছে... কথাটা শুনে ওর একটু হাসিই পেল। তেনারা বলতে কি ও লাশদের কথা বলছে? তা হবে কী করে? লাশ কি কখনও হেঁটে বেরতে পারে? সোরেনের সঙ্গে সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই।

ওয়ার্ডে একটা চেনা লোক হেড ইনজুরি নিয়ে পড়ে আছে। তার কাছে আগে যাওয়া দরকার। পেসেন্টের কথা ভেবে পাণ্ডু পা বাড়ানোর আগে বলল, 'যত সব বাজে কথা। যা, বাড়ি চলে যা।'

কিন্তু সোরেন ছাড়ার পাত্র নয়। পিছু পিছু আসার সময় বলতে লাগল,'শুন বটে ডাগদার। শুন ক্যানে। মো মিছা কথা কই না রে। যিশুর দিব্যি, তেনারা সব লাশঘর ঠেনে চলি যাচ্ছে।'

সোরেনকে গুরুত্ব না দিয়ে দ্রুত পায়ে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকে গেল পাণ্ডু। ঢোকার সময় পা দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

২

সারাটা দিন ভীষণ ধকল গিয়েছে। আদিবাসী মরদগুলোর চিকিৎসা করতে গিয়ে কুন্তী টেরই পায়নি, ঘড়ির কাঁটা কখন রাত দশটা ছুঁয়ে ফেলেছে। সিস্টার ফুলমণি মনে করিয়ে না দিলে কোয়ার্টারে ফেরার কথা মনেই পড়ত না ওর। কয়েকজনের অবস্থা বেশ সিরিয়াস। আদিবাসী বস্তিতে এই ধরনের ঘটনা অবশ্য প্রথম না। শিসপাহাড়িতে আসার পর থেকে কুন্তী অন্তত বার তিনেক মদ্যপানজনিত অসুস্থতার চিকিৎসা করেছে। হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট থেকে বছরে দু'তিনবার উদ্যোগ নেওয়া হয় আদিবাসীদের বোঝানোর। দেশি চোলাই মদ যেন কেউ না খায়। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

হাসপাতালে যখন ডিউটি থাকে না, তখন অঙ্গনওয়াড়ি মেয়েদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কুন্তী বস্তিতেও যায়।

আদিবাসী পরিবারের বউ-ঝিদের নিয়ে ক্লাস করে। অল্প বয়সে বিয়ে না-করার কথা মেয়েদের বলে। বিবাহিত যারা, তাদের মধ্যে কনডোম বিলি করে। মেয়েদের সুস্থ ও নীরোগ থাকার উপায় বলে দেয়। ফলে আশপাশের বস্তির অনেকেই ওর মুখ চেনা। আজ বুধিরাম বলে একজনকে করিডোরে শুয়ে থাকতে দেখে কুন্তী চমকে উঠেছিল। মাত্র মাস তিনেক আগে ছেলেটা বিয়ে করেছে। ওর বউ পদ্মমণিকেও কুন্তী চেনে। বুধিরাম মারা গেলে কচি বউটার কী হবে, ভেবে তখন মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল কুন্তীর। হাসপাতাল থেকে কোয়ার্টারে আসার ঠিক আগে, বুধিরামকে একবার দেখে এসেছে ও। ছেলেটার অবস্থা ভালো নয়।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে, চোখ বুজে বুধিরামের কথাই ভাবছিল কুন্তী। সেই সময়

রুমালি এসে বলল, 'খাবার রেডি করে রেখেছি দিদি। ইচ্ছে করলে তুমি ডাইনিং টেবলে যেতে পারো।'

চোখ খুলে রুমালির দিকে তাকাল কুন্তী। ওর পরনে সালোয়ার-কামিজ। গায়ে হালকা লেডিস শাল জড়ানো।

দেখেই কুন্তীর হাসি পেয়ে গেল। গতবছর রথযাত্রার সময় ভুবনেশ্বর থেকে বাপ্পা... মানে ওর বাবা সালোয়ার কামিজ পাঠিয়েছিল। কিন্তু সাইজে ছোটো হওয়ায় কুন্তী পরতে পারেনি। রুমালিকে দিয়ে দিয়েছে। রুমালির সঙ্গে ওর রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই। রুমালির মা মারু ওদের দেশের বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজ করত।

রুমালির বাবা ছিল ওদের বাগানের মালি। রুমালির জন্মও ওদের সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে। মা মজা করে ওর নাম দিয়েছিল রুমালি। জন্মের পর নাকি এত ছোট্ট ছিল যে, একটা রুমালে পেঁচিয়েও ওকে তুলে আনা যেত। এখন অবশ্য পুরোপুরি যুবতী। সব সময় সেজেগুজে থাকে। রুমালিকে দেখে মনেই হয় না, কাজের মেয়ে। শিসপাহাড়িতে অনেকেই জানে, রুমালি ওর দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

সত্যি, এই সময়টায় যদি বাইরের কেউ কোয়ার্টারে আসে, তা হলে রুমালিকেই ডাক্তার দিদি বলে ধরে নেবে। কথাটা ভেবেই এক চিলতে হাসি ফের কুন্তীর ঠোঁটে খেলে গেল। একটা সময় এই সালোয়ার-কামিজটা রুমালি পরতেই চাইছিল না। 'না দিদি, তোমাকে বাবাঠাকুর পাঠিয়েছে। আমি কেন পরব?' তার পর বলতে লাগল, 'আমার লজ্জা লাগে।' দিন দুয়েক হল কুন্তী লক্ষ করছে, ঘরের ভিতর পরে থাকছে বটে, কিন্তু বাইরে থেকে কেউ এলে সঙ্গে সঙ্গে সালোয়ার-কামিজের উপর রুমালি শাড়ি জড়িয়ে নিচ্ছে।

'দিদি, হাসলে কেন গো?'

সোফা ছেড়ে ওঠার মুখে কুন্তী বলল, 'তোর পাগলামি দেখে। সালোয়ারটা তুই পরতে চাইছিলি না। অথচ আয়নার কাছে গিয়ে দ্যাখ, তোকে কত সুন্দর লাগছে।'

রুমালি লজ্জা পেয়ে বলল, 'ধ্যাৎ।'

'কী রেঁধেছিস রে আজকে?'

'তোমার জন্য পনির, ভেরেন্ডি ভাজা আর ডাল।'

'আর ওনার জন্য?'

'চিকেন। উনি তো আবার তোমার মতো ভেজ নন। মাছ-মাংস ছাড়া তো ওনার মুখে কিছু রোচে না!'

কুন্তী সভয়ে বলে উঠল, 'চুপ মুখপুড়ি। শুনতে পেলে রাগ দেখাবে। খাবারটা কি দিয়ে এসেছিস? দশটা বেজে গেছে, তোর খেয়াল নেই?'

'দিয়ে এসেছি দিদি। এতক্ষণে খাওয়া হয়েও গেছে বোধ হয়। আগে তোমার খাবারটা আমি বেড়ে দিই। তার পর কুয়োতলা থেকে তেনার বাসনগুলো নিয়ে আসব।'

শুনে নিশ্চিন্ত বোধ করল কুন্তী। আর তখনই খিদেটা অনুভব কর· বেলা সেই

একটার সময় লাঞ্চ করে ও হাসপাতালে গিয়েছিল। তার পর থেকে কয়েকবার চা ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। কাজের চাপ থাকলে এক একদিন খাওয়া-দাওয়ায় ওর অনিয়ম হয়ে যায়। রাতের দিকে দুটো রুটি আর সামান্য সবজি ছাড়া ও আর কিছু খায় না। ডিনার সেরে ভুবনেশ্বরে ফোন করে রোজ বাপ্পার সঙ্গে একবার ও কথা বলে। ওর বাপ্পা ডাঃ নীলমাধব মহাপাত্র ভুবনেশ্বরের ওল্ড টাউনে মিউনিসিপ্যাল হসপিটালের আই স্পেশালিস্ট ছিলেন। বছর তিনেক হল অবসর নিয়েছেন। বেশ কয়েকটা বেসরকারি নার্সিং হোম থেকে চাকরির অফার পেয়েছিলেন। কিন্তু, মা মারা যাওয়ার পর বাপ্পা যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন। আর চাকরি করতে চাননি। বাপ্পার শরীরটা ইদানীং ভালো যাচ্ছে না।

ডাইনিং টেবলে গিয়ে বসামাত্রই, কুয়োতলা থেকে বাসনপত্তর ছুড়ে ফেলার আওয়াজ শুনতে পেল কুন্তী। তার মানে, একটু আগে রুমালি যা বলেছে, তেনার কানে পৌঁছেছে। এখনি গিয়ে না থামালে এই উৎপাত ঘরের দরজার সামনে এসে যাবে। দরজায় উনি ঢিল মারবেন। সাড়া না দিলে, দরজায় শিকল তুলেও দিতে পারেন।

হ্যাঁ, অতীতে একবার এ রকম হয়েছে। শেষে ফোন করে ডাঃ পাণ্ডুকে ডেকে এনে সেদিন দরজা খোলায় কুন্তী। ডাঃ পাণ্ডুকে অবশ্য ও বলেনি, কে শিকল দিয়েছিল। ডাঃ পাণ্ডুর ধারণা হয়েছিল কোনও দুষ্ট লোকের কাজ। উনি বারবার বলে গিয়েছিলেন, হাসপাতালের সিকিউরিটির কাছে কমপ্লেন করতে। কিন্তু কার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করবে কুন্তী? তিনি যে ধরাছোঁয়ার বাইরে!

বাসন ছোড়ার শব্দ শুনে কিচেন থেকে বেরিয়ে এসেছে রুমালি। ওর এক হাতে ডিশ, অন্য হাতে কাচের বাটি। বিরক্তিভরা মুখে ও বলল, 'দিদি, তুমি যাও। আগে তেনাকে ঠান্ডা করে এসো। না হলে তোমাকে শান্তিতে খেতে দেবেন না।'

ঠান্ডার কথা ভুলে গিয়ে, গায়ে কোনও কিছু না জড়িয়েই কুন্তী উঠোনে এসে দাঁড়াল। বাইরে ঘন অন্ধকার।

কুয়োতলার দিকটায় হালকা কুয়াশা। পিছনে একটা বড়ো ঝিলের মতো আছে। সেখানে থোকা থোকা জোনাকি জ্বলছে-নিভছে। বড় গাছগুলো বাতাসে মাথা নাড়াচ্ছে। এই কোয়ার্টারে আসার পর প্রথম প্রথম রাতের দিকে কুন্তী পিছনের দরজাটা খুলতই না। ওর কেমন যেন ভয় ভয় করত। কিচেনের জানলা দিয়ে যখন ওই দিকটায় চোখ পড়ত, তখন মনে হত, কুয়োতলায় কে যেন বসে আছেন। তাঁর পরনে কোট-টাই, হ্যাট। তিনি ওদের সবকিছু লক্ষ করছেন। বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর কুন্তী বুঝতে পারে, ও আর রুমালি ছাড়া তৃতীয় একজনও কোয়ার্টারে বাস করেন। তাঁকে অবশ্য কোনওদিন ও চোখে দেখেনি। তবে তাঁর উপস্থিতি রাতের দিকে রোজই টের পায়।

তাঁর অত্যাচারে একটা সময় কুন্তী দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, অশরীরী আত্মার সঙ্গে বসবাস করতে পারবে না। চাকরিটা ছেড়ে দেবে। ওর সমস্যার কথা তখন একমাত্র বাপ্পাকেই জানায়।

কিন্তু, বাপ্পা তখন ওকে চাকরি ছাড়তে মানা করেন। পরামর্শটা শেষে বাপ্পাই দিয়েছিলেন, 'সব অশরীরী আত্মাই যে খারাপ, তা নয় রে ঝিও। কোনও অতৃপ্তির কারণে উনি এখনও ইহলোকে রয়ে গেছেন। শোন, হাসপাতালের পুরোনো কোনও লোককে একবার জিজ্ঞেস করিস তো। কার প্রেতাত্মা, তিনি হয়তো বলে দিতে পারবেন। আমি বলি, সাহস করে তুই এই প্রেতাত্মার সঙ্গে একটু কমিউনিকেট করার চেষ্টা কর। দেখবি, উনি রেসপন্ড করবেন।'

হাসপাতালে তখন একমাত্র সিস্টার ফুলমণির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কুন্তীর। বাপ্পার কথামতো তাঁকেই সব কথা খুলে বলেছিল ও। ফুলমণি বলেছিলেন, এর পর প্রেতাত্মা যদি কোনওদিন বাড়াবাড়ি করে, রুমালি যেন গিয়ে তাঁকে ডেকে আনে। কী আশ্চর্য, সত্যিই তাতে ফল পেয়েছে কুন্তী! একদিন রাতে হাসপাতাল থেকে ফিরে খেতে বসার সময় ও দেখে, কিচেনে রুমালির রান্না করা সব খাবার কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখেছে। সেদিন আর ও থাকতে পারেনি। সিস্টার ফুলমণিকে ডেকে এনেছিল। পিছনের দরজা খুলে কুয়োতলার কাছে গিয়ে ফুলমণি খুব হম্বিতম্বি করেন, 'তুর সাহস থাকলি মোর কানছে আয় বটে। ঝানটা পিটা কইরে তুকে শিসপাহাড়ির উদিকে পাঠঠে দিবক।'

কুয়োতলার দিক থেকে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। শেষে অন্ধকারের উদ্দেশে কুন্তী হাতজোড় করে বলেছিল, 'কে আপনি, কী চান? কেন আমাকে ডিসটার্ব করছেন?'

অনেকক্ষণ কুয়োতলার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে, কোনও উত্তর না পেয়ে কুন্তী ফের জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কি চান, আমি কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাই? যদি তাই চান, তা হলে আমাকে জানিয়ে দিন। এখানে চাকরি করতে এসেছিলাম, শিসপাহাড়ির গরিব মানুষগুলোর কথা ভেবে। ওদের সেবা করার জন্য। কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনি তা করতে দেবেন না।'

ঝিলের দিকে শ্মশানের নীরবতা। কোনও উত্তর বা ইঙ্গিত আসেনি। উঠোনে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে কুন্তীরা ফের ঘরে ঢুকে এসেছিল। কী করা যায়, তা নিয়ে ও, রুমালি আর সিস্টার ফুলমণি, তিনজনে মিলে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করেছিল। যজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন থেকে শুরু করে জানগুরু ডেকে আনা ....সেই রাতে সব কথাই উঠেছিল। রুমালি কথায় কথায় হঠাৎ তখড় বলেছিল, 'দিদি, আমার কী মনে হয় জানো? রাতে তেনার বোধ হয় খিদে পায়। সেই কারণে যত উৎপাত আমাদের কিচেনে।'

কথাটা মনে ধরেছিল কুন্তী আর সিস্টার ফুলমণির। সত্যিই তো, কিচেন ছাড়া কোয়ার্টারের আর কোনও জায়গায় কোনও সমস্যা নেই। মনে মনে ওরা রুমালির অনুমান ক্ষমতার প্রশংসা করেছিল। পেটে বিদ্যে নেই, কিন্তু মারাত্মক বাস্তব বুদ্ধি। কথার পিঠেই তার পর কুন্তী বলেছিল, 'তাই যদি হয়, তা হলে কাল থেকে তেনার খাবার কুয়োতলায় রেখে আসবি। দু' একদিন এটা করে দ্যাখ তো। রেসপন্ড করেন কিনা। তার পর না হয় দেখা যাবে।'

রুমালির পরামর্শে কাজ হয়েছে। রোজ রাতে এখন রুমালি কুয়োতলায় খাবার রেখে আসে। পরে গিয়ে দেখে, সেই খাবার উধাও। অশরীরী কে, তা কুন্তী জানে না। খোঁজ নেওয়ার চেষ্টাও আর কোনওদিন করেনি। কিন্তু, ও নিশ্চিত, প্রেতাত্মার শান্ত হয়ে যাওয়ার পিছনে ফুলমণির হুমকির কোনও সম্পর্ক আছে। প্রেতাত্মা যে-ই হোন না কেন, ফুলমণিকে তিনি খুব ভালো করে চেনেন। যাই হোক, তাঁর সঙ্গে মোটামুটি একটা আপস করে নিতে পেরেছে কুন্তী। এখন তো ও বাইরে বেরিয়ে মাঝে মাঝে ধমকায়। এমন ভাব দেখায়, থাকতে দিচ্ছি, খেতে দিচ্ছি, উপকারে না এলে বা বেশি রাগ দেখালে কিন্তু ফুলমণিকে ডেকে আনব।

আজ যেমন ডাইনিং টেবল থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে কুন্তী রাগ দেখিয়ে বলল, 'আপনার জন্য কি শান্তিতে ডিনারও করতে পারব না? কী ভেবেছেন আপনি?'

পাশ থেকে রুমালি ফুট কাটল, 'আর তুমি সহ্য করো না দিদি। কালই ফুলমণি মাসিকে ডেকে আনো।'

কুয়োতলার দিক থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। রুমালি গালমন্দ করতে লাগল। কিন্তু, কুন্তী কাউকে কটুকথা বলতে পারে না। তাই চুপ করে রইল। হঠাৎই ও লক্ষ করল, ঝিলের দিককার কুয়াশা গাঢ় হতে শুরু করেছে।

ক্রমে ক্রমে সেটা একটা সাদা পর্দার মতো হয়ে গেল। তার উপর এক একটা অক্ষর ফুটে বেরতে লাগল।

বি এ ডি... মানে ব্যাড। এন ই ডবলিউ এস ... নিউজ। সি ও এম আই এন জি... কামিং। পুরো বাক্যটা দাঁড়াল, ব্যাড নিউজ কামিং। কয়েক সেকেন্ড ধরে অক্ষরগুলো শূন্যে ভাসতে লাগল। তার পর ঝিলের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দেখে কুন্তীর বুকটা ধক করে উঠল। খারাপ খবর আসছে! তা হলে কি ভুবনেশ্বরে কারও কিছু হল? রুমালি ইংরেজি জানে না। কিন্তু আচমকা কুয়াশার মধ্যে ওই রকম একটা লেখা ফুটে উঠতে দেখে ও অবাক।

কুন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, 'দিদি, কী লেখা ছিল গো?'

উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই। খারাপ খবর আসছে শুনে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার জোগাড় কুন্তীর।

কোনও কথা না বলে প্রায় টলতে টলতেই ও ঘরে ঢুকে এল। নিশ্চয়ই বাপ্পার কিছু হয়েছে। ভুবনেশ্বরে ফোন করবে বলে ও মোবাইল ফোনটা খুঁজতে লাগল। কিন্তু, কোথাও দেখতে পেল না। তা হলে কি হাসপাতালে ফেলে রেখে এসেছে? ডিনার করার কথা ভুলে গিয়ে ও যখন ফের ডাক্তারদের চেম্বারে যাওয়ার কথা ভাবছে, তখনই চোখে পড়ল হ্যান্ডব্যাগটা সোফার উপর পড়ে রয়েছে। দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়ে, ব্যাগের চেন খুলে ও দেখল, হ্যাঁ মোবাইল সেটটা ভিতরে আছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে রোজ ও মোবাইল সেট রিচার্জ করার জন্য বের করে। আজ বের করতে ভুলে গিয়েছে।

সাত-সাতটা মিসড কল। সবগুলোই ভুবনেশ্বর থেকে। বোতাম টিপতেই কুন্তীর

চোখে পড়ল একটা মেসেজও আছে। ঠিক রাত দশটায় বাপ্পা পাঠিয়েছে। 'অলরেডি স্টার্টেড জার্নি ফর আ নিউ ওয়ার্ল্ড। প্লিজ কাম অ্যান্ড মিট মি অ্যাট শিসপাহাড়ি জংশন টুমরো নাইট অ্যাট টু থার্টি নাইন এ এম শার্প।'

মেসেজটা পড়ে কুন্তী কিছুই বুঝতে পারল না। হাঁ করে লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

৩

ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে সুরপতি মাইতিকে আইসিইউতে নিয়ে এসেছে পাণ্ডু। ওর অবস্থা ভালো নয়। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাই ব্লাড দিতে হচ্ছে। নাকে অক্সিজেনের নল ঢোকানো আছে বটে, কিন্তু টানতে পারছে কি না তা বুঝতে পারছে না পাণ্ডু। ডাঃ দশরথকে মেসে পাঠিয়ে দিয়ে পাণ্ডু একা বসে আছে আইসিইউতে।

সুরপতিকে ছেড়ে যেতে একেবারেই ওর মন চায়নি। এই সুরো... ছোটবেলায় ওকে সবাই এই নামেই ডাকত ... একটা অদ্ভুত ছেলে। পুরুলিয়ায় ওরা একই স্কুল... রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ত। তখন সুরোদের বাড়িতে খুব যাতায়াত ছিল পাণ্ডুর। সুরো পড়াশুনোয় খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিল। স্টেট স্কলারশিপ পেত। কলকাতায় আর জি কর মেডিকেল কলেজেও তিন বছর ওরা একই সঙ্গে পড়েছে। কিন্তু ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে সুরো হঠাৎ উধাও হয়ে যায়।

বছর দুয়েক আগে শেষবার সুরোর সঙ্গে পাণ্ডুর দেখা হয়েছিল। শিসপাহাড়ি রেলওয়ে জংশনে। ট্রেনে করে কোথায় যেন যাচ্ছিল ও। কেমন আছিস, কী করছিস, বাঃ দারুণ খবর, বিয়ে করেছিস কি না, এই সব সাদামাঠা প্রশ্নের পর সুরো বলেছিল, 'তোদের এই শিসপাহাড়িতে আমাকে প্রায়ই আসতে হবে রে এখন থেকে। সময় পেলে কোনওদিন তোর হাসপাতালে চলে যাব।'

কথাগুলো বলেই, পালটা প্রশ্নের কোনও সুযোগ না দিয়ে... 'চলি রে' বলে সুরপতি আচমকাই উঠে পড়েছিল ভুবনেশ্বরগামী ট্রেনে। ওর বোহেমিয়ান স্বভাবটা জানে বলেই পাণ্ডু সেদিন অবাক হয়নি। সেই হাসপাতালেই সুরোর সঙ্গে আবার দেখা হল ওর। কিন্তু সুরো এখন অচেতন অবস্থায়।

পুরো হাসপাতালটাই এখন শুনশান। শুধু দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটার টিকটিকানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত সোয়া দুটো বাজে। আর ঘণ্টা আড়াই সময় কাটিয়ে দিলেই ভোর হয়ে যাবে। কাল সকাল আটটা থেকে ডাঃ কুন্তীর ডিউটি। ওর হাতে সুরোর ভার দিয়ে পাণ্ডু নিজের কোয়ার্টারে চলে যাবে। নিশ্চিন্তে বেলা বারোটা সাড়ে বারোটা অবধি ঘুমিয়ে নিতে পারবে। সুরোর এমআরআই করানো দরকার। সেটা রাতে করিয়ে নিতে পারলে... চিকিৎসাটা শুরু করা যেত। কিন্তু রেডিয়োলজিস্ট সুনন্দ পাত্র থাকেন সেই শুক্তিমতি নদীর ধারে। কাল সকাল আটটায় তিনি না-আসা পর্যন্ত এমআরআই করা যাবে না।

চেয়ারে বসে সুরোর কথাই ভাবছিল পাণ্ডু। চোট কীভাবে পেল, সেটা নিয়ে একটা ধারণা তৈরি করছিল। এমন সময় ট্রে হাতে ওয়ার্ডে ঢুকলেন সিস্টার ফুলমণি। দুটো কফির কাপ থেকে ধুয়ো উঠছে। দু'জনের ডিউটি একই রাতে পড়লে সিস্টার ফুলমণি মাঝে মাঝে কফি বানিয়ে খাওয়ান পাণ্ডুকে। একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে সিস্টার বললেন, 'পেশেন্টকে কি তু চিইনতে পেরেছিস বাপ? কে বটে? তুর রিলেটিভ?'

'না, রিলেটিভ না।' কফিতে একবার চুমুক দিয়ে পাণ্ডু বলল, 'আমার স্কুল-কলেজের বন্ধু।'

'দশরথ বুলল, হেড ইনজুরি হইনছে।'

'হ্যাঁ। দশটা সেলাই পড়েছে। ড্রেসিং করে দিয়ে গেছে দশরথ। কাল ভালো করে দেখতে হবে বডির আর কোথাও ইনজুরি আছে কিনা।'

'বন্ধুর বাড়িতে খপর দিইছিস ডাগদার?'

'দেব কী করে? কোথায় থাকে তা-ই তো জানি না। আমার এই বন্ধুটা একটু পাগলাটে টাইপের।'

'তুর বন্ধুটো পাহাড়ে গিয়েনছিল ক্যানে রে?'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'উর পিঠে একটো ব্যাগ ছিল যে। জড়িবুটি ভর্তি। শিসপাহাড়ের জঙ্গলে পাওয়া যায়। দাঁড়া, তুকে ব্যাগটো দেখাই বটে। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে পড়ি আছে।'

কফির কাপটা টেবলে রেখে সিস্টার ফুলমণি ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এই বয়সেও কাজে কী এনার্জি!

ওঁর গমনপথের দিকে পাণ্ডু তাকিয়ে রইল। এই হাসপাতালের সব থেকে পুরোনো কর্মী সিস্টার ফুলমণি। ট্রেনি হিসেবে শুরু করে এখন সিনিয়র নার্স। প্রায় তিরিশ-বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা। উনি প্রায়ই হাসপাতালের পুরোনো দিনের গল্প করেন। আগে নাকি মিশনারি পাদ্রীরাই হাসপাতাল চালাতেন। টাকা আসত ইংল্যান্ডের রানির কোষাগার থেকে। আটের দশকের মাঝামাঝি মৌলবাদী হিন্দুদের সঙ্গে মিশনারিদের প্রবল সংঘাত হয়। হাসপাতাল নাকি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তার পরই হাসপাতালের পরিচালন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে নেয় ওড়িশা সরকার।

শিসপাহাড়িকে নিয়ে নানা ধরনের মিথ আছে। সে সবও পাণ্ডুর শোনা সিস্টার ফুলমণির কাছ থেকে। নাইট ডিউটি করার সময় উনি একবার বলেছিলেন, শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ যখন মৃতপ্রায়, তখন বিশ্যকরণীর খোঁজে ভুল করে হনুমান নাকি একবার এই শিসপাহাড়িতে আসেন। কিন্তু শিসদেবতার অনুমতি ছাড়াই তিনি খোঁজাখুজি শুরু করছিলেন। গাছগাছালি উপড়ে ফেলছিলেন। তা দেখে শিসদেবতা খুব রেগে যান। হনুমানের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড লড়াই হয়। আর সেই যুদ্ধে হনুমান হেরে যাওয়ার পর শিসদেবতা তাঁকে এক গুহায় আটকে রাখেন। কিন্তু বীর হনুমানকে বন্দি করে রাখেন, সাধ্য কার? বিশেষ করে, লক্ষ্মণকে বাঁচানোর জন্য যখন এক একটা মুহূর্ত তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গুহার সামনে শিসদেবতা পাহারা বসিয়ে রেখেছেন দেখে, হনুমান করলেন কী, ভিতরে সুড়ঙ্গ কাটতে কাটতে ছয় তল পেরিয়ে একেবারে পাতালে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তাঁকে চিনতে পারেন নাগরাজ বাসুকি। তিনিই তখন হনুমানকে পথ দেখিয়ে ফের সমুদ্রে পৌঁছে দেন। ফলে বিশল্যকরণী খুঁজে আনতে একটু বিলম্ব হয়ে যায় হনুমানের। তিনি শপথ নেন, দেরির জন্য লক্ষ্মণ যদি প্রাণত্যাগ করেন, তা হলে শিসদেবতাকে ক্ষমা করবেন না। শিসপাহাড় সমুদ্র গর্ভে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তার আর দরকার হয়নি। লক্ষ্মণ বেঁচে ওঠার পর হনুমান শিসদেবতাকে ক্ষমা করে দেন। তাঁর সেই গুহাপথ আর সুড়ঙ্গ নাকি এখনও রয়ে গিয়েছে।

সেখান দিয়ে সোজা পাতালে চলে যাওয়া যায়। ইংরেজদের আমলে অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন, সেই সুড়ঙ্গ আবিষ্কারের। কিন্তু কেউ পারেননি। অনেকের প্রাণও গিয়েছে অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে। এই মিথ নিয়ে একবার একটা যাত্রা পালাও দেখেছে পাণ্ডু আদিবাসী বস্তিতে।

'এই লে... ব্যাগটো লিয়ে এসেইনছি। খুলে দ্যাখ বাপ, কুনও অ্যাড্রেস পাস ক্যানে।' টেবলে একটা কিটব্যাগ ধপ করে রেখে কথাগুলো বললেন সিস্টার ফুলমণি। সুরপতির ব্যাগটা উনি ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ব্যাগ খোলার কোনও উদ্যোগই নিল না পাণ্ডু। ওর এখন গল্প করতে ইচ্ছে করছে সিস্টার ফুলমণির সঙ্গে। কফিতে চুমুক দিয়ে ও বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ মাদার ফুলমণি।'

মাদার বললে ফুলমণি খুশি হন। কিন্তু কপট রাগও দেখান মাঝে মাঝে। রেখে যাওয়া কফির কাপ টেনে নিয়ে সিস্টার বললেন, 'ফের তুই মাদার বুলছিস। মাদার কি সবাই হয় রে বাপ। একজনই ছিলক। মাদার টেরিজা। ইকবার এসেইনছিলেন শিসপাহাড়িতে। থ্যালামেমিয়া ওয়ার্ড ওপেনিংয়ের সময়। এই দ্যাখ ডাগদার, গায়ে কাটা লাগে বটে। লংম্যান সাহেব উয়াকে লিয়ে এসেইনছিলেন।'

মাদার টেরিজার কথা সিস্টার ফুলমণির মুখে অনেকবার শুনেছে পাণ্ডু। খুব গর্ববোধ করেন ফুলমণি সেই গল্প শোনাতে। সুপার সাহেবের ঘরে একটা ছবিও আছে মাদারের। বছর তিরিশ আগে তোলা। সাদা-কালো সেই ছবির মধ্যে যুবতী ফুলমণিও আছেন। যথেষ্ট সুন্দরী। আদিবাসী মেয়েদের মতো ওঁর গায়ের রং অত কালো নয়। মাজা মাজা ধরনের।

কফি খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য, আজ কিন্তু মাদার টেরিজার কথা সবিস্তারে বলতে শুরু করলেন না ফুলমণি। কফির কাপ দুটো তুলে নিয়ে বেসিনের কাছে গিয়ে, যত্ন করে ধুয়ে নিয়ে এসে বললেন, 'একটো খবর শুনেইছিস ডাগদার?'

'কি খবর সিস্টার?'

'চাঁপামণিকে যে রেপ কুরেছিল, সেই বাপটু কিসকুকে পাওয়া গেনছে।'

'পুলিশ পেল কোথায় তাকে?'

'পুলিশ ধরতি পারে লাই। শিসদ্যাবতা তারে শাস্তি দিয়েনছেন। শুক্তিমতি নদীর চরায় মরে পইড়েছিল।

ঘুমপুর থেইকে আসার পথে কার য্যান চোখে পড়েনছে।'

'কী করে বোঝা গেল শিসদেবতা ওকে সাজা দিয়েছেন?'

'উয়ার ডেডবডি পোস্ট মর্টেমের জন্যি পুলিশ হাসপাতালে লিয়ে এসেইনছে। ডেডবডি এখনও লাশঘরে আনছে। যা ডাগদার, গিয়া দেইখে আয় ক্যানে। মো দেখেইনছি। উয়ার পেনিসটো লাই রে। কেটে লিয়ে শিসদ্যাবতা উকে হিজড়া কইরে দিয়েনছেন।'

শুনে হাঁ করে তাকিয়ে রইল পাণ্ডু। সিস্টার ফুলমণি বলছেনটা কী! বাপটু কিসকু হাসপাতালের ফোর্থ ক্লাস স্টাফ। মাসখানেক ধরে পুলিশ ওকে খুঁজছিল। চাঁপামণি বলে এক অল্পবয়সি পেশেন্ট পেটের ব্যথা নিয়ে জেনারেল ওয়ার্ডে ভর্তি ছিল। এক রাতে মেয়েটা টয়লেট যাওয়ার জন্য বেড থেকে উঠে আসে। টয়লেট খুঁজে পায়নি বলে বাইরে লনে পেচ্ছাপ করে ফেলেছিল। ভেবেছিল, কারও চোখে পড়বে না। কিন্তু নাইট ডিউটিতে থাকা বাপটু কিসকু তা দেখে ফেলে। ওর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে বলে বাপটু ভয় দেখায়। তার পর চাঁপামণিকে তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করে। ভয়ে মেয়েটা তখন চিৎকার চেঁচামেচি করেনি। কিন্তু সকালে ধরা পড়ে যায়, ব্লিডিং হওয়ার জন্য।

বেডে রক্তের দাগ। এই ঘটনাটা নিয়ে হাসপাতালে তখন মারাত্মক তোলপাড় হয়েছিল। বাপটু অ্যারেস্ট হওয়ার ভয়ে পালিয়ে যায়। শিসপাহাড়িতে পালানোর জায়গা বলতে ঘন জঙ্গল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বোধ হয় শুক্তিমতি নদীর ধার দিয়ে ঘুমপুরে চলে যাওয়ার প্ল্যান করেছিল বাপটু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করতে পারেনি।

শিসপাহাড়িতে কোনও ঘটনা ঘটলে, তা শেষ হয় শিসদেবতাকে দিয়ে। বাপটুর পরিণতি অর্থাৎ লিঙ্গ কেটে নেওয়ার কথা নিশ্চয়ই শিসপাহাড়িতে ছড়িয়েছে। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। দেবতার রোষে পড়ার ভয়ে ভবিষ্যতে কেউ আর ধর্ষণ করার সাহস পাবে না। বাপটু কিসকুকে পাণ্ডু খুব ভালো করে চিনত। এখানকার মিশনারি স্কুল থেকে ক্লাস টেন পাস করা ছেলে। এমনিতে ভদ্র, ক্ষণিকের ভুলে হয়তো এমন একটা অপরাধ করে ফেলেছিল। কিন্তু ওকে মেরে, ওর লিঙ্গ কেটে নিয়ে... এমন শাস্তি দেওয়ার মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ শিসপাহাড়িতে আছে বলে পাণ্ডুর মনে হল না। চাঁপামণির আত্মীয় আর বস্তির লোকজন কতটা হিংস্র, ও তা জানে না। তবে এটা ঠিক, ধর্ষণের ঘটনার পর তারা এসে একদিন হাসপাতালে চড়াও হয়েছিল। দাবি করে, চাঁপামণির সঙ্গে বাপটুর বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ততক্ষণে বাপটু নিপাত্তা। পাণ্ডুর মনে হল না, বস্তির লোকজন বাপটুর খোঁজে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছে। তা হলে ওর এই অবস্থা করলটা কে?

ট্রে হাতে নিয়ে সিস্টার ফুলমণি বেরিয়ে যাচ্ছেন। বাইরে পা রাখার আগে বললেন, 'তুকে আর ডিউটি করতে হবেক না বাপ। তু কোয়ার্টারে যা। মো ডিউটিতে আছি। তুর বন্ধুকে মো দেখব।'

কথাটা শুনেও পাণ্ডু ওঠার লক্ষণ দেখাল না। সিস্টার ফুলমণি বেরিয়ে যাওয়ার পর সুরপতির ব্যাগটা ও কাছে টেনে নিল। চেন খুলতেই একটা ভেষজ গন্ধ ওর নাকে এসে

লাগল। ব্যাগের ভিতরে নানা ধরনের লতাগুল্ম, গাছের শিকড়, পাতা, ডাল রয়েছে। সে সব বের করে ও টেবলের উপর রাখল। ফুলমণি তা হলে ঠিকই বলেছিলেন। সুরো এই সব শিকড়বাকড়ের খোঁজেই শিসপাহাড়ির জঙ্গলে ঢুকেছিল! এই অঞ্চলে নানা দুর্মূল্য গাছগাছড়া পাওয়া যায়। তা থেকে ভেষজ ওষুধ তৈরি করা হয়। সুরপতি কি তা হলে ভেষজ কোনও ওষুধ তৈরি করার জন্যই ইদানীং গবেষণা করছিল? কথাটা মনে হতেই পাণ্ডু তন্নতন্ন করে ব্যাগের ভিতরটা খুঁজতে লাগল।

ব্যাগের ভিতর একটা ল্যাপটপ, ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, রোজ দরকার হয়, এমন সব জিনিসপত্তর রয়েছে। সেইসঙ্গে ওড়িয়া ভাষায় লেখা একটা প্রাচীন পুথি। পাণ্ডু ওড়িয়া ভাষা বুঝতে পারে, কিন্তু পড়তে পারে না। তাই বুঝতে পারল না, পুথিটা কীসের। ল্যাপটপ বের করে আনার সময়ই খুট করে একটা শব্দ শুনতে পেল পাণ্ডু। ওর মনে হল, আওয়াজটা সুরোর বেডের দিক থেকে এল। সেদিকে তাকাতেই পাণ্ডু অবাক হয়ে গেল।

সুরো বিছানার উপর উঠে বসেছে। এ কী, নাক থেকে অক্সিজেনের নলটা ও খুলে ফেলছে কেন? হাত থেকেও ব্লাড আর স্যালাইন নেওয়ার নল দুটো খুলে, ও ছুড়ে দিল মেঝেতে। তার পর হাত দিয়ে একবার মাথার ব্যান্ডেজটা স্পর্শ করল। এদিক ওদিক তাকিয়ে সুরো বোধ হয় আন্দাজের চেষ্টা করল, কোথায় বসে আছে। শরীরে অস্বস্তি হলে লোকে যেমন উঃ আঃ করে, কপাল টিপে সেই রকম একটা ভঙ্গি করে, বেড থেকে নেমে এল সুরো। পরনের জামাপ্যান্ট খুলে ফেলল। তার পর ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল ওয়ার্ডের কোণে বেসিনের দিকে।

কেমন যেন ঘোরের মধ্যে ও হেঁটে যাচ্ছে। পা দুটো ফেলছে থপথপ করে। মাথাটা নাড়ছে এ পাশ ওপাশে।

বোধ হয় যন্ত্রণা হচ্ছে খুব। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পাণ্ডুকে দেখতে পেল বলে মনে হল না। বেসিনের কল খুলে সুরো চোখ মুখে জলের ঝাপটা দিতে শুরু করল। তার পর একবার বেডের দিকে তাকিয়ে ও ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের করিডোরে সিস্টার ফুলমণির ন্যাওটা একটা কুকুর রাতের দিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। রোজ তাকে এঁটোকাটা খেতে দেন ফুলমণি। একটা নামও দিয়েছেন কুকুরটার, বাজামণি। হঠাৎ বিশ্রী সুরে ডাকতে শুরু করে দিল বাজামণি। সুরো যত এগিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে যেতে যেতে কুকুরটা ততই তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। পাণ্ডুর ভয় হল, সুরোকে না আবার কামড়ে দেয়!

পুরো ব্যাপারটাই এমন আকস্মিক ঘটে গেল, উঠে দাঁড়িয়ে পাণ্ডু যে সুরোকে আটকাবে, তার সময়ও পেল না।

জীবনে এই প্রথম ওর কোনও পেশেন্ট চিকিৎসা চলার সময় ওয়ার্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছে! তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল পাণ্ডু। দেখল, সুরো লাশঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হালকা কুয়াশা ঘিরে আছে, ওর শরীরকে! এতক্ষণ পর একটু ধাতস্থ হয়ে পিছন থেকে ও ডাকল, 'সুরো, এই সুরো, যাচ্ছিস কোথায়?'

প্রশ্নটা বোধ হয় ওর কানে গিয়েছে। গেটের আলোয় পাণ্ডু স্পষ্ট দেখল, বাঁকের মুখে

সুরো একবার পিছন ফিরে তাকাল। কী করুণ ওর মুখটা! পলকের জন্য দাঁড়িয়ে... সুরো বিড়বিড় করে কী যেন বলল। কিন্তু পাণ্ডু শুনতে পেল না। সুরো ফের হাঁটতে লাগল মর্গের দিকে। দূরে সরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বাজামণি এ বার অদ্ভুত সুরে ডাকছে। ওর ডাক শুনেই মনে হচ্ছে, মারাত্মক ভয় পেয়েছে। ভয় পাওয়ার কথা শিসপাহাড়িকে জানিয়ে দিচ্ছে। শিসপাহাড়ি একটা মায়াবী জায়গা, পাণ্ডু তা বিলক্ষণ জানে। অনেক রহস্যময় ঘটনার কথা ও শুনেছে। অর্ধেক বিশ্বাস করেছে, অর্ধেক করেনি। কিন্তু একটু আগে ওর চোখের সামনে যা ঘটে গেল, তা অবিশ্বাস করবে কী করে?

ঠান্ডা বাতাস গায়ে এসে ঝাপটা মারছে দেখে, পাণ্ডু ফের ওয়ার্ডের ভিতর ঢুকে এল। সিস্টার ফুলমণিকে ফোন করবে কি না, ভাবার সময়ই ওর চোখ গেল বেডের দিকে। আরে, ওই তো সুরো শুয়ে আছে নিথর হয়ে। তা হলে বেড থেকে নেমে কে বাইরে চলে গেল? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাণ্ডু তাকিয়ে রইল বেডের দিকে। ওর মনে হল, বুকের ভিতর কেউ যেন হাতুড়ি মারছে। সিস্টার ফুলমণি বলেন, মারা যাওয়ার পর মানুষের আত্মা নাকি দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। একটু আগে তা হলে কি সুরপতির শরীর ছেড়ে ওর আত্মা বেরিয়ে গেল। সেই কারণেই কি কুকুরটা ভয় পেয়ে ডাকছিল? দ্রুত পায়ে হেঁটে পাণ্ডু বেডের কাছে গেল।

সুরোর নাড়ি টিপে দেখল, কোনও স্পন্দন নেই!

৪

বিপদে পড়লে শিসপাহাড়িতে মাত্র দু'জনের কাছেই ছুটে যেতে পারে কুন্তী। একজন ডাঃ পাণ্ডু, অন্যজন সিস্টার ফুলমণি। বাপ্পার মেসেজটা পড়ে তাই প্রথমেই ডাঃ পাণ্ডুর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল ওর।

ঘড়িতে তখন প্রায় বারোটা বাজে। এত রাতে ফোন করা উচিত হবে কি না, ও বুঝতে পারছিল না। ডাঃ পাণ্ডুর ডিউটি ভোর ছ'টা পর্যন্ত। রাতের ডিউটিতে অবশ্য অতক্ষণ কোনও ডাক্তারই ইমার্জেন্সিতে থাকে না। রাত একটা-দেড়টা নাগাদ কোয়ার্টারে ফিরে যায়। ডাঃ পাণ্ডুও নিশ্চয়ই এতক্ষণে কোয়ার্টারে ফিরে গিয়েছে। সারা দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম নিচ্ছে। ফোনটা কোনও পেসেন্টের জন্য করতে হলে, কুন্তী দ্বিধাগ্রস্ত হত না। কিন্তু ব্যক্তিগত দরকারে মানুষটাকে বিব্রত করতে ওর মন সায় দিল না।

পাশের ঘরে রুমালি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু কুন্তীর চোখে ঘুম নেই। সোফায় বসে ও চিন্তা করছে, 'অলরেডি স্টার্টেড জার্নি ফর আ নিউ ওয়ার্ল্ড' বলতে বাপ্পা কী বুঝিয়েছেন? মেসেজটা খুলে ফের দু'তিনবার পড়তেই ওর মাথা গুলিয়ে গেল। মাঝে বাবার সঙ্গে কথাবার্তায় কুন্তী বুঝতে পারছিল, চোখ সংক্রান্ত নতুন কোনও গবেষণা নিয়ে উনি জড়িয়ে পড়েছেন। কথাটা শুনে তখন কুন্তীর খুব ভালোই

লেগেছিল। তখন বাপ্পা বলেছিলেন, মাস ছয়েক আগে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে নাকি পরিচয় হয়েছে। সেই ভদ্রলোক চোখের ভেষজ একটা ওষুধের সন্ধান পেয়েছেন। সেই ওষুধ আবিষ্কার করতে পারলে নাকি সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে। সেই ভেষজ পদার্থটা নাকি কোন এক দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে সেখানে যাওয়ার প্ল্যান করছিলেন বাপ্পা, কুন্তী এটুকু জানে। 'নিউ ওয়ার্ল্ড' বলতে কি বাপ্পা সেই দুর্গম জায়গাটার কথাই বলেছেন? বাপ্পার কাছে তো ওটা নতুন জগৎই। কিন্তু, ওঁর যা বয়স বা শরীরের অবস্থা, তাতে দুর্গম পাহাড়ি জায়গায় যাবেন কী করে?

দু' লাইনের মেসেজ। দ্বিতীয় লাইনটা নিয়েও ভাবতে লাগল কুন্তী। 'প্লিজ কাম অ্যান্ড মিট মি অ্যাট শিসপাহাড়ি জংশন টুমরো নাইট অ্যাট টু থার্টি নাইন এ এম শার্প।' বোঝাই যাচ্ছে, ট্রেনে করে সেই নতুন জগতে যাচ্ছেন বাপ্পা। হয়তো বেশ কিছুদিন সেখানে থাকতে হবে। সেই কারণেই বাপ্পা একবার ওর সঙ্গে দেখা করতে চান। শিসপাহাড়ি রেলওয়ে জংশনে সচরাচর যাওয়া হয় না কুন্তীর। রাতের দিকে কোনওদিন যায়নি। হাসপাতাল থেকে জংশন যাওয়ার রাস্তাটা জনবিরল। একপাশে ধূ ধূ ফাঁকা জমি, খালবিল, পরিত্যক্ত জনপদ। অন্য পাশে ঘন জঙ্গল। পাকদন্ডি বেয়ে সোজা পাহাড়ে উঠে যাওয়া যায়। পথে বেশ কয়েকটা ঝরনাও আছে। অনেকে দেখেছে, সেই ঝরনায় নাকি জল খেতে আসে হিংস্র প্রাণী। আদিবাসীদের মুখে শোনা, ফলে একটু অতিরঞ্জিত তো হবেই। হিংস প্রাণী ওখানে আসবে কোত্থেকে?

কাল রাত দুটো বেজে উনচল্লিশ মিনিটে বাপ্পা দেখা করতে বলেছেন। অত রাতে একা জংশনে যাবে কী করে, কুন্তী ভেবে পেল না। বিকেল বিকেল ওখানে চলে যাওয়া যায়। কোনও রোগীকে ভুবনেশ্বরে ট্রান্সফার করতে হলে, অথবা ওষুধপত্তর আনার জন্য— হাসপাতাল থেকে একটা গাড়ি বিকেল তিনটের সময় যায় স্টেশনের দিকে। কিন্তু সেই গাড়িতে জায়গা পাওয়া মুশকিল। আর জায়গা পেলেও, স্টেশনে পৌঁছে প্রায় দশ ঘণ্টা ওকে বসে থাকতে হবে প্ল্যাটফর্মে। হাসপাতাল ফেলে অতক্ষণ সময় ওখানে নষ্ট করা যাবে না। বিশেষ করে, বিষাক্ত মদ খেয়ে অসুস্থ হওয়া অনেক পেশেন্ট এখন ভর্তি আছে।

ওকে সুপরামর্শ দিতে পারে, একমাত্র ডাঃ পাণ্ডু। এই হাসপাতালে যাকে ওর সব থেকে বেশি ভালো লাগে।

সুদর্শন, মিষ্টভাষী। ওর থেকে দু'তিন বছরের সিনিয়র। ডাক্তার হিসেবেও দারুণ। দিনের পর দিন কাছ থেকে ওকে দেখছে কুন্তী। এমন ডেডিকেটেড মানুষ আর কখনও ওর চোখে পড়েনি। হাসপাতালে আজ পর্যন্ত কারও কাছে ডাঃ পাণ্ডুর নিন্দে কুন্তী শোনেনি। কাজের সময় ওর সঙ্গে কখনও ব্যক্তিগত কথাবার্তা হয় না বটে, কিন্তু চোখেরও তো একটা ভাষা আছে। সেটা দেখে কুন্তীর মনে হয়, ডাঃ পাণ্ডুও ওকে খুব পছন্দ করে। কোনও দরকারের জন্য ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের জন্য ছুটে আসে।

ডাঃ পাণ্ডুর প্রতি ওর দুর্বলতার কথা সিস্টার ফুলমণি জানেন। কুন্তী হাসপাতালে

যোগ দেওয়ার দিনই হাসতে হাসতে উনি বলেছিলেন, 'মারাংবুরু তুকে ঠিক জায়গাতেই লিয়ে এসেইনছেন। তুর মরদের কাছে। কুন্তীর মরদ পাণ্ডু। মহাভারতে লিখা আছে, লয়?' শুনে সেদিন লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল কুন্তীর। তার পর থেকে ফুলমণি মাঝে মাঝেই ঠাট্টা করেন, 'তুর কুনও চিন্তা লাই রে দিদিমণি। মুনের কথা উবে কইয়ে দে। উর মতোন মরদ কুথাও পাবিক লা রে। তু যদি কইতে লারিস, মোকে বলিস।'

সিস্টার ফুলমণি প্রোপোজ করতে বলেন। তা হয় নাকি? আদিবাসী সমাজে এ সব হয়। মরদ পছন্দ করার অধিকর মেয়েদের আছে। কিন্তু কুন্তী যে সমাজে বড়ো হয়েছে, সেখানে বাবা-মায়েদের সিদ্ধান্তই শেষ কথা।

গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারের মেয়ে ও। খণ্ডগিরির কাছে ওদের দেশের বাড়িতে এখনও নিয়মিত রাধাকৃষ্ণের পুজো হয়। ওদের যৌথ পরিবারে ভয়ানক আপত্তি উঠেছিল, যখন কুন্তী ডাক্তারি পড়ার জন্য হোস্টেলে যায়। মেয়ে মরাঘরে গিয়ে লাশ কাটে, শোনার পর তো ওর ঠাকুর দালানে ওঠাই বন্ধ হয়ে যায়। মা তখন কান্নাকাটি করতেন, কোনও বৈষ্ণব পরিবার ওকে বউ হিসেবে গ্রহণ করবে না ভেবে।

বিয়ে না হলে মেয়ের কী হবে? মা ভূত-পেরেত, দত্যি দানোয় খুব বিশ্বাস করতেন। চুপি চুপি লিঙ্গরাজ মন্দিরে গিয়ে মা একবার কোনও এক পাণ্ডার কাছ থেকে একটা মন্ত্রপুত মাদুলি নিয়ে এসে, ওর হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। মা তার পর থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যান, কোনও অশুভ আত্মা কোনও দিন ওকে ছুঁতে পারবে না।

সেই মাদুলি এখনও ওর হাতে আছে। কিন্তু মা নেই। মায়ের কথা ভেবে কুন্তী একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'দিদি, তুমি এখনও ঘুমোওনি?'

পাশের ঘর থেকে রুমালি উঠে এসেছে। প্রশ্নটা ও ঘুমজড়ানো চোখে হাই তুলতে তুলতেই করল। তার পর ধপ করে বসে পড়ল সোফায়।

কুন্তী বলল, 'ঘুম আসছে না রে। বাপ্পার জন্য খুব মন খারাপ করছে।'

'তাই বলে তুমি সারা রাত্তির জেগে থাকবে? এখানে বসে চিন্তা করে তুমি কিছু করতে পারবে দিদি? তা হলে কেন শুধুমুধু শরীরটাকে কষ্ট দিচ্ছ। প্রভু জগন্নাথের উপর সবকিছু ছেড়ে দাও না।'

'বসে বসে এতক্ষণ তো তাঁকেই স্মরণ করছি। নিত্যি তাঁর পুজো করি, অথচ দ্যাখ, আমার কপালেই যত দুর্ভোগ। বাপ্পার যদি খারাপ কিছু হয়, তা হলে আমার কী হবে বল তো?'

'এ কথা বলছ কেন দিদি? তোমাকে তো কারও উপর নির্ভর করে বাঁচতে হচ্ছে না। তুমি নিজে রোজগার করো। তুমি কি জানো, বাবাঠাকুর কত লোককে বলে, আমার মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার আর কোনও চিন্তা নেই।'

'বাপ্পারা ও রকম কথা বলেই। কিন্তু আমাকে নিয়ে বাপ্পার কত দুঃশ্চিন্তা, তা আমি জানি।'

'কী চিন্তা দিদি? তোমার বিয়ে নিয়ে চিন্তা?

'ছাড় ও সব কথা। এখন ভালো লাগছে না। ভাবছি, কাল সকালের ট্রেনে ভুবনেশ্বরে যাব। তুইও আমার সঙ্গে যাবি। যদি যাই, চট করে সবকিছু গুছিয়ে নিস, কেমন? হয়তো ওখানে কয়েকটা দিন থাকতে হবে।'

অন্য সময় ভুবনেশ্বরে যাওয়ার কথা উঠলেই রুমালি লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু এ বার উৎসাহ দেখাল না। উলটে, ও বলল, 'যাওয়ার আগে পাণ্ডু ডাগদারবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলো না দিদি।'

'ইচ্ছে তো ছিল কথা বলার। কিন্তু এত রাতে...মন চাইল না রে।'

সোফায় সোজা হয়ে বসে রুমালি বলল, 'একটা সত্যি কথা বলো তো দিদি। পাণ্ডু ডাগদারবাবুকে তুমি খুব ভালোবাস, তাই না?'

'হঠাৎ তোর এ কথাটা মনে হল কেন?'

'ঘুমের ঘোরে ডাগদারবাবুর সঙ্গে তুমি কথা বলো যে। ডাগদারবাবুটাকে তুমি বিয়ে করে ফেল না দিদি। তোমাদের খুব মানাবে। বাবাঠাকুরেরও আর তখন কোনও চিন্তা থাকবে না।'

অন্য সময় হলে কুন্তী ধমক দিত। বলত, 'আচ্ছা পাকা মেয়ে হয়েছিস তো তুই।' কিন্তু আজ ওর মন ভালো নেই। একটু অন্যমনস্কও। ও বলে ফেলল, 'ভালোবাসা কি একতরফা হয় রে?' কথাটা বলেই নিজেকে ও সামলে নিল। রুমালি অল্পবয়সি মেয়ে। ওর সঙ্গে এ সব আলোচনা করা ঠিক না।

এই বয়সে পুরুষ সম্পর্কে নানা কৌতূহল জাগে মেয়েদের। ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে। কুন্তী ইদানীং লক্ষ করেছে, বাজার থেকে সবজি কিনতে গিয়ে আজকাল একটু দেরি করে ফিরছে রুমালি। ওর কানে এসেছে, বাজারে জোসেফ সোরেন বলে একটা ছেলে ফল বিক্রি করে। তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুমালি হাসি ঠাট্টা করে।

ছেলেটার সঙ্গে ফোনেও বোধ হয় মাঝে মাঝে কথা বলে। কোয়ার্টারে ফেরার পর কখনও ওর চোখে পড়ে গেলে রুমালি তাড়াতাড়ি ফোন ছেড়ে দেয়।

ডাঃ পাণ্ডুকে নিয়ে রুমালির উৎসাহে জল ঢেলে দেওয়ার জন্যই কুন্তী বলল, 'অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। তুই যা, শুয়ে পড়। হ্যাঁ রে, কাল সকালে একটা কথা আমাকে মনে করিয়ে দিতে পারবি।'

সোফা ছেড়ে উঠে, আড়মোড়া ভেঙে রুমালি বলল, 'কী কথা গো?'

'ভাবছি, বাপ্পার জন্য গাজরের হালুয়া নিয়ে যাব। কাল সকাল সকাল বাজারে গিয়ে ভালো দেখে গাজর কিনে আনবি। যত তাড়াতাড়ি পারিস, হালুয়াটা তুই বানিয়ে রাখবি। আর শোন, বাজারে গিয়ে কারও সঙ্গে গল্প করতে বসিস না যেন।'

শুনে মুখটা শুকিয়ে গেল রুমালির। আর কোনও কথা না বলে ও নিজের ঘরে চলে গেল। কোয়ার্টারে তিন তিনটে বড়ো বড়ো ঘর। কুন্তী শুনেছে, অনেক আগে বাংলা ধরনের এই কোয়ার্টারে থাকতেন হাসপাতালের ডেপুটি সুপার উইলিয়াম লংম্যান। রহস্যজনকভাবে উনি এই কোয়ার্টারেই মারা যান। তার পর নাকি দীর্ঘদিন কেউ বসবাস করেননি। অশরীরী উৎপাতের জন্য। বছর কয়েক আগে মেরামতি করে

এই কোয়ার্টারে থাকতে দেওয়া হল ডাঃ রাধাপদ সাহ বলে একজনকে। কিন্তু, রিটায়ার করার আগে হঠাৎ তিনি চাকরি ছেড়ে চলে যান। ফ্যামিলি নিয়ে থাকতেন। বোধ হয় প্রেতাত্মার ভয়ে টিকতে পারেননি। উনি চলে যাওয়ার পর এই কোয়ার্টারটা ওকে দেওয়া হয়েছে।

আগে ওর ঘরেই মেঝেয় বিছানা পেতে শুত রুমালি। শীতের সময় ওর কষ্ট হয় দেখে, একটা ঘর রুমালিকে ছেড়ে দিয়েছে কুন্তী। ওকে নিজের বোনের মতোই দেখে। সত্যি কথা বলতে কী, রুমালি না থাকলে, হাসপাতালের ডিউটি সেরে, ঘর গেরস্থালি একা সামলাতে পারত না ও। বছর খানেক আগে কুন্তী যখন শিসপাহাড়িতে চাকরিটা নেয়, তখন বাপ্পা জোর করে রুমালিকে সঙ্গে দিয়েছিলেন। তখন রোগা পটকা টাইপের ছিল। এখন তরতর করে বেড়ে উঠেছে। সুশ্রী, দেখে মনেই হয় না, মালির মেয়ে। মাস ছয়েক আগে রুমালির বাবা একবার শিসপাহাড়িতে এসেছিল। তখন ইনিয়ে বিনিয়ে বলে গিয়েছে, 'বেটির বিয়া দিতে হবেক মা। উকে ইবার লিয়ে যাবক।'

রুমালি চলে যেতেই কুন্তী নিজেও সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। দাঁড়াতে গিয়ে ও টের পেল শরীরটা ছেড়ে দিয়েছে। শরীরের আর দোষ কি? পেশেন্টদের জন্য যা দৌড় ঝাঁপ করতে হয়, সেটা ও-ই জানে। সেই সঙ্গে সহ্য করতে হয়, মারাত্মক টেনশন। যম বাজার সঙ্গে তখন যেন যুদ্ধ করতে বসে। চিকিৎসা করার সময় ওর জেদ ধরে যায়। কেউ মারা গেলে মনে হয়, হেরে গেল। মা বলতেন, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে...ভগবানের ইচ্ছেতে হয়। মানতে ইচ্ছে করে না কুন্তীর। চিকিৎসা বিদ্যেটার এত উন্নতি হয়েছে, চেষ্টায় মৃত্যু পর্যন্ত রোধ করা যায়। এই যে আজই ... বুধিরাম বলে ছেলেটা বিষমদ খেয়ে প্রায় কোমায় চলে গিয়েছিল, তাঁকে তো প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন ডাঃ পাণ্ডু। শুনলে মা বলত, 'তোরা কি ফিরিয়ে আনছিস মা? এ তো ছেলেটার বউয়ের সিঁদুরের জোর। তোরা তো নিমিত্ত মাত্র।'

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল কুন্তী। চোখ বুজে বাপ্পার কথা ভাবতে লাগল। বহুদিন আগে বাপ্পাকে ও একবার ডাঃ পাণ্ডুর কথা বলেছিল। বাপ্পা তখন বলেছিলেন, 'ছেলেটার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিস মা। বাঙালি তো... ওদের কালচারই আলাদা।' বাঙালিদের সম্পর্কে খুব শ্রদ্ধ বাপ্পার। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে পড়তেন, সেটা কুন্তী প্রথম বাপ্পার মুখেই শুনেছিল। ওদের দেশের বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের মূর্তির পাশে আরও একজনকে মা পুজো করতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। কাল রাতে যদি ডাঃ পাণ্ডু ওর সঙ্গে রেলওয়ে জংশনে যেতে রাজি হয়, এই সুযোগে তা হলে বাপ্পার সঙ্গে ওর আলাপ হয়ে যাবে। কিন্তু ডাঃ পাণ্ডু কি অত রাতে সঙ্গে যেতে রাজি হবে?

কতক্ষণ শুয়েছিল কুন্তীর আন্দাজ নেই। হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙে গেল। দূরে কোথাও অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে ডাকছে। কী করুণ সেই বিলাপ! ছোটোবেলায় দেশের বাড়িতে মা বলতেন, আত্মারা কাছাকাছি এলে অবলা জীবই নাকি প্রথম তা টের পায়। তখন ওরা আর্তস্বরে ডাকে। শুনে ভয় পেয়ে লেপের তলায় ঢুকে পড়ত কুন্তী।

ডাক্তারি পড়তে গিয়ে আর মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে এখন অবশ্য ওর সেই ভয়টা আর নেই। কিন্তু ও বিশ্বাস করে, আত্মা বলে সত্যিই কিছু আছে। তবে তারা ভয়ানক কিছু নয়। এই কোয়ার্টারেই রোজ তার অস্তিত্ব ও টের পাচ্ছে। কুকুরের ডাক ক্রমেই ওর কোয়ার্টারের দিকে আসছে শুনে, বিছানায় শুয়ে কুন্তী জানলাটা খুলে দিল। তার পর অন্ধকারের মধ্যেও যা ও দেখল, তাতে শিউরে উঠল।

কুন্তী দেখল, দানবের মতো একটা লোক সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের দিক থেকে মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে। ইউক্যালিপটাস গাছের মতো লম্বা। তার প্রতি পদক্ষেপে দম্ভ আর ঔদ্ধত্য। লোকটার এক হাতে গদার মতো একটা অস্ত্র। অন্য হাতে পুতুলের মতো কী যেন ঝুলছে। ভালো করে তাকাতেই পুতুলটাকে চিনতে পারল কুন্তী। এ তো সেই আদিবাসী ছেলেটা... বুধিরাম!! আজ সন্ধেবেলাতেও কুন্তী যাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। লোকটা ক্রুর দৃষ্টিতে ওর কোয়ার্টারের দিকে একবার তাকিয়েই পাহাড়ের দিকে হাঁটতে লাগল। ভয়ে কুন্তী প্রভু জগন্নাথের স্তব আওড়াতে লাগল।

৫

বাড়িতে ফিরে উঠোন থেকেই সিস্টার ফুলমণি দেখলেন, চাঁপামণি তখনও ঘুমিয়ে। ওর সর্বাঙ্গ কম্বল চাপা দেওয়া। মারাত্মক ঠান্ডায় সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, মেয়েটা হাঁটু ভাঁজ করে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। মাস দেড়েক আগে তলপেটে ব্যথা নিয়ে চাঁপা হাসপাতালে ভর্তি ছিল। তখন ওর পেটে আলসারের চিকিৎসা করেছিলেন ডাগদার সুবোধ সাহু। ব্যথাটা বোধ হয় পুরোপুরি সারেনি। সেইজন্যই কখনও কখনও মেয়েটা পেটে বালিশ চেপে শুয়ে থাকে। কথাটা মনে হওয়ায় সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে, তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠে এলেন ফুলমণি। কাল রাতে ডিউটিতে যাওয়ার সময়ও চাঁপা কিছু বলেনি। বললে, তিনি সঙ্গে করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেন। কুন্তী দিদিমণিকে বলতেন, ওষুধ দিতে। ইস, রাতে নিশ্চয়ই ব্যথায় মেয়েটা খুব কষ্ট পেয়েছে!

নাইট ডিউটি থাকলে অন্যদিন ফুলমণি বাড়ি ফিরে এসে দেখেন, চাঁপা ঘুম থেকে উঠে উঠোন ঝাঁট দিয়ে রেখেছে। গাছ থেকে ঝরে পড়া পাতা এককোণে ডাঁই করে ফেলেছে। পাতকুঁয়ো থেকে জল তুলে রান্নাঘরে রেখে এসেছে। বাথরুমে গিজার চালিয়ে দিয়েছে, যাতে গরম জলে ফুলমণি স্নান সেরে নিতে পারেন।

মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর থেকে, ফুলমণি আজকাল বাথরুম থেকে বেরিয়েই গরম কফি মুখের সামনে পেয়ে যাচ্ছেন। একটু পরেই সকালের খাবারটাও। ঘরের কাজকর্মে চাঁপা খুব ওস্তাদ মেয়ে। বিয়ে হওয়ার পর যে বাড়িতে যাবে, সেই সংসারটা খুব সুন্দর চালাতে পারবে। কিন্তু, বাপটু কিসকু ওকে রেপ করার পর থেকে মেয়েটা না ঘরকা, না ঘাটকা হয়ে গিয়েছে।

ওর বাবা আর মা গুজরাতে দিনমজুরি খাটতে গিয়েছে। এদিকে, হাসপাতাল থেকে

ওকে বিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। ওর অন্য আত্মীয়রাও বস্তিতে ঠাঁই দেয়নি। একটা অসুস্থ মেয়ের দায় কে নেবে? তা ছাড়া, ওর পেট চালানোর একটা খরচা আছে। কয়েকদিনের জন্য নাকি চাঁপা কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। ফুলমণি তখন শুনেছেন, শিসপাহাড়ির জঙ্গলে নাকি ওকে দেখা গিয়েছে। আদিবাসী বস্তির কেউ ওকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি। দিনতিনেক আগে গাঁয়ের দিকে গিয়েছিলেন ফুলমণি। ফেরার পথে দেখেন, মরনখাদের কাছে এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে চাঁপা কাঁদছে। মরনখাদের দিকে লোকে দিনের বেলাতেও যায় না। ওখানে নাকি পেরেত আছে। কথা বার্তায় ফুলমণি বুঝতে পারেন, মেয়েটা জীবন সম্পর্কে একেবারে হতাশ হয়ে গিয়েছে। বুঝিয়ে শুঝিয়ে ওকে তাই নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন।

ঘরে ঢুকে ফুলমণি ডাকলেন, 'উঠ রে চাঁপা, উঠ। সকাল হইয়ে গেনছে।'

বারকয়েক ডাকার পরও চাঁপার ঘুম ভাঙে না। কী হল মেয়াটার? কাছে গিয়ে কম্বলে ধাক্কা মারলেন ফুলমণি। 'হাই রে, উঠ বিটি। শুয়া আছিস ক্যান? শরীল খারাপ?'

গায়ের কম্বল সরিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল চাঁপা। বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, 'তু এইসে গেনছিস মাসি। ক'টা বানজে?'

চোখের কোণে কালি, অনিদ্রার চিহ্ন চাঁপার সারা মুখে। দেখে ফুলমণি বললেন, 'কী হইনছে তুর? রেতে ঘুমাইস লাই?'

'রেতে খুব ডর লাগছিল মাসি। তুর ঘরকে পেরেত আছে বটে।'

ফুলমণি অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, 'কী বুইলছিস তু বিটি? পেরেত আসবেক কুথা থেইকে?'

'হ গ মাসি। মো নিজের চোখে দেখেইনছি। গাওলি গাছের উপর থেইকে নেইমে এলক। উঠানে কী য্যান খুঁজছিলক। তাপ্পর, জানলার কাছে এইসে কী শুধাইল। মো বুইতে পারি লাই গ।'

'তু ভুল দেখেনছিস বটে। মো তো কুনওদিন পেরেত দেখি লাই!'

'লা গ মাসি ভুল দেখি লাই। তু জানগুরুকে লিয়ে আয় বটে। মো দেখেইনছি... রেতে মোকে ঘুমাইনতে দেয় লাই। মো তুর ইখানে থাইকব না মাসি।'

'থাইকবি না তো কুথাকে যাবি? তুর কে আছে বটে?'

'মোর পিসসির ঘর বান্দোয়ানে। মো সিখানে যাবক। তু মোকে বাসসের ভাড়া দে।'

শুনে মনে মনে বিপদ গুনলেন ফুলমণি। সত্যিই মেয়েটা খুব ভয় পেয়েছে। প্রসঙ্গটা ধামাচাপা দেওয়া দরকার। বাপটু কিসকুর কথা তুললে ও হয়তো স্বস্তি পাবে। সেজন্য তিনি বললেন, 'শুন মেয়া, আসপাতালে আজ কী হইনছে জানিস? বাপটুর ডেডবডি পুলিশ লিয়ে এসেইনছে।'

ফুলমণি ভেবেছিলেন, খবরটা শুনে চাঁপার মুখের রং বদলাবে। হয়তো বলবে, 'ঠিক হইনছে। মারাংবুরু উকে সাজা দিয়েনছে।' কিন্তু, তেমন কিছুই হল না। বাপটু কী করে মারা গেল, সেটা জানারও কোনও আগ্রহ দেখাল না চাঁপা। মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে

রইল। সেটা দেখে ফুলমণি নরম গলায় বললেন, 'আজ রেতে মো ঘরে থাকবক। দেখি, পেরেত আসসে কি না। তু আখুন যা, মোর লেগ্যে কফি লিয়ে আয়।'

চাঁপা সামনে থেকে সরে গেল বটে, কিন্তু মন বদলাল কি না ফুলমণি বুঝতে পারলেন না। আর কেউ না জানুক, তিনি জানেন গাওলি গাছে প্রেতাত্মা আছে। কার প্রেতাত্মা, সেটাও তাঁর অজানা নয়। সত্যি কথা বলতে কী, প্রেতাত্মাটাকে তিনিই গাছে বেঁধে রেখেছেন। কাউকে কিছু বলেননি। এতদিন কেউ জানতেও পারেনি।

আসলে তিনি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ থাকে না। তাই জানবেই বা কী করে? কিন্তু, এ বার বোধ হয় চাঁপার কাছে আর গোপন করা যাবে না। এই প্রথম ফুলমণি উপলব্ধি করলেন, চাঁপাকে আশ্রয় দিয়ে ঠিক করেননি তিনি। যুবতী মেয়ে, ওকে একা বান্দোয়ানে পাঠাতে তিনি পারবেন না। আজ না হয় কাল, সত্যি কথাটা ওকে বলতেই হবে। আর তার পরই কথাটা সারা শিসপাহাড়িতে রাষ্ট্র হয়ে যাবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফুলমণি গাওলি গাছের দিকে রাগ রাগ মুখে তাকালেন। দিনের বেলায় কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। আঁধার হয়ে গেলে গাছ থেকে নামিয়ে আনবেন মরদটাকে। মনের সুখে ঝাঁটাপেটা করবেন।

দুঃখের কথা আর কাকেই বা বলবেন তিনি! বাড়ির উঠোনে গাওলি গাছে যাকে তিনি বেঁধে রেখেছেন, সে তো নিজেরই মরদ জঙ্গল হেমব্রম। যতদিন বেঁচে ছিল, জ্বালিয়ে গিয়েছে। মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকত সব সময়।

হাসপাতালেরই স্টাফ ছিল। কোনওদিন ঠিক সময়ে ডিউটিতে যেত না। গেলেও নেশার ঘোরে উলটোপালটা কাজ করে ফেলত। ফুলমণির মুখের দিকে তাকিয়ে ডেপুটি সুপার লংম্যান সাহেব ওকে কিছু বলতেন না।

কিন্তু, পরে বাধ্য হয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। লজ্জায় ফুলমণি তাঁর মরদকে হাসপাতালের ধারে কাছেই ঘেঁষতে দিতেন না।

জঙ্গলকে বিয়ে করতে চাননি ফুলমণি। কিন্তু, সেই সময় এমন পরিস্থিতি হয়েছিল, গাঁয়ের মানুষের চাপে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে বাধ্য হন মাতালটাকে। অর্ধেক রাতে বাড়িতেই ফিরত না। বস্তি বা জঙ্গলে মদের আড্ডায় পড়ে থাকত। লিভারটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বছর তিনেক আগে মরে পড়ে ছিল গাওলি গাছের তলায়। ঘর পর্যন্ত যাওয়ারও শক্তি ছিল না সম্ভবত। রাতের ডিউটি সেরে এসে ফুলমণি আবিষ্কার করেছিলেন তাকে। বাড়ির কাছেই গোর দেওয়ার পর স্বস্তি পেয়েছিলেন তিনি। যাক, জীবন থেকে একটা আপদ বিদেয় হল। কিন্তু, তিন দিনের মাথায় খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠানে ফুলমণি বুঝতে পেরেছিলেন, অত সহজে মুক্তি তিনি পাবেন না। আত্মীয়স্বজনকে নেমতন্ন করেছিলেন তিনি। রাতে উঠোনে বসে তারা হাড়িয়া আর দেশি মদ খাচ্ছিল। সেই সময়টাও ছিল শীতকাল। হালকা কুয়াশা ছড়িয়ে চারদিকে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে হঠাৎই জঙ্গলকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিলেন ফুলমণি। সবার মাঝে বসে গ্লাসে সে চুমুক দিচ্ছে আর মিটিমিটি হাসছে। দেখে মাথা বোঁ করে ঘুরে গিয়েছিল ফুলমণির। জঙ্গল তা হলে পৃথিবী ছেড়ে যায়নি!

ভাগ্যিস, ফুলমণি ছাড়া আর কেউ ওকে সেই রাতে দেখতে পায়নি! সেদিনই তিনি টের পেয়েছিলেন, জঙ্গল প্রেতযোনি হয়েছে। মদের নেশা ওকে কবর থেকে তুলে এনেছে। বাকি জীবনেও মরদটা তাঁকে স্বস্তি দেবে না। সত্যিই, এর পর রাতের দিকে ফুলমণি যখন হাসপাতাল থেকে ফিরতেন, তখন ও পিছু নিত। হাড়িয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করত। কখনও কখনও রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ফুলমণি দেখতেন, জানলার শিকে হাত রেখে মরদটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর উৎপাতের খবর পাওয়া যেত আদিবাসী বস্তিতেও। গাঁয়ের মোড়ল এসে একবার বলেও গিয়েছিলেন, 'তু কিছু কর ফুলি। তুর মরদ... শান্তিতে থাইকতে দিবেক লাই।'

মরদের উপর খুব রাগ হয়েছিল সেইসময়। ভালো জানগুরু কোথায় পাওয়া যায়, গোপনে খোঁজ নিয়েছিলেন ফুলমণি। তখন মনে হয়েছিল, মরদটাকে এমন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে হাতের মুঠোয় থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই খবরটা এনে দিয়েছিল জোসেফের মা সোনামণি। দু'জনে মিলে একদিন চলে গিয়েছিলেন ঝাড়খণ্ডের ছানু গ্রামে। গোপনে সেখানে থেকে নিয়ে এসেছিলেন মারীচ নামের এক জানগুরুকে। আশি বছর বয়স। দাড়ি গোঁফ, মাথায় ইয়া জট। তাঁকে দেখলেই ভয় লাগে। প্রেতও নাকি পালিয়ে যায়। মারীচকে দু'হাজার টাকা আর একটা খাসি দিয়ে শিসপাহাড়িতে নিয়ে আসতে হয়েছিল।

সেই রাতের কথা মনে পড়লে এখনও ফুলমণির গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। উঠোনে একটা মাটির ঢিবি তৈরি করে তার উপর একটা অশ্বত্থ গাছের বড় পাতা রেখেছিলেন মারীচ। সেই পাতায় তেল আর সিঁদুর মাখানো।

তার পর গভীর রাতে ধুনি জ্বালিয়ে দুর্বোধ্য মন্তর পড়তে শুরু করলেন জানগুরু। তাঁর সে কী হুঙ্কার! মাঝে মাঝে কী ছেটাচ্ছেন ধুনিতে! মারীচের চোখ দুটো লাল হয়ে গিয়েছিল। মুখের থুতুতে ভিজে গিয়েছিল দাড়ি। পাগলের মতো তিনি লাফালাফি করছিলেন ধুনির চারপাশে। অবশেষে জঙ্গলের পেরেত হাজির হয়েছিল উঠোনে। অশ্বত্থ পাতায় তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন ফুলমণি।

'তু কী চাইনছিস বুল বিটি। তুর মরদ চইলে যাবেক? লা কি তুর ইখেনে বাঁধা থাকবেক?'

শেষ রাতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন মারীচ। শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ফুলমণি। পেরেতকে আবার আটকে রাখা যায় নাকি? কারও মুখে কখনও তো শোনেননি! বড়লোকদের বাড়িতে হাতি বাঁধা থাকে। তাঁর বাড়িতে পেরেত বাঁধা থাকবে, মন্দ কী? মারীচের মতো জানগুরুরা অসাধ্য সাধন করতে পারেন। তাই, তাতেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন ফুলমণি। গাওলি গাছের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে মারীচ বলেছিলেন, 'তুর মরদটাকে গাছে বেনধে দিইয়ে গেলাম ফুলমণি। আর কুথাও যেতি পারবেক না।'

মারীচ একটা মাদুলিও দিয়ে গিয়েছেন ফুলমণিকে। সেই মাদুলি সঙ্গে থাকলে জঙ্গল তো কোন ছার, অন্য কোনও প্রেতযোনি কখনও ক্ষতি করতে পারবে না। ভোরবেলায়

চলে যাওয়ার সময় মারীচ বলে গিয়েছিলেন, এখন থেকে তোর মরদ তোর কথা শুনেই চলবে। তবে তোকে একটা কাজ করতে হবে। রোজ রাতে গাওলি গাছের তলায় এক হাঁড়ি হাড়িয়া রেখে দিবি। দেখবি, ও আর তোকে বিরক্ত করবে না। উলটে, তোর বিপদে পাশে দাঁড়াবে।

এতদিন মারীচের কথামতোই সব চলছিল। সত্যিই, মরদটা আর কখনও বিরক্ত করেনি। রোজ রাতে এক হাড়ি হাড়িয়া রেখে দিতে কখনও ভোলেননি ফুলমণি। পরদিন সকালে উঠে দেখেছেন, হাঁড়ি ফাঁকা। তাতে কিছু নেই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ ফুলমণির মনে পড়ল, এই রে... কাল ডিউটিতে যাওয়ার আগে গাছের নীচে হাঁড়িতে হাড়িয়া ঢেলে যেতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। সেই কারণেই মরদটা গাছ থেকে নেমে এসে সারা রাত হাড়িয়া খুঁজে বেরিয়েছে। আসলে আদিবাসী বস্তি থেকে আসা পেশেন্টগুলোকে নিয়ে কাল রাতে ওরা এত ব্যস্ত ছিলেন, বাড়ি থেকে বেরনোর সময় হাড়িয়া রেখে যাওয়ার কথা মনেও পড়েনি। নাহ, আর ভুলে গেলে চলবে না। অন্তত, চাঁপা যতদিন থাকবে, ততদিন তো নয়ই।

'এই লে মাসি, তুর কফি।'

ঘরের ভিতর থেকে ডাক দিল চাঁপা। কফির টানে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে এলেন ফুলমণি। কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। কফির সুন্দর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মাত্র একদিনই চাঁপাকে কফি বানানো শিখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। খুব ভালো শিখে গিয়েছে। সোফায় বসে কফিতে চুমুক দিতে দিতে ফুলমণি টের পেলেন, রাত জাগার ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে। বয়স হচ্ছে, আজকাল আর রাতের ডিউটি করতে মন চায় না। এ নিয়ে মেট্রন সুধা পণ্ডার সঙ্গে একদিন মনোমালিন্যও হয়ে গিয়েছে। পরে সুপার সাহেবের মধ্যস্থতায় ঠিক হয়েছে, সপ্তাহে মাত্র একদিন ফুলমণিকে নাইট ডিউটি দিতে হবে। এই নিয়মটা চালু হওয়ার পর থেকে তিনি সেই রাতেই ডিউটি নেন, যেদিন পাণ্ডু ডাগদার আর কুন্তী দিদিমণি ডিউটিতে থাকেন। ওদের দু'জনকে ফুলমণি সন্তানের মতো ভালোবাসেন।

চাঁপা বিছানা গুছিয়ে রাখছে। কম্বলটা ভাঁজ করতে করতে বলল, 'মাসি, তু চান কইরতে যাবিক না?'

'যেছি। তু একটো কাম কইরতে পারবি বিটি?'

'কী কাম মাসি?'

'হাড়িয়া বানইতে হবেক। কিচেনে হাড়িটো আছে। তু বেইর কইরে রাখ।'

সাঁওতাল পরিবারের মেয়েদের কাছে হাড়িয়া বানানোর ব্যাপারটা জল ভাতের মতো। ছোটোবেলা থেকেই তারা শিখে যায়। দিন চারেকের মতো লাগে। প্রথমে আতপ চালের গুঁড়ো করতে হবে। একেবারে মিহি করে। তার পর মুষাকানি পাতার রস পরিমাণ মতো মেশাতে হবে সেই গুঁড়োর সঙ্গে। সেই মণ্ড থেকে ছোটো ছোটো বড়ি। গরম ভাতের সঙ্গে চার পাঁচটা বড়ি মিশিয়ে রাখতে হবে দিন চারেক। তার পর সেই ভাত নেটের উপর ফেলে ঘষে দিলে যে জারক তৈরি হবে, সেটাই হাড়িয়া।

দেখতে ঘোলের মতো সাদা। ফুলমণি গরম ভাতের হাড়িতে বড়ি মিশিয়ে রেখেছেন দিন চারেক আগে। আজ নেটে ঘষতে হবে। চাঁপাকে বললে, ও-ই করে দিতে পারবে। অন্তত খানিকক্ষণ তো ভুলে থাকবে ভূতের ভয়?

কাপের কফি শেষ করে ফুলমণি উঠে দাঁড়ালেন। বাথরুমের দিকে এগোবেন, এমন সময় মনে পড়ল ডাঃ পাণ্ডুকে একবার ফোন করা উচিত। কাল রাতে হেড ইনজুরি নিয়ে ডাগদারবাবুর যে বন্ধুটা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, তিনি কেমন আছেন জানা দরকার। বন্ধুর কিট ব্যাগটা ডাঃ পাণ্ডুকে তিনি দিয়ে এসেছিলেন। তার পরই তিনি চলে যান ফিমেল ওয়ার্ডে। রাতে আর আইসিইউতে যাওয়ার সুযোগ পাননি। ফলে ডাঃ পাণ্ডুর সঙ্গে দেখাও হয়নি। কিট ব্যাগটা হয়তো পুলিশ দেখতে চাইবে। ডাগদারবাবু যদি সেটা কোয়ার্টারে নিয়ে যান, তা হলে মুশকিল হবে। কথাটা মনে হওয়ায় মোবাইল সেট তুলে নিয়ে ডাঃ পাণ্ডুর নাম্বারে ফোন করলেন ফুলমণি। ও প্রান্তে রিং হয়ে যাচ্ছে। দু'বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও... ও প্রান্তে ডাগদারবাবু ফোন তুললেন না। তার মানে, নাইট ডিউটি করে এখন ঘুমোচ্ছেন। ইশ, এই সময়ে ফোন করা উচিত হয়নি।

মোবাইল সেটটা টেবলের উপর রেখে ফের বাথরুমের জন্য ফুলমণি পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় ফোন বেজে উঠল। এত সকালে কে আবার ফোন করল? ডাঃ পাণ্ডু নাকি? সুইচ অন করতেই ও প্রান্ত থেকে মেট্রন সুধা পণ্ডার গলা শুনতে পেলেন ফুলমণি, 'হাসপাতাল থেকে তুমি কখন বেরিয়েছ ফুলমণি?'

'আধ ঘণ্টা আগে। কী হইনছে?'

'বুধিরামের ডেথ সার্টিফিকেটটা কোথায়, তুমি জানো?'

বুধিরামকে খুব ভালো করে চেনেন ফুলমণি। একটু জোরেই বলে ফেললেন, 'বুধিরাম কখুন মারা গেনছে সুধাদি? মো তো জানি লাই।'

'আরে দেখো না, ওর বউটা এখানে পাগলামি শুরু করেছে। বলছে, বুধিরাম মরেনি। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওর ডেডবডিটা রিলিজ করে দিতে হবে। এ দিকে, ডাক্তার পাণ্ডু ওর ডেথ সার্টিফিকেট লিখে কোথা রেখে গিয়েছেন, আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। উনি ঘুমোচ্ছেন বলে ডিসটার্ব করিনি। সুপার সাহেব বললেন, তুমি হয়তো জানতে পারো। সেই কারণেই, তোমাকে ফোনটা করলাম। আচ্ছা ছাড়ছি।'

সুইচ অফ করে মুখ তুলেই ফুলমণি দেখতে পেলেন, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাঁপামণি। ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। ওর হাতের ট্রে-তে কফির কাপ। হাতটা থরথর করে কাঁপছে। পলকহীন তাকিয়ে রয়েছে চাঁপা। কাঁপা গলায় ও বলল, 'কে মারা গেনছে মাসি?'

ফুলমণি বললেন, 'তুদের বস্তির বুধিরাম।'

চাঁপার হাত থেকে ট্রে-টা পড়ে গেল। কাপ ভাঙার ঝনঝন শব্দের মধ্যে ফুলমণি দেখতে পেলেন, দরজা ধরে নিজেকে চাঁপা সামলাচ্ছে। না ধরলে ধপাস করে মেয়েটা পড়ে যাবে। দু'হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে তিনি ধরে ফেললেন। ফুলমণি বুঝতেই পারলেন না, বুধিরামের মৃত্যু সংবাদ শুনে চাঁপা কেন জ্ঞান হারাল?

ভোরে কোয়ার্টারে ফিরে ভালো করে পাণ্ডু ঘুমোতে পারেনি। না, ভয় পেয়ে নয়। সুরপতির করুণ মুখটাই ওকে জাগিয়ে রেখেছিল। পাণ্ডুর মনে হচ্ছিল, কেউ বোধ হয় জোর করে সুরোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার ইচ্ছে নেই, তা সত্ত্বেও ও যেতে বাধ্য হচ্ছে। সুরোর মুখটা তখন অসম্ভব বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। যেন সারা মুখে চকের গুড়ো স্প্রে করছে কেউ। ডাক্তারের চাকরি, প্রায়ই চোখের সামনে মৃত্যু দেখতে হয় পাণ্ডুকে। কিন্তু কখনও মৃতদেহ থেকে আরেকটা দেহ বেরিয়ে আসতে দেখেনি ও। জীবনে এ প্রথম ওর এই অভিজ্ঞতা হল। শুয়ে থাকার সময়ই একটা প্রশ্ন ওর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল, সুরোর সেই দ্বিতীয় দেহটা লাশঘরের দিকে হেঁটে গেল কেন?

অনেক চেষ্টা করেও পাণ্ডু কোনও উত্তর খুঁজে পেল না। ভোর রাতে আইসিইউ থেকে ফিরে আসার সময়, ওকে দুটো ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে হয়েছে। সুরো আর বুধিরামের। দুটো ডেডবডিকে ও মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল। একটা নোটও দিয়ে এসেছে, যাতে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এতক্ষণে নিশ্চয় পুলিশ হাসপাতাল ঘুরে গিয়েছে। নিয়মমাফিক দু'জনেরই পোস্ট মর্টেম করতে হবে। বুধিরামের ডেডবডি বস্তির লোকজন নিয়ে যাবে। কিন্তু, সুরো? ও বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে থাকবে, এটা হতেই পারে না।

পুলিশ যদি সুরোর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে ভালো, না হলে পাণ্ডু নিজেই সৎকারের ব্যবস্থা করবে। তবে তার আগে ও নিজেও একবার পুরুলিয়ায় সুরোর বাবার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে। সাহেববাঁধে ওদের বাড়িতে এখন কেউ থাকে কি না, পাণ্ডু জানে না। বিছানায় শুয়ে এ সব কথা ভাবতে ভাবতে পাণ্ডুর হঠাৎই মনে হল, আরে... সুরোর কিট ব্যাগে যে ল্যাপটপটা আছে, সেটা খুললেই তো একটা হদিশ পাওয়া যাবে! কাল রাতে কিট ব্যাগ ও আইসিইউতে রেখে এসেছিল। কিন্তু ল্যাপটপ আর প্রাচীন পুথিটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

হাসপাতালের আউটডোরে বেলা বারোটা থেকে ওর ডিউটি। ক'টা বাজে, তা দেখার জন্য পাণ্ডু বিছানায় উঠে বসল। মোবাইল ফোনের সেটটা চোখের সামনে তুলে দেখল, পাঁচটা মিসড কল রয়েছে। তিনটে কুন্তীর, বাকি দু'টো কল সিস্টার ফুলমণির। সময় বেলা সাড়ে দশটা। তা হলে এখন ক'টা বাজে? হায় ভগবান, সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছে! তাড়াতাড়ি ও সিস্টার ফুলমণিকে ফোন করল। নিশ্চয়ই কোনও ইমার্জেন্সি কেস এসেছে। না হলে উনি ফোন করতেন না। ও প্রান্তে রিং হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরছেন না। বার কয়েক চেষ্টা করে পাণ্ডু হাল ছেড়ে দিল। শিসপাহাড়িতে মাঝে মাঝে টাওয়ারে সমস্যা হয়। তখন শত চেষ্টা করেও ফোন পাওয়া যায় না। সেই রকম কোনও সমস্যা কিনা তা পরখ করার জন্য পাণ্ডু এ বার হাসপাতালের পিবিএক্সে ফোন করল। ও প্রান্তে অপারেটরের গলা শুনতে পেয়ে ও জানতে চাইল, সিস্টার ফুলমণি হাসপাতালে আছেন কী না। অপারেটর বলল, উনি এখনও ডিউটিতে আসেননি।

চোখ মুখে জল দেওয়ার জন্য বিছানা ছেড়ে নামল পাণ্ডু। আর তখনই ওর মোবাইল

ফোনটা বেজে উঠল। নিশ্চয়ই সিস্টার ফুলমণির ফোন। বোতাম টিপেই ও প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁ সিস্টার, বলুন আমাকে ফোন করেছিলেন কেন?'

'ডাঃ পাণ্ডু, আমি কুন্তী বলছি। সকাল থেকে ফোন করে যাচ্ছি, আপনাকে পাচ্ছি না কেন?'

পাণ্ডু বলল, 'ঘুমিয়ে ছিলাম। বলো, ফোন করলে কেন?'

'আপনাকে একটা কথা বলার ছিল।'

অন্য সময় যখন ডাঃ কুন্তী ফোন করে, তখন ওর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে পাণ্ডুর। ওর গলাটা খুব নরম আর মিষ্টি। অথচ আজ ভাঙা ভাঙা লাগছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'তোমার গলাটা এমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে কেন কুন্তী?'

'আমি একটা বিপদের মধ্যে পড়েছি ডাঃ পাণ্ডু।'

'বিপদ! কী বিপদ?'

'ফোনে বলা যাবে না।'

'তুমি এখন কোথায়?'

'কোয়ার্টারেই। আউটডোরে যাওয়ার আগে আপনি কি আমার কাছে আসতে পারবেন? আপনাকে একটা জিনিস দেখাব তা হলে।'

কুন্তী কি খুব কান্নাকাটি করেছে? গলার স্বরে সে রকমই মনে হচ্ছে। আর কথা না বাড়িয়ে পাণ্ডু বলল, 'একটু ওয়েট করা যাবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি ফ্রি হয়ে যাব। তার পর যেতে পারি।'

'আসবেন কিন্তু। একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।'

ও প্রান্তে লাইনটা কেটে যেতেই নিজের মোবাইল সেটটা সোফার উপর ছুড়ে ফেলে পাণ্ডু তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়ল। একেবারে আউটডোরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নেবে। ডাঃ কুন্তীর কোয়ার্টারে যাওয়ার আগে একবার সুরপতির ল্যাপটপেও ওকে চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। হাতে একদম সময় নেই। মিনিট পনেরোর মধ্যে মুখটুখ ধুয়ে, স্নান সেরে বাথরুম থেকে ও বেরিয়ে এল। রোজ সকালে ওর ব্রেকফাস্ট আসে হাসপাতালের ক্যান্টিন থেকে। পোশাক পরার ফাঁকে পাণ্ডু লক্ষ করল, টেবলে কাচের ডিশে ওর খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ক্যান্টিন থেকে হয় পুরী-তরকারি পাঠায়, নয়তো ওমলেট আর টোস্ট। ডিশের দিকে তাকিয়ে পাণ্ডুর মারাত্মক খিদে পেয়ে গেল।

ধীরে সুস্থে খাওয়া শেষ করে পাণ্ডু এ বার সুরোর ল্যাপটপ নিয়ে বসল। চালু করতেই ও দেখল, পর্দা জুড়ে আইকন। কোনটায় আগে ক্লিক করবে, ও বুঝতে পারল না। এক ধরনের মানুষ আছে, যারা খুব টেক স্যাভি। তাদের জীবনটাই বন্দি ল্যাপটপের পেজে। চট করে তারা বুঝে যায়, কম্পিউটারের কোথায় কী আছে। পাণ্ডু অতটা টেক স্যাভি নয়। আইনকগুলোতে ও চোখ বোলাতে লাগল। দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা জায়গায় ও নিজের নামটা আবিষ্কার করল। একটা আইকনের নীচে লেখা 'পাণ্ডু'। দেখেই একটু উত্তেজনা অনুভব করল ও। সুরো কি ওর সম্পর্কে কিছু লিখে গিয়েছে?

আইকনে ক্লিক করতেই পেজটা পর্দায় ভেসে উঠল। বেশ কয়েকটা পাতা জুড়ে ইংরেজিতে লেখা। কী লিখেছে সুরো? মন দিয়ে পাণ্ডু পড়তে লাগল।

"ভাই পাণ্ডু,

এই মেলটা তোকে কবে পাঠাব, নিজেও জানি না। যেদিন ইচ্ছে হবে, সেদিন পাঠাব। তাই ডেস্কটপে সেভ করে রাখছি। তুই যে হাসপাতালে চাকরি করিস, তার পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেই আমি আছি। কিন্তু সেটা এমন দুর্গম পাহাড়ি জায়গা, সেখানে সচরাচর মানুষের পা পড়ে না। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে, তোর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল শিসপাহাড়ির রেলওয়ে জংশনে। আমি খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলাম রে সেদিন। তাই কথাটা তোকে বলতে পারিনি। আমি জানি, সেজন্য তুই কিছু মনে করিসনি।

তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো আজকের নয়। সেই স্কুলের দিনগুলো থেকে। তোর কি মনে আছে, একবার স্কুলে আমি একটা অন্যায় কাজ করেছিলাম... তুই আমাকে বাঁচিয়েছিলি? রোজ ক্লাসে এসে সংস্কৃত স্যার ঘুমোতেন বলে, ওঁর অজান্তে একবার ওঁর টিকি কেটে নিয়েছিলাম, তোর কি মনে আছে সেই ঘটনাটা?

একমাত্র তুই সেই দুষ্কর্মটা দেখে ফেলেছিলি। কিন্তু পরে হেড স্যার যখন তোকে চেপে ধরেন, তখন মার খেয়েও তুই আমার নামটা বলিসনি। যদি তুই নামটা বলে দিতিস, তা হলে সেদিনই হেড স্যার আমাকে স্কুল থেকে বের করে দিতেন। কেননা, স্কুলটার নাম রামকৃষ্ণ মিশন। আমি সেদিনই বুঝেছিলাম, বন্ধুত্ব কাকে বলে।

সেদিন আরও বুঝেছিলাম, বন্ধুত্ব কখনও একতরফা হয় না রে।

দু'তিন দিন পর অসম্ভব মনোকষ্টে ভোগার পর মাকে সব কথা আমি খুলে বলেছিলাম। শুনে মা বলেছিল, 'তোদের এই বন্ধুত্ব এক জন্মের নয় বাবা। যে ছেলে তোর জন্য এত শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারে, সে নিশ্চয়ই তোর অনেক জন্মের বন্ধু। তুই কখনও ওর বন্ধুত্ব অস্বীকার করিস না। পারলে একদিন প্রতিদান দিস।'

মায়েরা অনেক কঠিন কথা সহজ করে বলতে পারে। এত বছর পরে হঠাৎ তোকে রেলওয়ে জংশনে দেখে মায়ের সেই কথাগুলো আমার মনে পড়ছিল। এই জন্মে আমরা যা কিছু করছি, সবই আগের জন্মের সম্পর্কের জেরে করছি। আমাদের সম্পর্কগুলোও আগের জন্মের মতোই রয়ে গিয়েছে।

এই জনবিরল জায়গায় দিন কাটাচ্ছি বলে আমি এখন জাগতিক অনেক কিছুর ঊর্ধ্বে। তাই জন্মান্তরের এই বিশ্বাসটা ক্রমশ আমার মধ্যে দৃঢ় হচ্ছে। আমি জানি, আরও অনেকের মতো তুইও নিশ্চয় সেই সময়টায় খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলি, যখন ডাক্তারি পড়া ছেড়ে আমি উধাও হয়েছিলাম। বিশ্বাস করবি কি না জানি না, আমি কিন্তু ডাক্তার হতেই চেয়েছিলাম। মনে আছে, ফার্স্ট ইয়ারে যেদিন অস্টিওলজির পাঠ শেখানোর জন্য প্রথমবার স্যার আমাদের ডিসেকশন হলে নিয়ে যান, সেদিন হলঘরে মরা মানুষের বিশ্রী গন্ধে তুই বমি করে ফেলেছিলি। তুই ডাক্তারি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলি। আমি সেদিন তোকে আটকেছিলাম।

কিন্তু সেই আমিই একটা সময় ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। কারণ খণ্ডগিরির এক সাধুর কাছে আমি জানতে পারলাম, ডাক্তার হওয়ার জন্য আমি জন্মাইনি। পূর্বজন্মে আমি একজন গবেষক ছিলাম। এই জন্মেও আমাকে গবেষণা করতে হবে।

চার পাঁচ বছর আগে আমি একটা অদ্ভুত জিনিস নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলাম। সেটা ভেষজ গবেষণা। এই শিসপাহাড়ি অঞ্চলে অগ্নিবলা নামে নাকি এক ধরনের গাছ জন্মায়, যার পাতা বেঁটে চোখে লাগালে মানুষের দিব্যদৃষ্টি হয়। গাঢ় অন্ধকারেও নাকি সে স্পষ্ট দেখতে পায়। অগ্নিবলার সন্ধানেই এই অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে আমি অনেক রহস্যময় জিনিসের সাক্ষাৎ পেয়েছি। সে সব তোকে লেখা যাবে না। লিখলে আমার ক্ষতি হয়ে যাবে। তোকে শুধু এটুকু বলতে পারি, আমার গবেষণার বিষয়বস্তু এখন পালটে গিয়েছে। এখন আমি গবেষণা করছি এটা জানতে যে, মৃত্যুর পরে আত্মারা শরীর ছেড়ে কোথায় যায়?

শুনেছি, স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝে একটা জায়গা আছে, যেখানে অ্যাঞ্জেল...মানে দেবদূত আর পরীরা থাকেন। যদি ধরে নিই, আত্মারা সেখানে বিচরণ করেন না, তা হলে তাঁরা কোথায় থাকেন? তা হলে কি মর্ত্য আর পাতালের মাঝে কোনও একটা জায়গা আছে? আত্মারা সেখানে গিয়ে সাময়িক আস্তানা পান? যতদিন না ফের নতুন কোনও শরীরে মর্ত্যে ফিরে আসেন, ততদিন কি তাঁরা সেখানেই থাকেন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই আমি শিসপাহাড়ির প্রত্যন্ত এক পাহাড়ে দিনের পর দিন পড়ে আছি। এই পাহাড়ের সাতটা গুহামুখ রয়েছে। একটা গুহামুখ দিয়ে পাতালে প্রবেশ করা যায়। আমি সেই গুহামুখ আবিষ্কারের চেষ্টা করে যাচ্ছি। খুঁজে পেলে নিশ্চয়ই আমার প্রশ্নের উত্তর ঠিক পেয়ে যাব।

এখানে কয়েকজন আত্মার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। তাঁরা আমাকে সাহায্য করবেন বলেছেন। তাঁরাই আমাকে পাতালে নিয়ে যাবেন। শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি, প্রতিদিন শিসপাহাড়ি থেকে আত্মাদের নিয়ে একটা ট্রেন ছাড়ে। সেই ট্রেন গুহামুখ দিয়ে সোজা নেমে যায় পাতালের দিকে। শুনেছি, পাতালে প্রবেশ পথের মুখে একটা চেকপোস্ট আছে। সেখানে নাকি ঠিক হয়ে যায়, আত্মারা মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন লোকে যাবে? এ জন্মে মানুষের সুকীর্তি আর কুকীর্তির বিচারেই অবশ্য ঠিক হয়ে যায়, কোন আত্মা কোন লোকে যাবে? কতদিন পরে সে পুনর্জন্ম নেবে, বা আদৌও নেবে কি না?

আজ এটুকুই লিখে রাখলাম। পরে হয়তো তোকে আমার গবেষণার ব্যাপারে বিশদ জানাব। আমার খুব ইচ্ছে, ভবিষ্যতে তোকে সঙ্গে নেওয়ার। আমাদের বন্ধনটা তো এই জন্মের নয়। অনেক অনেক জন্মের। ভালো থাকিস বন্ধু।

ইতি সুরো।"

না-পাঠানো এই মেল পড়ে পাণ্ডু হতভম্ব হয়ে গেল। সুরোর মাথাটা কি একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে? এ সব ও কী লিখেছে? আত্মা, জন্মান্তরবাদ, আত্মাবাহী ট্রেন,

পাতাল... এ সবের মানে কী? পুরো মেলটা ও আরেকবার পড়ল। ছোটোবেলা থেকেই সুরো একটু পাগলাটে টাইপের। বেশি পড়াশুনো করার কুফল। যে বয়সে টিনটিন ছাড়া ওর বয়সি ছেলেদের আর কিছুতে আগ্রহ ছিল না, সেই বয়সেই সুরো দশটা পুরাণ পড়ে ফেলেছিল। পুরাণ থেকে রকেট সায়েন্স সব ব্যাপারেই ওর উৎসাহ ছিল। স্কুলের সিলেবাস নিয়ে ও মাথাই ঘামাত না। তবুও স্কুলে ও ভালো রেজাল্ট করত। ডিবেটে কেউ ওর সঙ্গে পেরে উঠত না। ছাত্র থেকে মাস্টার মশাই... সব্বার ধারণা ছিল, বড়ো হয়ে সুরো একজন কেউকেটা হবে।

সেই সুরো এইভাবে দুর্ঘটনায় মারা গেল! মেল-টা পড়ে পাণ্ডু গুম হয়ে বসে রইল। ধীরে ধীরে ওর মাথাটা পরিষ্কার হতে শুরু করল। বীর হনুমান যে শিসপাহাড়ি রেঞ্জের কোনও একটা গুহা থেকে পাতাল পর্যন্ত গিয়েছিলেন, সেটা লোকমুখে প্রচলিত একটা গাথা। আশপাশ অঞ্চলের সবাই তা জানেন। সুরোর কানেও নিশ্চয়ই তা গিয়েছে। আর তাতেই বিশ্বাস করে সুরো গবেষণা চালাচ্ছিল! জীবনটাকে ও এইভাবে নষ্ট করে ফেলল? এত বড় ঝুঁকি ও নিল কী করে? ওই গুহামুখ খুঁজতে গিয়ে অনেক মানুষ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন যে!

সুরোর মেল-এ আত্মাবাহী ট্রেনের কথা পড়ে...হঠাৎই জোসেফ সোরেনের একটা কথা পাণ্ডুর মনে পড়ল। কাল রাতেই সোরেন বলছিল, 'ঠান্ডাঘর ঠেনে কী দেখে আইলাম জানিস ডাগদার? তেনারা সব লাইন দিয়া বেইরনছে। জংশনে যাবেক বটে।' তখন গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিয়েছিল ও কথাটা। তা হলে কি সোরেনের কথায় খানিকটা সত্যতা আছে!

ল্যাপটপ বন্ধ করার আগে অনেকক্ষণ পাণ্ডু চুপ করে বসে রইল। সুরো এখন মৃত। ওর গবেষণা অসমাপ্তই রয়ে গেল। ল্যাপটপটা হাতছাড়া করা এখন ঠিক হবে না। আরও কী লেখা আছে, সেটা দেখার তীব্র কৌতূহল হল পাণ্ডুর। কিন্তু ডাঃ কুন্তীর কাছে একবার যেতে হবে। সেই তাগিদেই ও উঠে পড়ল।

৭

মেসেজটা পড়ে পাণ্ডু একটু অবাক হয়ে তাকাল। কুন্তী বলেছিল, একটা বিপদের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু ওর বাবার পাঠানো মেসেজটার মধ্যে এমন কী বিপজ্জনক ইঙ্গিত আছে, সেটা ও বুঝে উঠতে পারল না। কুন্তীর বাবা বোধ হয় কোথাও যাচ্ছেন। সেই কারণেই শিসপাহাড়ি জংশনে মেয়েকে দেখা করতে বলেছেন। ও বলল, 'এই মেসেজটা দেখানোর জন্যই কি তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছ?'

কুন্তী বলল, 'হ্যাঁ। একে বাপ্পার শরীরের অবস্থা ভালো নেই, তার উপর কোথাও আমাদের এমন রিলেটিভ নেই, যেখানে ট্রেনে করে যেতে হবে। আমার ভয় করছে, জানেন। নিউ ওয়ার্ল্ড বলতে বাবা কী বুঝিয়েছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। নতুন জগত... মানেটা কী?'

পাণ্ডু বলল, 'আমিও বুঝতে পারছি না। তুমি ভুবনেশ্বরে ফোন করোনি?'

'কাল রাতে অনেকবার করেছি। কিন্তু বাপ্পা ফোনই তুলছেন না। একা থাকেন বলে, বাপ্পা সবসময় মোবাইল সেট কাছাকাছি রাখেন। আমি এমনও দেখেছি মাত্র একবার রিং হওয়ার পরই উনি ওদিক থেকে উত্তর দিতেন। এ বারের মতো অ্যানইউজুয়াল ঘটনা কখনও ঘটেনি।'

'তা হলে তো চিন্তার কথা। ওঁর সঙ্গে লাস্ট কবে কথা বলেছ?'

'গত পরশু। তখন কোথাও যাওয়ার কথা কিন্তু উনি বলেননি। একদিনের মধ্যে কী এমন হল, উনি এমন মেসেজ পাঠালেন?'

'আশপাশে কেউ নেই, যাকে তুমি ফোন করতে পারো? মানে...যার কাছ থেকে খবর পেতে পারো?'

কথাটা ওর রুমালির এতক্ষণ মনে হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে প্রভা আন্টির কথা মনে পড়ল কুন্তীর। ভুবনেশ্বরে ওদের বাড়ির উপরের ফ্ল্যাটে থাকেন। কুন্তী ঘাড় নেড়ে বলল, 'আছেন একজন... প্রভা আন্টি। ওঁর ফোন নাম্বারটা লেখা আছে ডায়েরিতে। দাঁড়ান, নিয়ে আসি।'

উঠে গিয়ে কুন্তী র‍্যাক থেকে একটা ডায়েরি নিয়ে এল। তার পর পাতা উল্টে, নাম্বারটা দেখে ফোনের বোতাম টিপতে লাগল। নার্ভাস হওয়ার কারণে ওর হাত কাঁপছে। ভুল নাম্বারে বোতাম টিপে ফেলছে। বার দুই তিনেক এমনটা হওয়ার পর কুন্তী মোবাইল সেট পাণ্ডুর হাতে দিয়ে বলল, 'নাম্বারটা বলে দিচ্ছি। আপনি ফোনটা করুন। লাইন পেলে প্রভা আন্টিকে চাইবেন।'

প্রথমবারের চেষ্টাতেই লাইন পেয়ে পাণ্ডু বলল, 'প্রভা আন্টি বলছেন? আমি ডাঃ কুন্তী মহাপাত্রর এক কলিগ বলছি শিসপাহাড়ি থেকে...।'

কথা শেষ হতে না হতেই ও প্রান্ত থেকে উত্তেজিত হয়ে প্রভা আন্টি বললেন, 'কী আশ্চর্য, ওর ফোনের আশাতেই তো এতক্ষণ আমরা বসেছিলাম। কুন্তী কোথায়? ওকে বলুন, ওর বাপ্পাকে কাল বিকেলে আমরা মিউনিসিপ্যাল হসপিটালে ভর্তি করে এসেছি। উনি মারাত্মক অসুস্থ।'

'কী হয়েছিল ওর বাবার?'

'সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক।'

'হার্ট অ্যাটাক! আপনারা খবরটা আগে দেননি কেন?'

'আমার কাছে কুন্তীর নাম্বার ছিল না। থাকলে আমিই ফোন করে দিতাম। ওকে খবরটা দেওয়ার কথা ছিল হসপিটাল থেকে। ছি ছি, এত করে বলে এলাম...! কেন দেয়নি, সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না। ওরা কিন্তু প্রমিস করেছিল, শিসপাহাড়ি হাসপাতালে ফোন করে খবরটা কুন্তীকে জানিয়ে দেবে।'

না, ওরা কিছু জানায়নি। আজ সকালে কি ওঁর কোনও খোঁজ নিয়েছেন?'

'আমার হাসবেন্ড এইমাত্র হাসপাতালে গেলেন। এখনও কিছু জানাননি। আরে, আমরা তো টেরই পেতাম না, উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মানী লোক, সকলের সঙ্গে খুব বেশি মেশামেশি করতেন না। ভাগ্যিস সেই সময় কাজের মেয়েটা ঘরে ছিল।

সে-ই দৌড়ে এসে আমাদের খবরটা দেয়। কুন্তী কি ধারে কাছে আছে? একবার দিন তা হলে। ওর সঙ্গে কথা বলি।'

কী মনে হল, পাণ্ডু বলল, 'এখনই আমি ওকে খবরটা দিয়ে দিচ্ছি।'

লাইনটা কেটে দিয়ে পাণ্ডু দেখল, কাঁদতে কাঁদতে কুন্তী সোফায় বসে পড়েছে। বাবার হার্ট অ্যাটাকের কথাটা ওর কানে গিয়েছে। ওর কান্নার শব্দ শুনে ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে রুমালি। কুন্তীকে সামলাতে গিয়ে, খবরটা শুনে ও নিজেও কাঁদতে শুরু করল। পাণ্ডু ভাবতেও পারেনি, এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে। প্রিয়জনের অসুস্থতার খবর পাওয়াটা যে কী বেদানাদায়ক, সেই অভিজ্ঞতা ওর একবার হয়েছে।

মায়ের যখন হার্ট অ্যাটক হয়, তখন ও ছিল অপারেশন থিয়েটারে। মেদিনীপুর হাসপাতালে এক পেশেন্টের ব্রেন টিউমার অপারেশনে ডাঃ অম্বিকা ভট্টাচার্যকে ও তখন অ্যাসিস্ট করছিল। চার ঘণ্টা পর খবরটা ওকে দেওয়া হয়। পুরুলিয়ার বাড়িতে গিয়ে মায়ের মৃতদেহ দেখে পাণ্ডু হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। ডাক্তারি পাশ করে তা হলে কী হল? নিজের মায়েরই চিকিৎসা করতে পারল না! কুন্তীরও বোধ হয় সেই কথাটা মনে হচ্ছে। ওর কান্নাও স্বাভাবিক। কাঁদলে বুকের ভিতরটা হালকা হয়ে যাবে।

বাইরে থেকে কুন্তীকে খুব নরম মনের মেয়ে বলে মনে হয়। কিন্তু আজ পাণ্ডু দেখল, মিনিট কয়েকের মধ্যেই কুন্তী নিজেকে সামলে নিল। উঠে গিয়ে চোখ মুখে জল দিয়ে এসে বলল, 'ভুবনেশ্বর যাওয়ার আর্লিয়েস্ট ট্রেন কখন, তা কি আপনার জানা আছে ডাঃ পাণ্ডু?'

পাণ্ডু বলল,'জানি না। তবে জেনে বলে দিচ্ছি। তুমি কি আগে ভুবনেশ্বরে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ। এখানে সময় নষ্ট লাভ কি? বাপ্পার আগেও একবার কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয়েছিল। তখন পেসমেকার বসাতে হয়। বোধ হয় ইদানীং নিয়মকানুন মানছিলেন না।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, যদি হাসপাতালেই ভর্তি হয়ে থাকেন, তা হলে উনি তোমাকে শিসপাহাড়ি জংশনে দেখা করতে বললেন কেন?'

'আমিও কনফিউজড ডাঃ পাণ্ডু।'

'উনি তোমাকে দেখা করতে বলেছেন রাত ঠিক দুটো উনচল্লিশ মিনিটে। ট্রেন ছাড়ার সময়টা লক্ষ করেছ?

কেমন অদ্ভুত, তাই না? আমি অন্তত এমন ট্রেনের টাইমিং কখনও শুনিনি।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছে।'

'আজ এখন ভুবনেশ্বরে গেলে, রাতের মধ্যে তুমি কি ফিরে আসতে পারবে? মনে হয় না। সেক্ষেত্রে, ওঁর সঙ্গে জংশনে গিয়ে দেখাও করতে পারবে না। আমার মনে হয়, ভুবনেশ্বরে যাওয়ার আগে আজ রাতে চলো জংশনে গিয়ে আগে ওর সঙ্গে দেখা করি।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে যেতে পারবেন ডাঃ পাণ্ডু?'

'নিশ্চয়ই যাব। আমি বলি কী, আগে ভুবনেশ্বরের হাসপাতালে একটা ফোন করা যাক। আমাদের পিবিএক্স থেকে নিশ্চয়ই নাম্বারটা জোগাড় করা যাবে। নিজের পরিচয় দিয়ে আমি ওখানে ফোন করছি। তার পর তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, উনি কেমন আছেন। ওঁর নামটা কি?'

'ডাঃ নীলমাধব মহাপাত্র। উনি ওই হসপিটালেই চাকরি করতেন। সবাই ওঁকে চেনেন।'

'ঠিক আছে, আজ আর তোমার আউটডোরে যাওয়ার দরকার নেই। তুমি বরং রেস্ট নাও। আমি একাই পেশেন্টদের সামলে নিতে পারব।'

কুন্তী কিছুতেই রাজি হবে না। কিন্তু ওকে অনেক করে বুঝিয়ে পাণ্ডু ওর কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে বেরিয়েই ও দেখল, ঝকঝকে রোদ্দুর। হাসপাতালটা দূর থেকে ছবির মতো লাগছে। একতলা সব বিল্ডিং।

মাঝে মাঝে সবুজ খোলা জায়গা। সুন্দর ইউক্যালিপটাস, পাইন গাছের সারি। আরও কত রকমের গাছ, নাম জানা নেই পাণ্ডুর। গাছগুলো অন্তত একশো দেড়শো বছরের পুরোনো। হাসপাতালের পশ্চিম দিকে পাহাড়। শিসপাহাড়ির রেঞ্জ। সিনিক বিউটিই অন্য রকম। পাহাড়ে ঘন ঘন রূপ বদল হয়। কোয়ার্টারে পাণ্ডু যখন একা থাকে, তখন ওর সময় কেটে যায় পাহাড় দেখে। শিসপাহাড়িকে খুব রহস্যময় জায়গা বলে মনে হয় ওর। এই ধারণাটা ওর হয়েছে সিস্টার ফুলমণির মুখে নানা রকম গল্প গাঁথা শুনে। পাণ্ডুর আশা, কোনও না কোনওদিন এমন কিছু দেখবে, যা ওর বিশ্বাসকে আমূল বদলে দেবে।

মাঠের উপর দিয়ে হাঁটার সময় পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে পাণ্ডুর হঠাৎ মনে হল, অনেক উপরে কোথাও থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ধোঁয়া না মেঘ... তা বোঝার জন্য ও দাঁড়িয়ে পড়ল। মেঘ নয়, তা হলে পাক খেয়ে উপরের দিকে উঠত না। নিশ্চয়ই ধোঁয়া। তা হলে কি গাছ থেকে ঝরে পড়া শুকনো পাতায় কোনও কারণে আগুন লেগে গিয়েছে। তা-ই বা কি করে হবে? চট করে সিস্টার ফুলমণির বলা একটা কথা মনে পড়ল পাণ্ডুর।

তান্ত্রিকদের কথা। ওঁদেরই হয়তো কেউ ধুনি জ্বালিয়েছেন। এমনি এমনি তো ধোঁয়া উড়তে পারে না! সিদ্ধান্তে আসার পর পাণ্ডুর কৌতূহল মিটে গেল। কিন্তু, তার পরই যা দেখল, তাতে ফের দাঁড়িয়ে পড়ল।

ও স্পষ্ট দেখল, পাহাড়ের পাকদন্ডি বেয়ে লাইন দিয়ে কিছু লোক উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে তাদের। ছোট পুতুলের মতো দেখাচ্ছে লোকগুলোকে। হাঁটার ধরনটা ঠিক কাঠুরেদের মতো নয়। কাঠুরেরা মাথায় গাছের ডালের বোঝা চাপিয়ে নীচের দিকে নামে। কিন্তু, এই লোকগুলো ঠিক সেইভাবে উঠে যাচ্ছে, যেমনভাবে কাল রাতে সুরপতিকে পাণ্ডু হেঁটে যেতে দেখেছে। হাত দুটো সামনের দিকে মুঠো করা। যেন বন্দি করে কেউ নিয়ে যাচ্ছে।

চড়া রোদ্দুরে দাঁড়িয়েও দৃশ্যটা দেখে ওর ভয় লেগে গেল। আর অপেক্ষা না করে পাণ্ডু দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল আউটডোরের দিকে। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল, প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। আধ ঘন্টা দেরি হয়ে গিয়েছে। হাসপাতালের চাকরিতে কখনও ওর এত লেট হয়নি। পাহাড়ের দিকে চোখ না পড়লে এতক্ষণে ও পৌঁছে যেত আউটডোরে। পাণ্ডু মনে মনে ঠিক করে নিল, রোগী দেখার আগে প্রথম যে কাজটা ওকে করতে হবে, সেটা হল ভুবনেশ্বরের হাসপাতালে ফোন করা। কুন্তীর বাবার খোঁজ নেওয়া। এর পর পুলিশ এলে তাদের সঙ্গে কথা বলবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। আউটডোরে ঢোকার আগেই পাণ্ডুর চোখে পড়ল, খাকি উর্দি পরা এক পুলিশ অফিসার দরজার সামনে ওর জন্য অপেক্ষা করছেন। বোধ হয় ওকে চেনেন। পুলিশ অফিসারটি বললেন, 'আপনার সঙ্গে এখন কি মিনিট পাঁচেক কথা বলা যাবে ডক্টর? সুরপতি মাইতির ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য এসেছি।'

পাণ্ডু দাঁড়িয়ে বলল, 'বলুন কী জানতে চান?'

'সিস্টার ফুলমণি বলছিলেন, সুরপতিবাবুর কিট ব্যাগটা নাকি আপনার কাছে আছে?'

'হ্যাঁ অফিসার। ওটা ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের আলমারিতে রাখা আছে। আমি এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি। ওর পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা কি পেয়েছেন অফিসার?'

'এই একটু আগে পেলাম। মৃত্যুর কারণ, হেড ইনজুরি। মাথাটা পাথরখণ্ডে ঠুকে গিয়েছিল। কিন্তু একটা ব্যাপার আমাদের কাছে ধোঁয়াশাই থেকে যাচ্ছে। পাহাড় থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত উনি এলেন কীভাবে? ওই রকম হেড ইনজুরি নিয়ে এতটা পথ আসা ওর পক্ষে অসম্ভবই বলা যায়।'

পাণ্ডু এই সব তথ্য জানে। তাই প্রসঙ্গ পালটাল, 'ওর বাড়ির লোকজনের কি কোনও হদিশ পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, আমরা যোগাযোগ করেছি। সুরপতিবাবুর পার্স থেকে আমরা একটা নেমকার্ড পাই। তাতে অবশ্য ওর বাড়ির কন্টাক্ট নাম্বার ছিল না। কিন্তু ক্লু পেলাম, পার্সে থাকা একটা ক্রেডিট কার্ড থেকে। ব্যাঙ্কে ফোন করতেই ওর বাড়ির ঠিকানা, ফোন নাম্বার সব পাওয়া গেল। সুরপতিবাবু বিয়ে-থা করেননি। নিকটজন বলতে আছেন ওর বাবা। পুরুলিয়া থেকে তিনি ডেডবডি নিতে আসছেন।'

'শুনেছিলাম, একটা ভেষজ ওষুধ তৈরি করার জন্য সুরপতি নাকি ইদানীং গবেষণা করছিল?'

'ঠিকই শুনেছেন। ওর বাবা বলছিলেন, সুরপতিবাবু নাকি ওই কারণেই শিসপাহাড়ি অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করছিলেন। এর আগে সম্বলপুর, কেওনঝড় জেলার বেশ কিছু দুর্গম জঙ্গলে অনুসন্ধান চালিয়ে শেষ পর্যন্ত উনি এই শিসপাহাড়িতে আসেন। ওঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন ভুবনেশ্বরের নামকরা এক আই সার্জেন। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন, গতকাল রাতে উনিও ভুবনেশ্বরের এক হাসপাতালে মারা গিয়েছেন।

প্রায় একই সময়ে... রাত দশটায়। কী কো-ইনসিডেন্স!'

দমবন্ধ করে পাণ্ডু জিজ্ঞেস করল, 'আই সার্জেনের নামটা কি অফিসার?'

'ডাঃ নীলমাধব মহাপাত্র। কেন, আপনি চেনেন নাকি তাঁকে?'

পাণ্ডু শূন্যচোখে তাকিয়ে রইল। নামটা ও একটু আগেই শুনেছে কুন্তীর মুখে!

৮

হাসপাতালে নার্সদের রুমে বসে সিস্টার ফুলমণি খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলেন। এমন সময় মেট্রন সুধাদি এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফিমেল ওয়ার্ডে নয় নম্বর বেডের পেশেন্টকে কে ইঞ্জেকশন দিয়েছে ফুলমণি? জানো তুমি?'

নিশ্চয়ই কোনও গণ্ডগোল হয়েছে। সেটা কী, কায়দা করে আগে জেনে নেওয়া চেষ্টা করলেন ফুলমণি। মুখের সামনে থেকে কাগজটা সরিয়ে বললেন, 'মো দিয়েনছি সুধাদি। ক্যানে, কী হইনছে?'

'সর্বনাশ করেছ। ছ' নম্বর বেডের পেশেন্টের ইঞ্জেকশনটা তুমি নয় নম্বরকে দিয়ে এসেছ। গিয়ে দেখো এসো, সেই পেশেন্টের কী অবস্থা! গায়ে র‍্যাশ বেরিয়েছে। ব্রিদিং ট্রাবল শুরু হয়ে গিয়েছে।'

চমকে উঠে দাঁড়ালেন ফুলমণি। এত বড় একটা ভুল করবেন তিনি, বিশ্বাসই করতে পারলেন না! এত বছর ধরে তিনি এই হাসপাতালে রয়েছেন। কখনও কোনও ভুলচুক করেননি। আজ হয়ে গেল কী করে? ফিমেল ওয়ার্ডে বেডগুলো তাঁর হাতের তালুর মতো চেনা। চোখ বুজে তিনি বলে দিতে পারেন, কোন পেশেন্ট কী চিকিৎসার জন্য এসেছে। নয় নম্বর বেডে রয়েছে পাররা গ্রামের এক অল্পবয়সি মেয়ে। খুব মিষ্টি দেখতে। নামটাও মনে আছে ফুলমণির... চন্দ্রমুখী। গল ব্লাডারে স্টোন হওয়ার জন্য ভর্তি হয়েছে দিনতিনেক আগে। অপারেশন করেছেন ডাঃ সুবোধ সাহু। মেয়েটাকে আরও মনে আছে এই কারণে যে, সোনামণির ছেলে জোসেফের জন্য তিনি পছন্দ করে রেখেছেন। বিকেলের দিকে মেয়েটার মা রোজ আসে। তার কাছে বিয়ের কথা তুলবেন, ভেবে রেখেছেন ফুলমণি।

হাসপাতালে নার্সের সংখ্যা প্রায় কুড়ি জন। একশো বেডের হাসপাতালের তুলনায় সংখ্যাটা বেশিই। এক একটা শিফটে ছয়-সাতজন করে নার্স থাকে। বেলা একটার সময় ফুলমণি যখন ডিউটিতে আসেন, তখন ফিমেল ওয়ার্ডে তাঁর সঙ্গে ছিল নন্দা বলে একটা অল্পবয়সি নার্স। চন্দ্রমুখীকে ইঞ্জেকশন দিয়েই ফুলমণি মিনিট দশেকের জন্য আউটডোরে গিয়েছিলেন ডাঃ পাণ্ডুর সঙ্গে কথা বলতে। কুন্তী দিদিমণিকে নিয়ে ডাঃ পাণ্ডু রাতে শিসপাহাড়ি জংশনে যেতে চান। সেজন্য ওঁদের অ্যাম্বুলেন্সটা দরকার। ডাঃ পাণ্ডু জানতে চাইছিলেন, রাতে সেটা পাওয়া যাবে কি না? আউটডোর থেকে ফিরে এসে ফুলমণি খবরের কাগজ নিয়ে বসেছেন। সুধাদির কথা শুনে তিনি একটু শঙ্কিত হলেন। কেউ বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে না তো? হাসপাতালে এ রকম ল্যাং মারামারি

হয়ই। নার্সরা আকচার ভুলভাল করে। তার পর অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

ফুলমণি তা করলেন না। বললেন, 'মো চার্ট দেইখে সুঁই দিয়েছি সুধাদি।'

'হতেই পারে না। এখন ঠেলা সামলাও। নয় নম্বর পেশেন্ট কে, জানো? পঞ্চায়েত প্রধানের নাতনি। ভালো আছে বলে আজই বিকেলে ওর রিলিজ হওয়ার কথা। এখন যদি খারাপ কিছু হয়, তা হলে ওর ফ্যামিলির লোকজন তো হাসপাতালে এসে মারাত্মক ঝামেলা করবে। ক'দিন আগে চাঁপামণির রেপ কেস নিয়ে একবার হামলা হয়ে গিয়েছে। মনে আছে?'

সুধাদি ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন। ফুলমণি জানেন, হাসপাতালে তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে উনি হিংসে করেন।

আগে একবার সুপার সাহেবের কান ভাঙানোরও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, মারাংবুরুর কৃপায় সফল হননি। ভয় পেলে চলবে না। তাই বললেন, 'মো ভুল করি লাই সুধাদি।'

'সুপার সাহেব তোমাকে একবার ডেকেছেন ফুলমণি। যাও, তাঁকে এক্সপ্ল্যানেশনটা দিয়ে এসো।' কথাগুলো বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সুধাদি।

বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। মনে মনে ফের মারাংবুরুকে স্মরণ করলেন ফুলমণি। সুপার সাহেবকে কী বলবেন, তিনি ভেবে পেলেন না। নন্দা জানলার দিকে মুখ করে রয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হল ফুলমণির। এই সব পরিস্থিতিতে লোকে সহমর্মিতা দেখায়। কিন্তু মেয়েটার কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। যেন চোখাচোখি করতেও ভয় পাচ্ছে। মেয়েটার দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ফুলমণি। হাসপাতালে আসার সময় অশুভ একটা লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। বাড়ির চৌকাঠ পেরনোর সময় দেখেন, উঠোনে ফাঁকা কলসি বসানো রয়েছে। খালি কলসি দেখা শুভ নয়। তখনই দু'পা পিছিয়ে তিনি ঘরের ভিতর ঢুকে যান। চাঁপামণি কলসিটা সরিয়ে দেওয়ার পর ফের তিনি বেরিয়ে আসেন। তখনই জানতেন, দিনটা খুব ভালো যাবে না।

সুপার সাহেবের অফিসে যাওয়ার আগে কী মনে হল, ফুলমণি ফিমেল ওয়ার্ডের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

চন্দ্রমুখীর অবস্থা কতটা খারাপ, নিজের চোখে একবার দেখা দরকার। বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। না, ভয় পেয়ে নয়। অমন একটা তাজা মেয়ে... যদি মরে টরে যায়, তা হলে তিনি সাসপেন্ডও হয়ে যেতে পারেন।

বলা যায় না, হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের কানে পৌঁছলে চাকরিও চলে যেতে পারে। দিনকাল খুব খারাপ। আজই বিকেলে অফিসারদের আসার কথা আছে। বিষাক্ত মদ খেয়ে মরে যাওয়া মানুষগুলো সম্পর্কে রিপোর্ট নিতে। এমন একটা দিনেই এত বড়ো একটা ভুল তিনি করে ফেললেন?

ওয়ার্ডের কাছেই দেখা গীতা বলে এক নার্সের সঙ্গে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়

ছিলে ফুলমণিদি? তোমাকে সবাই খোঁজাখুঁজি করছে। ন'নম্বর পেশেন্টের কী হয়েছে গো?'

'কী হইছেনছে মো জানবক কী কইরে?

'শুনলাম, তার নাকি এখন তখন অবস্থা। তুমি কি মেয়েটাকে ভুল ইঞ্জেকশন দিয়েছ? সুধাদি তখন বলাবলি করছিল, আশপাশের বেডের পেশেন্টরা নাকি তোমাকেই ইঞ্জেকশন দিতে দেখেছে। একটু আগে দেখলাম, ডাঃ পাণ্ডু দৌড়ে এলেন আউটডোর থেকে। পেশেন্টকে কী একটা ইঞ্জেকশন দিলেন।'

গীতা জেনেছে, মানে সারা হাসপাতালে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে। তবে একটাই স্বস্তির কথা, ডাঃ পাণ্ডু এসে গিয়েছেন। আর কথা না বাড়িয়ে ফুলমণি দ্রুত পায়ে ওয়ার্ডের ভিতর ঢুকে এলেন। দেখলেন, নয় নম্বর বেডের সামনে সুধাদির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাঃ পাণ্ডু। মন দিয়ে চন্দ্রমুখীর নাড়ি দেখছেন। মেয়েটা চোখ বুজে রয়েছে। ডাগদারবাবুকে দেখে ভরসা পেলেন ফুলমণি। খুব ভালো ডাগদার। নিশ্চয়ই এমন কোনও ওষুধ দেবেন, যাতে মেয়েটা সুস্থ হয়ে যাবে। উনি কী বলেন, তা জানার জন্য দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড পর চন্দ্রমুখীর হাতটা নামিয়ে দিয়ে ডাঃ পাণ্ডু সুধাদিকে বললেন,'ভাগ্যিস, আপনার চোখে পড়েছিল। তাই খুব কুইক অ্যাকশন নেওয়া গেল। কিন্তু, পেশেন্ট এখনও আউট অফ ডেঞ্জার নয়। এক্ষুনি আইসিইউতে ট্রান্সফার করতে হবে।'

শুনে কান্না পেয়ে গেল ফুলমণির। পেশেন্টদের ইঞ্জেকশন দেওয়ার কথা নয় নার্সদের। ওটা ডাক্তারের কাজ। কিন্তু, অনেক সময় ব্যস্ততার জন্য ডাক্তাররা কাজটা নার্সদের উপর ছেড়ে দিয়ে চলে যান। তবে ইনট্রা-ভেনাস ইঞ্জেকশন হলে অন্য কথা। ফুলমণি দেখলেন, চন্দ্রমুখী ঘুমোচ্ছে। মিনিট কুড়ি আগে ইঞ্জেকশনটা যখন তিনি ওকে দেন, তখনও জেগেছিল। মেয়েটা জানতে চেয়েছিল, কবে ওর ছুটি হবে? বাড়িতে ওর পোষা একটা বেড়াল আছে। তাকে দেখতে পাচ্ছে না বলে মন খারাপ। ওর মা নাকি বেড়ালটাকে একদিন হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু, ওয়ার্ড বয়রা ঢুকতে দেয়নি। মেয়েটা মন খুলে তখন কথা বলছিল। মনে হয়, সহজ সরল মেয়ে। সোনামণির পরিবারে গেলে মানিয়ে গুছিয়ে থাকতে পারবে।

স্বস্তি পেলেও, মন থেকে সন্দেহটা গেল না ফুলমণির। সত্যিই কি ছয় নম্বর বেডের পেশেন্টের জন্য বরাদ্দ ইঞ্জেকশন তিনি চন্দ্রমুখীকে দিয়েছিলেন? এমন ভুল তিনি করতেই পারেন না। বেডের পায়ের দিকে গোল পিতলের চাকতিতে নম্বরগুলো ইংরেজিতে লেখা আছে। নম্বরটা পরীক্ষা করার জন্য সেদিকে তাকাতেই চমকে উঠলেন ফুলমণি। এ কী, নয় নম্বর চাকতির উপরের দিকে স্ক্রু-টা খুলে গিয়েছে কেন? চাকতিটা ঝুলে আছে নীচের স্ক্রুর উপর! সেই কারণে নয় নম্বরটা ছয় হয়ে গিয়েছে। ফুলমণির মনে পড়ল, ছয় নম্বরের পেশেন্টকে ইঞ্জেকশন দিতে এসেছিল নন্দা। ও নতুন মেয়ে। বেডগুলো কীভাবে সাজানো রয়েছে, তা নিয়ে ওর কোনও ধারণা নেই। চাকতিতে ছয় নম্বর লেখা আছে দেখে, নন্দাই হয়তো চন্দ্রমুখীকে ছয় নম্বর পেশেন্ট ভেবে

ইঞ্জেকশনটা দিয়ে গিয়েছে। তার মানে, ছয় নম্বর পেশেন্টকে কোনও ইঞ্জেকশনই দেওয়া হয়নি। চন্দ্রমুখীকে দু'বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রমুখী জেগে না ওঠা পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। কেবল ও-ই বলতে পারবে, ওকে দু'বার সুঁই দেওয়া হয়েছে কি না। মিস্ত্রি ডেকে এনে এক্ষুনি নম্বরের চাকতিটাকে ঠিক করে দেওয়া দরকার। কথাটা মনে হওয়া মাত্র ফুলমণি ফিমেল ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলেন। মিস্ত্রির কথা সুপার সাহেবকে বলতে হবে। লন পেরিয়ে হাসপাতালের অফিস বিল্ডিংয়ে ঢোকার সময় দূর থেকে তিনি দেখলেন, মর্গ থেকে কারও লাশ বের করা হচ্ছে। দু'তিনজন মিলে ধরাধরি করে বাঁশের খাটিয়ায় লাশটা শোয়াচ্ছে। একটা মেয়ে লাশটাকে আঁকড়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করছে। এবার তাঁকে চিনতে পারলেন ফুলমণি। মেয়েটা বুধিরামের বউ পদ্মমণি! সঙ্গের লোকগুলো ওকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু, পারছে না।

সকালে এই বুধিরামেরই ডেথ সার্টিফিকেট কোথায় আছে, তা জানার জন্য ফোন করেছিলেন সুধাদি। এই এতক্ষণে বোধ হয় ওর বডি রিলিজ করা হল। মুখ ফিরিয়ে অফিস বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছিলেন ফুলমণি। হঠাৎ চোখে পড়ল, মর্গের কাছে একটা গাছের তলায় খুব চেনা একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুধিরামের শেষযাত্রা দেখছে আড়াল থেকে। চাঁপামণি না? দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে ভালো করে দেখলেন ফুলমণি। হ্যাঁ, চাঁপামণিই। এমন একটা জায়গায় ও দাঁড়িয়ে রয়েছে, যাতে ওকে কেউ দেখতে না পায়। দূর থেকেই ফুলমণি দেখতে পেলেন, আঁচল দিয়ে মেয়েটা বারবার চোখ মুছছে। তার মানে একা একাই কাঁদছে। সকালে বুধিরামের মারা যাওয়ার খবরটা শুনে চাঁপা প্রায় অচেতন হয়ে গিয়েছিল। ওর জ্ঞান ফেরার পর ফুলমণি অনেকবারই জানতে চেয়েছেন, এত ভেঙে পড়ল কেন? কিন্তু, মেয়েটা এত চাপা যে, একটা কথাও বলেনি।

বাড়িতে ফিরে এই রহস্যের উন্মোচন তিনি করবেনই। কথাটা ভেবে সুপার সাহেবের অফিসের দিকে পা বাড়ালেন ফুলমণি। উনি দেখা করতে বলেছেন। দেরি হলে অসন্তুষ্ট হতে পারেন। এমনিতে, পুরোনো কর্মী বলে যথেষ্ঠ সম্মান দিয়ে কথা বলেন সুপার সাহেব। অনেক ব্যাপারে পরামর্শও নেন। বিশেষ করে, আদিবাসী সংক্রান্ত কোনও সমস্যা পড়লে। কেননা, সুপার সাহেব জানেন, আদিবাসী সমাজে ফুলমণি হেমব্রমকে সবাই খুব মান্য করেন। কিন্তু, আজ একটা স্বতন্ত্র ঘটনা ঘটে গিয়েছে। একজন পেশেন্টের জীবন-মরণ-সংশয় হয়েছে। আজ উনি কী রকম আচরণ করবেন, কে জানে?

অফিস বিল্ডিংয়ে ঢুকে ফুলমণি দেখলেন, সুপার সাহেব হনহন করে হেঁটে আসছেন করিডোর দিয়ে। মুখে বিরক্তির রেখা। সামনা সামনি হতেই উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'নার্সদের রুমে কী হয়েছে ফুলমণি?'

শুনে অবাক হয়ে ফুলমণি পালটা প্রশ্ন করলেন, 'কী হইনছে?'

'আরে, সেটাই তো তোমার কাছে জানতে চাইছি। সুধা বলল, নার্সদের রুমে নাকি ভূতের উপদ্রব হয়েছে। তুমি নার্সদের রুমে ছিলে না?'

'না। মো ফিমেল ওয়ার্ডে গেইনছিলাম।'

'চলো তো আমার সঙ্গে। গিয়ে দেখি কী হয়েছে। দিনের বেলায় ভুত পেরেত আসবে কোত্থেকে?'

পেরেতের কথা শুনে ফুলমণি নিজেও একটু অবাক হলেন। দিনের বেলায় যে পেরেত আসবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। শিসপাহাড়িতে যে কোনও সময়েই পেরেত দেখা দিতে পারে। বেশ কয়েকটা জায়গা আছে, যেখানে সবসময় পেরেতের সন্ধান মেলে। যেমন, মরণঝাঁপ বলে জায়গাটায়। খাদে ঝাঁপ দিয়ে প্রচুর লোক মারা গিয়েছে। তাদের অনেকেই প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কথা হচ্ছে, দিনের বেলায় ওরা ঘুমোয়।

কিন্তু দিনের বেলায় তখনই দেখা দেয়, যখন কেউ ওদের বিরক্ত করে বা রাগিয়ে দেয়। কারও উপর যদি রাগ থাকে, তা হলে তাকে বাগে পেলেও ওরা দেখা দেয়। সুপার সাহেব এ সব কথা জানবেন কী করে? তাই সুপার সাহেবের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফুলমণি পিছন পিছন হাঁটতে লাগলেন। ভুল সুঁই দেওয়া নিয়ে সাহেব প্রশ্ন করলে তিনি কী উত্তর দেবেন, সেটাই ভাবতে লাগলেন।

নার্সদের ঘরের সামনে গিয়ে ফুলমণি দেখলেন, অন্তত কুড়ি পঁচিশজন দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মানে পেরেতের কথা মুখে মুখে রটে গিয়েছে। সাহেবকে দেখে সবাই জায়গা করে দিলেন। ঘরের ভিতর ঢুকে ফুলমণি অবাক হয়ে গেলেন। আসবাব সব লন্ডভন্ড করা। টেবল চেয়ার উলটে রয়েছে। কেউ যেন ছুড়ে ছুড়ে ফেলেছে। জানলার কাচগুলোও ভাঙা। মেঝেতে কাচের টুকরো পড়ে আছে। একটা বেঞ্চে শুয়ে নন্দা। ওর চোখ মুখে মারাত্মক ভয়ের চিহ্ন। পলক ফেলছে না... ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে রয়েছে সিলিংয়ের দিকে। ওর মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে সুধাদি। জিজ্ঞেস করছে, 'কী হয়েছে বল।' কিন্তু, নন্দা শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। ও কোনও উত্তরই দিচ্ছে না।

সুপার সাহেব সামনে গিয়ে জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে সুধা? ফার্নিচারগুলোর এই অবস্থা করলটা কে? নন্দা কি কিছু বলেছে?'

সুধাদি বললেন, 'না স্যার। অদ্ভুত ব্যাপার। এত ভারী ভারী ফার্নিচার... পুরোনো আমলের টিক কাঠ দিয়ে তৈরি। এগুলো ছুড়ে ফেলা মানুষের কাজ নয়! সুপারন্যাচারাল কিছু বলে মনে হচ্ছে। সেই কারণে মেয়েটা মেন্টাল শক পেয়েছে।'

'হাসপাতালের অন্য কারওর চোখে পড়েনি?'

ভিড়ের মাঝখান থেকে একজন ওয়ার্ড বয় এগিয়ে এসে বলল, 'আমি দেখেছি স্যার। নার্স দিদিমণি ভিতর থেকে চিৎকার করছিল, বাঁচাও বাঁচাও। আমি তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। জানলা দিয়ে দেখলাম, কোট-টাই পরা একটা লম্বা লোক দিদিমণির ঘাড় ধরে কী যেন বলছে। লোকটাকে আগে কখনও দেখিনি। খুব রেগে রেগে কথা বলছিল। নার্স দিদিমণিকে একবার ছুড়েও ফেলে দিল। তার পর জানলার দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে ইংরেজিতে কী যেন বলল। ভয়ে তখন আমি ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকে গেছিলাম।'

ওয়ার্ড বয়ের কাছে বর্ণনা শুনে ফুলমণি বুঝতে পারলেন, এ পেরেত ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। নিশ্চয় কোনও সাহেবের পেরেত। নন্দা এমন কিছু করেছে, যা'র জন্য সাহেব খুব রেগে গিয়েছেন। নার্সদের রুমে তিনি প্রায় তিরিশ বছর কাটিয়েছেন। কখনও কোনও সাহেব পেরেতের কথা শোনেননি। এই পেরেত তা হলে উদয় হলেন কোত্থেকে? এখন ভয় কাটানোর মন্তর পড়তে হবে। ছোটোবেলায় কোনও কোনও রাতে মা যখন লংম্যান সাহেবের বাড়িতে থেকে যেত, তখন গাঁয়ের বাড়িতে শুয়ে শুয়ে তিনি ভয় কাটানোর মন্তর পড়তেন। মায়ের দূর সম্পর্কের এক দাদু ছিলেন জানগুরু। তিনিই মন্তরটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সামনে এগিয়ে এসে সুপার সাহেব আর সুধাদিকে ফুলমণি বললেন, 'তুরা সর। উকে মো ঠিক কইরে দিনছি।'

বেঞ্চে বসে নন্দার মুখটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে নিলেন ফুলমণি। তার পর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে মন্তর পড়তে লাগলেন। খানিকক্ষণ মন্তর পড়ার পর নন্দার চোখের দৃষ্টি সিলিং থেকে নীচে নেমে এল। দেখে আরও জোরে জোরে মন্তর পড়তে লাগলেন ফুলমণি। দরদর করে তিনি ঘামতে লাগলেন। হঠাৎ নার্সদের রুমের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল, কেউ যেন বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর তার পরই চোখের মণি নড়ে উঠল নন্দার। দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল। ফুলমণির দিকে তাকিয়ে ও চিৎকার করে বলে উঠল, 'দিদি, আমায় বাঁচাও। তোমার সাহেব ভূত আমাকে মেরে ফেলবে।'

মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুলমণি বললেন, 'তুকে কেউ মারবেক লাই। কী হইনছে তু বল।'

তবুও মেয়ের কাঁপুনি থামে না খানিকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নন্দা বলল, 'দিদি, নয় নম্বর বেডের পেশেন্টকে ভুল করে আমিই ইঞ্জেকশন দিয়ে ফেলেছি। মেয়েটা আমায় বারণ করেছিল। বলেছিল, একটু আগে সিস্টার ফুলমণি ইঞ্জেকশন দিয়ে গেছে। তার পর ফিরে এসে যখন এই ঘরে বসলাম, তখন সাহেব ভূতটা এসে আমাকে ভয় দেখাতে লাগল। এই দেখো না, ঘরের কী অবস্থা করেছে। খুব রেগে ভূতটা বলছিল, ফুলমণির কোনও ক্ষতি হলে, তোর ঘাড় মটকে দিয়ে যাব। দিদি, তুমি আমায় মাফ করো। সুধাদিকে তখনই সত্যি কথাটা আমার বলা উচিত ছিল।' কথাগুলো বলে নন্দা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ফুলমণি সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'তুর দুষ লাই রে নন্দা। বেডের লাম্বার খুলে গেইনছে। তাই নাইনটো হইয়ে গেইনছে সিক্স। পেশেন্ট ঠিক হইয়ে যাবেক। তু মোর সনে চল। তুকে হোস্টেলে রেইখে আসসি।'

নন্দাকে তুলে দাঁড় করালেন ফুলমণি। নার্সদের হোস্টেলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেবেন। একটু বিশ্রাম নিলেই ও ঠিক হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্দেহটাই ঠিক হল। এখন চন্দ্রমুখী মেয়েটা সুস্থ হয়ে উঠলেই বাঁচোয়া। মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল ফুলমণির। তিনি বুঝতে পারলেন না, সাহেব পেরেতটা কে? তাঁকে বাঁচিয়ে সাহেব পেরেতের লাভটাই বা কী? এর আগেও দু'তিনটে বিপদ থেকে আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা পেয়েছেন তিনি। তখন অতশত ভাবেননি। এমন হয় নাকি!

রাত প্রায় এগারোটা বাজে। কুন্তীর কোয়ার্টারের বাইরে অ্যাম্বুলেন্সের ভিতর বসে রয়েছে পাণ্ডু। ড্রাইভার শম্ভু কিসকুকে ভিতরে পাঠিয়েছে। কুন্তী যাতে তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে। এখনই ওদের রওনা হওয়ার কথা শিসপাহাড়ি রেলওয়ে জংশনের দিকে। দুটো উনচল্লিশ মিনিটে ট্রেন ছাড়বে জংশন থেকে। মেসেজে এই রকমই লিখেছেন কুন্তীর বাবা। হাতে অবশ্য অনেক সময় রয়েছে। হাসপাতাল থেকে জংশন মাত্র পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা। পৌঁছতে আধ ঘণ্টা লাগারও কথা নয়। কিন্তু, রাতে এ দিকটায় এত কুয়াশা পড়ে যে, গাড়ি চালানো কঠিন হয়ে যায়। এতদিন শিসপাহাড়িতে আছে পাণ্ডু, রাতে ওর কখনও জংশনে যাওয়ার দরকার পড়েনি। এই প্রথম যাবে বলে হাসপাতালের দু'একজনের কাছে ও খোঁজ খবর নিচ্ছিল। শুনেছে, পুরো রাস্তাটাই জনবিরল। সবাই বলেছে, রাতের দিকে ওখানে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

গাড়ির সব কাচ তুলে দিয়ে গিয়েছে শম্ভুদা। রাতে জংশনে যেতে হবে শুনে ও প্রথমে চমকে উঠেছিল। খুব ভিতু টাইপের লোক। বলেছিল, ওই রাস্তায় নাকি রাতের দিকে ভূত পেরেতের দেখা পাওয়া যায়। শম্ভুদার জন্মকর্ম সব এই শিসপাহাড়ির আদিবাসী বস্তিতে। ছোটোবেলা থেকেই ও সব আজব কাহিনি শুনতে অভ্যস্ত। এখন বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। হাঁপানি রোগে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মদ খেয়ে খেয়ে লিভারটাও প্রায় পচিয়ে ফেলেছে। মাঝে মাঝে পাণ্ডুর কাছে চিকিৎসার জন্য আসে। তখন নানা গল্প করে। মুশকিল হচ্ছে, শম্ভুদা একেবারেই সহ্য করতে পারে না সিস্টার ফুলমণিকে। মদ্যপ অবস্থায় থাকলে প্রায়ই গালমন্দ করে সিস্টার ফুলমণি সম্পর্কে। একবার বলেছিল, 'উয়ার বাপ রে জানিস বটে ডাগদার? লংম্যান সাহেব। উয়ার মা ঠাকুরমণি কাম করতক সাহেবের ঘরকে।'

সিস্টার ফুলমণিও যে শম্ভুদাকে পছন্দ করেন, তা নয়। আজই তো অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বেরনোর সময় শম্ভুদাকে দেখে সিস্টার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'উ মাতালটাকে লিয়ে তু যাইস না ডাগদার?'

দুপুরেই পাণ্ডু সব খুলে বলেছিল। শুনে চিন্তিত মুখে সিস্টার ফুলমণি বলেছিলেন, 'উ রাস্তা ভালো লয় রে ডাগদার। লাশপুরের পাশ দিয়ে তুকে যেতি হবেক। উখানে ভূতপেরেতের বাস। উরা তুদের জংশনে যেতি দিবেক না। মোর কথা শুন বটে।'

লাশপুর নিয়ে ভীতিপ্রদ অনেক কথা বলেছিলেন সিস্টার ফুলমণি। আগে জায়গাটার কী যেন একটা নাম ছিল। কিন্তু একবার বিষাক্ত গ্যাসে ওখানকার প্রায় সব লোক দু'তিনদিনের মধ্যে মারা যায়। সৎকার করারও লোক বেঁচে ছিল না। তার পর থেকেই জায়গাটার নাম হয়ে গিয়েছে লাশপুর। ওখানে নাকি অশরীরী আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে পাণ্ডু। আটকাতে না পেরে ফুলমণি তখন একটা মাদুলি এনে দিয়েছিলেন ঘর থেকে। মারীচ বলে কে এক নামকরা জানগুরুর দেওয়া মন্ত্রপুত মাদুলি। সঙ্গে থাকলে ভূতপেরেত নাকি ক্ষতি করতে পারবে না। গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে ফুলমণি বলেছিলেন, 'যা বাপ, ভালোয় ভালোয় ফিইরে আসিস বটে।' বলে মারাংবুরু আর শিসদেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়েছিলেন।

পাণ্ডু ঠাট্টা করে বলেছিল, 'আপনার কাছে কি আর একটা মাদুলি আছে?'

'ক্যানে, তুর কী দরকারটো আছে?'

'শম্ভুদার জন্য দরকার। ওকে ভূতে ধরলে, অ্যাম্বুলেন্সটা চালাবে কে? আমরা ফিরেই বা আসব কি করে?'

শুনেই জ্বলে ওঠেন ফুলমণি, 'উর কথা বলিস লাই বাপ। উ পাপী, উকে ভূতপেরেত ছুবেক লাই।'

অ্যাম্বুলেন্সে বসে ফুলমণির কথাগুলো মনে পড়ায় পাণ্ডুর হাসি পাচ্ছিল। পরক্ষণেই ওর মনে হয়, শম্ভুদা সেই কখন গিয়েছে কুন্তীকে ডেকে আনতে... এত দেরি করছে কেন! নীচে নেমে কোয়ার্টারের ভিতরে যাবে কি না ভাবার সময়ই হঠাৎ পাণ্ডুর চোখে পড়ল, কোয়ার্টারের গেটের কাছে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। ছয় ফুটের মতো লম্বা। পরনে ট্রাউজার্স আর ফুলস্লিভ জামা আর টাই। মাথায় পুরোনো আমলের গোল টুপি। এত ঠান্ডা, তবুও গায়ে কোনও কোট নেই। লোকটা ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। মুখ দুধের মতো সাদা। কী যেন বলার চেষ্টা করছে লোকটা। গাড়ির কাচ তোলা, তাই কথাগুলো পাণ্ডু শুনতে পেল না।

ডাঃ কুন্তীর কোয়ার্টারে বহুবার এসেছে পাণ্ডু। কখনও এই লোকটাকে ত্রিসীমানার মধ্যে দেখেনি। হঠাৎ উদয় হল কোত্থেকে? কোনও বদমতলব নেই তো? হয়তো জানতে পেরেছে, রাতে কোয়ার্টারে কেউ থাকবে না। চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়েও আসতে পারে। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তা হলে পাণ্ডুকে দেখা দেবে কেন? বাঁ হাত নেড়ে ইঙ্গিতই বা করবে কেন? লোকটা কি ওকে ফিরে যেতে বলছে? হ্যাঁ, এখন তো তাই মনে হচ্ছে। করুণ মুখে লোকটা স্পষ্ট যেন বলতে চাইছে, 'তোমরা যেয়ো না।' অবাক হয়ে পাণ্ডু গাড়ির দরজা খুলে নীচে নেমে এল। লোকটার সঙ্গে কথা বলা দরকার। দু' এক পা এগিয়েও, একটা কথা মনে পড়ায় পাণ্ডু দাঁড়িয়ে গেল।

কোনও অশরীরী আত্মা নয়তো? ভাবতেই ওরা সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আর তখনই পাণ্ডু দেখল, চোখ মুছতে মুছতে কুন্তী বেরিয়ে আসছে গেট দিয়ে। ওকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে রুমালি। পরনে নীল শাড়ি, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে কুন্তীকে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার পাশ দিয়ে ওরা দু'জন হেঁটে আসছে। আশ্চর্য, লোকটাকে কেউ দেখতেই পেল না। লোকটাও মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। নিঝুম রাত... এই মারাত্মক ঠান্ডায় শিসপাহাড়িতে এই সময় কেউ ঘরের বাইরে বেরয় না। কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকে। লোকটাকে ও সত্যিই দেখেছে, নাকি চোখের ভ্রম, পাণ্ডু ঠিক বুঝতে পারল না। ওর বিজ্ঞানমনস্কতা আশ্বস্ত করল, অশরীরী আত্মা-টাত্মা কিছু নয়। চোখের ভুল। কিন্তু, কুন্তী আর রুমালি গাড়ির পিছনের দিকে ওঠে পড়ার পর, অ্যাম্বুলেন্স ব্যাক করার সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে পাণ্ডু দেখতে পেল, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা কপাল চাপড়াচ্ছে।

আগেই কথা হয়েছিল, রুমালিকে ওরা সিস্টার ফুলমণির কাছে রেখে, জংশনে যাবে। রাতে কোয়ার্টারে একা থাকতে রুমালি ভয় পাবে বলে। সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের

কাছে রুমালিকে নামিয়ে দিয়ে, পাণ্ডু পিছনে কুন্তীর উলটো দিকের সিটে গিয়ে বসল। কুন্তী বোধ হয় সারাদিন ধরে কান্নাকাটি করেছে। ওর চোখমুখ ফোলা ফোলা। দেখে খুব মায়া লাগল পাণ্ডুর। ডাঃ নীলমাধব মহাপাত্র যে মারা গিয়েছেন, বেচারির কানে এখনও সেই খবরটা যায়নি। উনি কেমন আছেন, তা জানতে চেয়ে সারা দিনে কুন্তী অন্তত সাত-আট বার ফোন করেছে পাণ্ডুকে। প্রতিবারই পাণ্ডু উত্তর দিয়েছে, 'একই রকম।' কী একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি! পাণ্ডু জানে, ভদ্রলোক আর বেঁচে নেই। অথচ তাঁরই সঙ্গে দেখা করার জন্য কুন্তীকে নিয়ে যাচ্ছে স্টেশনে। সত্যি কথাটা কুন্তীকে বলার সাহসই ও পাচ্ছে না।

অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতাল কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কুন্তী জিজ্ঞেস করল, 'ভুবনেশ্বরে আর কি ফোন করেছিলেন ডাঃ পাণ্ডু?'

'হ্যাঁ। ওই একই কথা... তোমার বাপ্পা আইসিইউতে আছেন। খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থা।'

'আমি তো বুঝতেই পারছি না, উনি আমাকে জংশনে দেখা করতে বললেন কেন? এখন মনে হচ্ছে, সোজা ভুবনেশ্বরের হাসপাতালে চলে গেলেই আমরা ভালো করতাম।'

কথাটা বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢেকে কুন্তী কেঁদে ফেলল। পাণ্ডুর ইচ্ছে করল, উঠে গিয়ে ওর পাশে বসে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু, নিজেকে ও সংযত করল। ঘনিষ্ঠতার চেষ্টাটা কুন্তী যদি ভালোভাবে না নেয়? কথা বললে বাপ্পার প্রসঙ্গ ও ভুলে থাকতে পারবে। তাই, পাণ্ডু বলল, 'তোমার নিকটাত্মীয় কেউ নেই?'

কুন্তী ভাঙা গলায় বলল, 'আছেন, এক পিউসি। বাপ্পার থেকে বয়সে উনি বড়ো। আমার ঠাকুর্দার সম্পত্তি নিয়ে সেই পিউসির সঙ্গে বাপ্পার মনোমালিন্য হয়েছিল। সেই রাগে বাপ্পাকে উনি বাণ মারেন। সেই সময়ই প্রথম বাপ্পার হার্ট অ্যাটক হয়। তার পর থেকে বাপ্পা আর কোনও সম্পর্ক রাখেননি পিউসির সঙ্গে। জানি না, এ বারও পিউসি বাণ মেরেছেন কি না? দুপুরে প্রভা আন্টিকে ফোন করেছিলাম। উনি বললেন, বাপ্পা অসুস্থ হয়ে পড়ার আগের দিন নাকি পিউসি এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে।'

'ডাক্তার হয়ে এ সব তুকতাকে তুমি বিশ্বাস করো নাকি কুন্তী? তুমি তো সিস্টার ফুলমণির মতো কথা বলছ। মনের ভিতর এই ধরনের কুসংস্কার স্থান দিয়ো না।'

'কী করব বলুন, আমি এমন একটা পরিবারে মানুষ হয়েছি, আমাকে এ সব বিশ্বাস করতে হয়েছে। চোখের সামনে এমন সব ঘটনা দেখেছি, বিশ্বাস না করে উপায় নেই।'

'তোমার মা কতদিন আগে মারা গিয়েছেন কুন্তী?'

'বছর পাঁচেক আগে। তখন আমি ভুবনেশ্বরে... মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে। সেই রাতে স্পষ্ট দেখলাম, জানলার সামনে মা এসে দাঁড়িয়েছেন। পূর্ণিমার রাত ছিল। চাঁদের আলোয় মাকে দেখে আমি তো অবাক!

অত রাতে মা হোস্টেলে এলেন কী করে? মা শুধু বললেন, 'তোর বাপ্পাকে দেখিস। আমি চললাম রে।' শুনে বিছানায় আমি উঠে বসার আগেই দেখি, মা নেই। আমার

রুমমেট ছিল জগন্নাথ মন্দিরের এক সেবাইতের মেয়ে সরমা। মায়ের কথা বলায় ও বলল, 'খবর ভালো মনে হচ্ছে না রে কুন্তী। প্রভু জগন্নাথের স্তব আওড়া।'

পরদিন সকালে হোস্টেলে খবর এল, মা নেই। অন্য কেউ যদি আমাকে বলত, এই কথাটা আমি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু, এ আমার চোখে দেখা। কী করে অবিশ্বাস করি, বলুন?'

'কীভাবে মারা গিয়েছিলেন তোমার মা?'

'হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক। বাপ্পাকে নিয়ে অসম্ভব টেনশনে থাকতেন মা। মায়ের কাছে বাপ্পা ছিলেন, পতি পরম গুরু। দু'জনের মধ্যে এত ভালোবাসা ছিল, ভাবতেও পারবেন না। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই বাপ্পা কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেলেন। আমার মনে হত, মা বাপ্পাকে ছেড়ে যাননি। নিজের চোখে দেখেছি, প্রায়ই বাপ্পা ঘরে বসে একা একা কথা বলতেন মায়ের সঙ্গে। তার পর তো চাকরি করার জন্য আমাকে এতদূর চলে আসতে হল। মায়ের অনুরোধটা আমি রাখতে পারলাম না।'

'আক্ষেপ করো না কুন্তী। প্রভু জগন্নাথের উপর ভরসা রাখো। উনি যা করেন, মঙ্গলের জন্য করেন।'

'বাপ্পার যদি খারাপ কিছু হয়, তা হলে আমি একলা হয়ে যাব ডাঃ পাণ্ডু।'

'ভুল বললে কুন্তী। আমার মা মারা যাওয়ার পর আমিও একই কথা ভাবতাম। আমারও তিন কূলে কেউ নেই। কিন্তু এখন মোটেও আমার মনে হয় না, একা আছি। এই যে হাসপাতাল, এটাই তো আমার পরিবার। এই যে শিসপাহাড়ি, এটাই তো আমার বাড়ি। আর বলি কী, মনটাকে তুমি প্রস্তুত করে রাখো। চিরদিন তো কেউ বেঁচে থাকেন না। এটাই জগতের নিয়ম।'

'আপনি পুরুষ মানুষ। আপনার পক্ষে একা থাকা যতটা সহজ, আমার পক্ষে ততটাই কঠিন।'

'কে বলল, তুমি একা কুন্তী? আমি তোমার সঙ্গে আছি। সারাটা জীবন তোমার সঙ্গে থাকতে আমি রাজি।'

আবেগের মাথায় কথাটা বলেই পাণ্ডু গুটিয়ে গেল। এই কথাটা কি এখন বলার সময়? ছি ছি, কী ভাবল কুন্তী?

ওর মুখে দিকে তাকানোর সাহসও পাণ্ডু জোগাড় করে উঠতে পারল না। মুখ নীচু করে বসে রইল। ভাগ্যিস, অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরটা এখন অন্ধকার। কুন্তীর মুখটা আবছা দেখা যাচ্ছে।

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ছুটে যাচ্ছে স্টেশনের দিকে। এতক্ষণ কথা বলছিল বলে পাণ্ডু বাইরের দিকে তাকায়নি। এ বার রাস্তার দিকে তাকাতেই ও চমকে উঠল। এক পাশে ঘন জঙ্গল। বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি। অন্য পাশে খাল-বিল, জলা জমি। হেডলাইটের হলদেটে আলোয় সামনের দিকের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। পাণ্ডু দেখল, বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে কিছু লোক লাইন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আলো গায়ে লাগতেই লোকগুলো বিরক্তিভরা মুখে তাকাচ্ছে। মুখগুলো কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের।

অনেকদিন মর্গে পড়ে থাকা লাশের মতো। সিস্টার ফুলমণি তা হলে মিথ্যে ভয় দেখাননি। পাণ্ডুর বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ির ঘা মারতে শুরু করল। ওর মন বলল, এরা কেউ শরীরী নয়। বাইরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে ও কুন্তীর দিকে তাকাল।

চোখাচোখি হতেই কুন্তী জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকগুলো কারা ডাঃ পাণ্ডু?'

'বুঝতে পারছি না। মনে হয়, স্টেশনের দিকে যাচ্ছে।'

'কী ভয়ঙ্কর দেখতে, তাই না? আমার খুব ভয় করছে।' বলতে বলতে উল্টো দিকের সিট ছেড়ে উঠে এল কুন্তী। পাশে বসে বলল, 'আমরা কি লাশপুরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি?'

সাহস জোগানোর জন্য পাণ্ডু বলল, 'হবে হয়তো। তুমি বাইরের দিকে তাকিয়ো না কুন্তী। আমাকে শক্ত করে ধরে থাকো। তা হলে আর ভয় লাগবে না।'

সংকোচ না করে সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুর বাঁ হাতটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরল কুন্তী। কাঁধে মাথা দিয়ে চোখ বুঁজে রইল। অনেকক্ষণ পর ফিসফিস করে বলল, 'একটু আগে যা বললেন, সত্যি?'

'কী বললাম কুন্তী?'

'এই যে... সারাটা জীবন আমার সঙ্গে থাকতে রাজি।'

'সত্যি। এর থেকে বড়ো সত্যি আর হয় না। কিন্তু, তুমি কি সারাটা জীবন আমার সঙ্গে কাটাতে রাজি?'

মুখে উত্তর না দিয়ে পাণ্ডুর কাঁধে মাথা ঝাঁকাল কুন্তী। আত্মনিবেদনের ওই ভঙ্গিতেই ওর মনের কথা বুঝিয়ে দিল।

ঠিক এই সময় অ্যাম্বুলেন্সটা হঠাৎই মারাত্মক জোরে দৌড়তে শুরু করল। এমন গাঢ় কুয়াশা যে, সামনের দিকটায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না পাণ্ডু। সাদা দানোর মতো কুয়াশা পাক খেয়ে খেয়ে গাড়িটাকে গিলে খেতে আসছে। ওর ভয় হল, অ্যাম্বুলেন্সটা না অ্যাক্সিডেন্ট করে বসে। চোখ ফিরিয়ে ডান দিকে তাকাতেই পাণ্ডু অবাক হয়ে গেল। জলাজমির ও পাশে জনপদ। সেখানে কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই। পরিষ্কার সব দেখা যাচ্ছে, গৃহস্থের ছোট ছোট বাড়িতে আলো জ্বলছে। হাট-বাজারে লোকজন চলাফেরা করছে। গাড়ির হেডলাইটও একবার দেখতে পেল পাণ্ডু। তা হলে কি ওরা স্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছে? এই অনুভূতিটা হওয়া মাত্র পাণ্ডুর মন থেকে যাবতীয় ভয়, উদ্বেগ চলে গেল।

এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটছে। ঝাঁকুনি সামলানোর জন্য কুন্তী একহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে ওকে। ওর শরীর থেকে আশ্চর্য সুগন্ধি বেরিয়ে আসছে। পরম মমতায় কুন্তীর পিঠে হাত রাখল পাণ্ডু। সেই স্পর্শে শিউরে উঠে কুন্তী ওর বুকে মুখ গুঁজে দিল। ঠিক তখনই গাড্ডায় পড়ে গাড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ধমক দেওয়ার জন্য ড্রাইভারের সিটের দিকে তাকাতেই পাণ্ডু দেখল, শম্ভুদা নেই। স্টিয়ারিং হাতে বসে সেই লম্বা লোকটা, যাকে খানিক আগে ও কুন্তীর কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে হাহুতাশ করতে দেখেছে!

মাথায় গোল টুপি, গায়ে ফুলস্লিভ শার্ট। লোকটা একবার পাশ ফিরে তাকাল। তার পর ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড মাই ফ্রেন্ড। নোবডি ক্যান হার্ম ইউ। আই উইল টেক ইউ টু দ্য জংশন।'

১০

'কুন্তী ওঠো। আমরা স্টেশনে এসে গেছি।'

পাণ্ডুর ডাকে চোখ খুলল কুন্তী। উজ্জ্বল আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এতক্ষণ ও পাণ্ডুর বুকে মুখ গুঁজে ছিল। বাইরের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, একটা গাছতলায় অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে পড়েছে। মাথায় গোল টুপি পরা লোকটা দরজা খুলে বেরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তার দিকে। যেতে যেতে লোকটা একবার পাশ ফিরে তাকাল। তার পর গুডবাই জানানোর ভঙ্গিতে একবার হাত তুলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দিনের বেলায় কুন্তী যখন এই স্টেশন চত্বরে আসে বা যায়, তখন লোকজনে গিজগিজ করে। সাইকেল ভ্যান চালক আর ফিরিওয়ালাদের হাঁকডাকে পুরো জায়গাটা গমগম করে। এখন একটাও লোক নেই। গাঢ় কুয়াশা ছেয়ে ফেলেছে আশপাশ। কুয়াশায় হালকা নীল রঙের প্রলেপ। কেমন যেন একটা মায়াবি পরিবেশ। গভীর রাতে এই মারাত্মক ঠান্ডায় লোকজন আশা করাই অবশ্য উচিত নয়। কুন্তী নিজেকে অভয় দিল এই বলে, কাছাকাছি আর কেউ না থাক, ওর সব থেকে প্রিয়জন তো সঙ্গে রয়েছে!

পিছনের দরজা খুলে পাণ্ডু নীচে নেমে গিয়েছে। হাত ঘড়ির দিকে ও তাকিয়ে বলল, 'ট্রেন ছাড়ার সময় এখনও অনেকটা সময় বাকি। চলো, খোঁজ করি, ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে?'

গাড়ি থেকে নীচে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কুন্তী ঠান্ডায় কুঁকড়ে গেল। পুরো চত্বরটা মর্গের মতো ঠাণ্ডা।

ভাগ্যিস ও একটা কাশ্মিরী শাল জড়িয়ে এসেছিল। সুন্দর কারুকার্য করা এই শালটা এনে দিয়েছিলেন বাপ্পা।

একবার দিল্লিতে চোখের ডাক্তারদের কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। জনপথ রোড থেকে সেবার ওর আর মায়ের জন্য দুটো শাল কিনে আনেন। এখন দুটো শালই অবশ্য কুন্তীর জিম্মায়। শালটা গায়ে ভালোমতো জড়িয়ে নিয়ে কুন্তী বাপ্পার স্নেহের উত্তাপ অনুভব করল। আর একটু পরেই বাপ্পার সঙ্গে দেখা হবে। ভাবতেই ওর মনটা ভালো হয়ে গেল। বাপ্পার জন্য ও গাজরের হালুয়া নিয়ে এসেছে। আজ তৃপ্তি করে খাওয়াবে। গাজরের হালুয়ার কথা মনে পড়তেই কুন্তী হাত বাড়িয়ে গাড়ির ভিতর রাখা কিট ব্যাগটা টেনে নিল। কী ভুলো মন! ব্যাগ না নিয়েই ও নীচে নেমে গিয়েছিল।

পাণ্ডু কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছে। ওর পিছন পিছন স্টেশন বিল্ডিংসে এসে দাঁড়াল কুন্তী। আপদমস্তক কম্বল জড়িয়ে কাউন্টারে বসে আছে একটা লোক। হলদেটে আলোয়

তার মুখ ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। পাণ্ডু জিজ্ঞেস করল, 'দুটো উনচল্লিশের ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে ভাই?'

কী অদ্ভুত কাউন্টারের লোকটা, কোনও উত্তরই দিল না। কুন্তীর মনে হল, লোকটা বোধ হয় ঘুমিয়ে রয়েছে।

ভাবতেই ওর হাসি পেয়ে গেল। ফাঁকিবাজির একটা সীমা আছে। হাসপাতালে ওরাও নাইট ডিউটি দেয়। কই, কোনওদিন তো ঘুমিয়ে পড়ে না? পিছন থেকে গলা তুলে এ বার ও-ই প্রশ্নটা করল। তাতে কাজ হল। কথা বলল না বটে, কিন্তু লোকটা হাত তুলে পিছনের দিকে কী যেন ঈঙ্গিত করল। পিছনের দিকে তাকিয়ে কুন্তী দেখল, একটা ইলেকট্রনিক বোর্ড। তাতে নীল আর সাদা আলোয় ট্রেনের টাইম আর প্ল্যাটফর্ম নম্বর দেওয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টার থেকে সরে এল কুন্তী। বোর্ডের দিকে তাকাতেই ওর চোখে পড়ল, দুটো উনচল্লিশের ট্রেন... মুক্তি এক্সপ্রেস ছাড়বে তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে।

পাশ ফিরে পাণ্ডুকে ও বলল, 'চলুন, আমরা তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসি। ওভারব্রিজ দিয়ে যেতে হবে। সময় লাগবে।'

পাণ্ডু বলল, 'দাঁড়াও কুন্তী, আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। এই জংশন দিয়ে এতদিন যাতায়াত করছি, তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মের কথা কিন্তু কখনও শুনিনি।'

কুন্তী বলল, 'নিশ্চয় আছে। না হলে বোর্ডে লেখা থাকবে কেন? হয়তো কখনও আপনার চোখে পড়েনি। উফ, আর কথা বাড়াবেন না। খুব ঠান্ডা লাগছে। চলুন, ওভারব্রিজে উঠি।'

কথাগুলো বলেই ও পাণ্ডুর হাত ধরে টানল। পাণ্ডুকে স্পর্শ করার কথা আজ সকালেও ও ভাবতে পারত না। কিন্তু এখন ওকে খুব আপনার লোক বলে মনে হচ্ছে। কুন্তীর ইচ্ছে করছে, পাণ্ডুর বুকে ফের মাথা গুঁজে থাকতে। পাণ্ডুর হাতটা ও ছাড়ল না। বুকের কাছে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওয়েটিং রুমের দিকে। কিন্তু ওর একটু অবাকই লাগল এই ভেবে যে, পাণ্ডুর দিক থেকে কোনও তাপ-উত্তাপ টের পেল না।

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই পাণ্ডু দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'ওভারব্রিজের দিকে একবার তাকাও কুন্তী। কত লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, দেখছ? এত রাতে এত লোক এল কোত্থেকে?'

তাকিয়ে কুন্তী দেখল, সত্যিই প্রচুর লোক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। দেখে ওর অবাক লাগল। ওই দিকে তাকিয়ে থাকার সময় ও আবিষ্কার করল, ওভারব্রিজের সামনের দিকে লোকগুলো এগিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার পর আর তাদের দেখা যাচ্ছে না। ঘন কুয়াশার জন্য ওভারব্রিজের ও পাশের অংশ একেবারেই অদৃশ্য। ওই দিকটায় কোনও প্ল্যাটফর্মও কুন্তীর চোখে পড়ল না। ফের লোকগুলোর দিকে তাকাল ও। সবার গায়ে জড়ানো একই রকম হালকা ধূসর রঙের কম্বল। ওদের হাঁটার ধরনও খুব অদ্ভুত। হাত দুটো সামনের দিকে এমনভাবে মুঠো করা, যেন কেউ হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্স থেকে ঠিক এই দৃশ্যই কুন্তী দেখতে পেয়েছিল রাস্তায়। হয়তো সেই লোকগুলোই ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে এসেছে।

ওভারব্রিজের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কুন্তী এ বার পাণ্ডুর দিকে তাকাল। ঠান্ডায় হি হি করে কাঁপছে। ইস, বেচারী বোধ হয় বুঝতেই পারেননি, জংশনের দিকটায় এত ঠান্ডা পড়বে। ওঁর পরনে ফুল স্লিভ সোয়েটার, তার উপর ব্লেজার। সঙ্গে একটা মাঙ্কি ক্যাপ নিয়ে এলে পারতেন। পাণ্ডুর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব মায়া হল কুন্তীর। এই মাঝরাতে হাসপাতালের কোয়ার্টারে ওঁর লেপের তলায় শুয়ে থাকার কথা। পরোপকার করতে এসে বেচারীর কী অবস্থা! ওঁকে জড়িয়ে ধরে নিজের শরীরের উত্তাপ দেওয়ার ইচ্ছে হল কুন্তীর। কিন্তু না, এত তাড়াতাড়ি আগ্রহ দেখানোটা উচিত হবে না। বাইরে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকলে প্রিয় মানুষটা আরও কষ্ট পাবেন। ওয়েটিং রুমের বোর্ড চোখে পড়ায় কুন্তী বলল, 'এখনও অনেক সময় আছে। চলুন, আমরা ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসি।'

কয়েক পা আগে বাঁ দিকে ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের ওয়েটিং রুম। ভুবনেশ্বর যাওয়ার সময় কুন্তী অনেকদিন ট্রেনের জন্য এই ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করেছে। ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের ওয়েটিং রুমে অবাঞ্ছিতদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই ও একটু দমে গেল। ভেবেছিল, একটু নিরিবিলিতে বসা যাবে। কিন্তু দেখল, বেশ কিছু প্যাসেঞ্জার ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে। তাদের সর্বাঙ্গে জড়ানো কম্বল। নিদ্রিত সব মুখ। কেউ দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাত হয়ে আছে। কেউ দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ঘুমোচ্ছে। কেউ আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে মেঝেতেই শুয়ে পড়েছে। কোণের দিকে একটা বেঞ্চ খালি আছে দেখে পাণ্ডুকে সঙ্গে নিয়ে সেখানেই গিয়ে বসল কুন্তী। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডু ওকে বুকের কাছে টেনে নিল।

কুন্তীর সারা শরীরে শিহরন খেলে গেল। আশপাশে ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জারদের কথা ভুলে গিয়ে ও পাণ্ডুর গলা জড়িয়ে ধরল। খানিকটা সময় ওই অবস্থায় থেকে তার পর বলল, 'সত্যিই কি আপনি সারাটা জীবন আমার সঙ্গে কাটাতে চান ডাঃ পাণ্ডু?'

ঠোঁটে ঠোঁট নামিয়ে দীর্ঘ চুম্বন দিয়ে পাণ্ডু বলল, 'সত্যি।'

অনাস্বাদিত এক অনুভূতিতে কুন্তীর শরীর তপ্ত হচ্ছে। স্তনবৃন্ত শক্ত হয়ে গিয়েছে। বাঁ হাত দিয়ে পাণ্ডুর মুখটা নিজের বুকের মাঝে টেনে এনে ফিসফিস করে ও বলল, 'তা হলে এতদিন বলোনি কেন?'

'সাহস হয়নি। পাছে তুমি আমায় রিজেক্ট করো।'

কথাটা বলতে বলতে পাণ্ডু ওর স্তনে মুখ ঘষতে শুরু করল। কুন্তীর মুখ দিয়ে শিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে এল। প্রায় তিরিশ বছর বয়স হতে চলল ওর। গোঁড়া পরিবারের ঘেরাটোপে বড়ো হয়েছে। মায়ের কাছ থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছে, স্বামী ছাড়া আর কেউ যেন শরীর স্পর্শ না করে। তাই পরপুরুষদের কাছ থেকে কুন্তী দূরে দূরে থেকেছে। হোস্টেলে থাকার সময় বিবাহিত বন্ধুদের কাছ থেকে যৌনক্রিয়া নিয়ে নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা ও শুনত। আর পাঁচটা মেয়ের মতো ওরও প্রবল

যৌনইচ্ছা হত। কিন্তু সেই ইচ্ছাটা ও এতদিন দমিয়ে রাখতে পেরেছে। জীবনে মাত্র একবারই ওর যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে অভিজ্ঞতা ভয়ানক। পুরুষদের সম্পর্কে ঘেন্নাই জমেছিল মনের মধ্যে। কিন্তু, আজ পাণ্ডুর একটা চুম্বন, ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল ওর সংযমকে।

সত্যি বলতে কী, শিসপাহাড়িতে চাকরি না পেলে সেই যৌনভীতি আর বিতৃষ্ণাটাই ওর মনের মধ্যে থেকে যেত। কিন্তু, হাসপাতালে পাণ্ডুকে দেখার পর থেকেই পুরুষদের সম্পর্কে ধারণাটা ওর বদলাতে থাকে। আর ওর সেই ভাবনাটাকে আরও উসকে দেন সিস্টার ফুলমণি। পাণ্ডুকে নিয়ে ও একটা স্বপ্নের জগৎ তৈরি করেছে। রাতে বিছানায় শুয়ে পাশবালিশ আঁকড়ে ধরে, কোনও কোনওদিন কল্পনাও করেছে, পাণ্ডু ওকে আদর করছে। চুমুতে ভরিয়ে দিচ্ছে। স্তন নিয়ে খেলা করছে। এমনকী, সঙ্গমও করছে। কুন্তী ভাবতেও পারেনি, সেই স্বপ্ন এত তাড়াতাড়ি বাস্তব হয়ে যাবে। পাণ্ডুর ঠোঁটে কী জাদু আছে, কে জানে? ওর শরীরটা হঠাৎ হালকা হয়ে গেল। নিজেই পাণ্ডুর হাতটা তুলে নিয়ে ও স্তনের কাছে নিয়ে এল। তার পর ফিসফিস করে বলল, 'নাও, আমাকে আরও ভালো করে আদর করো।'

পাণ্ডুরও কি কখনও যৌন অভিজ্ঞতা হয়নি? নরম স্তন হাতে ধরে পাণ্ডু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কী করা উচিত, বোধ হয় জানে না। তখনই সিস্টার ফুলমণির বলা একটা কথা কুন্তীর মনে পড়ল। 'তু কী মেয়া রে দিদিমণি? মরদগুলারে কীভাবে কাছে লিয়ে আসতে হয়, জানিস লয়? আয়, তুকে শিখাই দি।' সিস্টার ফুলমণি তার পর যা বলেছিলেন, তা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল কুন্তী। ও সব আদিবাসী সমাজে চলে। মরদ শিকার ওর পক্ষে সম্ভবই না। কিন্তু অসহনীয় যৌন তাড়নায় এক হাতে পাণ্ডুর মুখটা ও নামিয়ে আনল। তার পর পাণ্ডুর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দেওয়ার আগে বলল, 'বুদ্ধু কোথাকার।'

ঠিক সেই সময় ওয়েটিং রুমের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। কুন্তী চমকে উঠে দেখল, সারা শরীরে কম্বল জড়ানো লম্বা একটা লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ঘড়ঘড়ে গলায় লোকটা কী যেন বলল। তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না ও। দেহের তুলনায় লোকটার মাথা ছোটো। দরজায় পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফাঁক দিয়ে হু হু করে ঠান্ডা বাতাস ঢুকে আসছে। সাদা আলো তেরচাভাবে এসে পড়েছে ঘরের ভিতর। সেই আলোয় ঘুমিয়ে পড়া মানুষগুলো সবাই জেগে উঠল। ঘরের নিঃস্তব্ধতা ভেঙে একে একে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে লোকগুলো তাড়াহুড়ো করে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা মাইকের ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেল কুন্তী।

'দুটো উনচল্লিশের মুক্তি এক্সপ্রেস তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে।'

ঘোষণাটা শোনার পরই কুন্তীর মনে পড়ল, ও কী জন্য জংশনে এসেছে। ছি ছি, ওয়েটিং রুমে বসে ও কী করছিল এতক্ষণ? লজ্জায় পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকাতে পারল না কুন্তী। উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের শালটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে ও বলল, 'শিগগির চলো। ওভারব্রিজ দিয়ে অনেকটা যেতে হবে।'

মুহূর্তের মধ্যে ওয়েটিং রুম খালি হয়ে গিয়েছে। দরজায় দাঁড়ানো লম্বা লোকটাও আর নেই। বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীর বুক ধুকপুক করতে লাগল। ইশ, তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছনোর আগে যদি ট্রেনটা ছেড়ে দেয়, তা হলে কী হবে? বাপ্পার সঙ্গে আর তা হলে ওর দেখাই হবে না। দ্রুত পায়ে ও ওভারব্রিজের দিকে এগোতে লাগল। কম্বল জড়ানো লোকগুলো ওভারব্রিজে উঠে পড়েছে। এত তাড়াতাড়ি লোকগুলো উপরে উঠে গেল কী করে? সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগে পাণ্ডুর হাতটা ধরে ও বলল, 'একটু পা চালাও প্লিজ।'

গোটা কুড়ি সিঁড়ি টপকে দু'জনে ওভারব্রিজে ওঠার পরই, নীচে দাঁড়ানো ট্রেনটা কুন্তীর চোখে পড়ল। সার্চ লাইট জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হুইসল দিচ্ছে। এই রে, ছেড়ে দেবে নাকি? পাণ্ডুর হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়েই ও দৌড়োতে শুরু করল। কুয়াশার জন্য সামনের দিকটা ওরা দেখতে পাচ্ছে না। কুন্তী দেখতেও চায় না। কেননা, ওর নজর নীচের প্ল্যাটফর্মের দিকে। বারোটা প্ল্যাটফর্ম ওদের পেরোতে হবে। দৌড়তে দৌড়তে একটা সময় কুন্তী টের পেল পায়ের তলায় কিছু নেই। ওভারব্রিজ শেষ হয়ে গিয়েছে। দু'জনে হাত ধরাধরি করে নীচের দিকে পড়ে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওরা উপর থেকে আছড়ে পড়ল। কুন্তী অনুভব করল, ওর পিঠটা কিসে যেন ঠোক্কর খেল। ওর চোখের সামনে নানা রঙের ফুলকি। জ্ঞান হারানোর আগে কুন্তী টের পেল, ছাইয়ের গাদার উপর পাণ্ডু উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

কতক্ষণ ওইভাবে পড়েছিল, কুন্তী জানে না। চোখ খুলতেই ও শুনল, পাণ্ডু ডাকছে, 'এই ওঠো। এক্ষুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে।'

উপর থেকে পড়ার পরও পাণ্ডুর তা হলে কিছু হয়নি! দেখে নিশ্চিন্ত হল কুন্তী। উঠে দাঁড়ানোর সময় ওর মাথাটা টলে গেল। পিঠের ডানদিকটা ব্যথায় টনটন করছে। হাত দিয়ে ও দেখল, জায়গাটা বেশ ফুলে রয়েছে। যাক, তা হলে রক্তক্ষরণ হয়নি। ইন্টার্নাল হেমারেজও হয়নি। হলে কিন্তু ও এই অল্প সময়ের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে পারত না। হেমারেজ হয়েছে কি না সেটা হাসপাতালে ফিরে গিয়ে স্ক্যান করে নিলেই জানা যাবে। পাণ্ডুর হাতটা ধরে ও জিজ্ঞেস করল, 'তোমার চোট-টোট লাগেনি তো কোথাও?'

পাণ্ডু বলল, 'না, না। এই তো আমি দিব্যি আছি।'

নিশ্চিন্ত হয়ে কুন্তী বলল,'চলো তা হলে। বাপ্পার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

দু'জনে হাত ধরাধরি করে উঠে দাঁড়াতেই সামনের দিকে তাকিয়ে চমক উঠল। প্রায় সাত ফুট লম্বা একটা লোক অন্ধকার ফুঁড়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কুৎসিত দর্শন, দেহের তুলনায় মাথাটা ছোটো। লম্বা চুল, মুখ দাড়ি-গোঁফে ভর্তি। ঘড়ঘড়ে গলায় লোকটা বলল, 'কোথায় পালাচ্ছিলি? তোদের জন্যই ট্রেনটা আমি আটকে রেখেছি। আয় আমার সঙ্গে। এই নে তোদের টিকিট। তোদের কোন কামরায় বসতে হবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে পাণ্ডু। ওর অবাকই লাগছে এই ভেবে যে, জানলাটা খোলা, অথচ ওর ঠান্ডা লাগছে না। ওভারব্রিজ থেকে পড়ে যাওয়ার পর থেকে ওর মনে হচ্ছে, ঠান্ডা-গরমের অনুভূতিটাই ওর চলে গিয়েছে। হঠাৎ এটা কেন হল, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেক চিন্তা করেও খুঁজে পায়নি পাণ্ডু। প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফুট উপর থেকে ওরা আছড়ে পড়ল। তা সত্ত্বেও, ওর শরীরে কোনও ইনজুরির চিহ্ন নেই। ছাইয়ের গাদার উপর পড়েছিল বলেই কি? ওভারব্রিজ দিয়ে দৌড়নোর সময় ঘন কুয়াশার জন্য ও আর কুন্তী বুঝতেই পারেনি, ব্রিজের অর্ধেক অংশ নেই। নীচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডু অবশ্য বুকের কাছটায় যন্ত্রণা অনুভব করেছিল। তার পর ওর আর জ্ঞান ছিল না।

ট্রেনের কামরায় খুব সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে বেরাচ্ছে। ফুল, না অন্য কিছুর, পাণ্ডু বুঝতে পারল না। জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে ও দেখল, কুন্তী ওর বাপ্পার সঙ্গে বসে কথা বলতে বলতে, মাঝে মাঝে চামচে করে গাজরের হালুয়া খাইয়ে দিচ্ছে। বেলা বারোটার সময় পাণ্ডু পুলিশের কাছে জানতে পেয়েছিল, নীলমাধব মহাপাত্র মারা গিয়েছেন। অথচ এখন তিনি কামরায় বসে মেয়ের হাত থেকে হালুয়া খাচ্ছেন! এটা কী করে সম্ভব? হাসপাতালের লোক কি তা হলে পুলিশের কাছে ভুল খবর দিয়েছিল? হতেও পারে। সরকারি হাসপাতালে কে কার খোঁজ রাখে? হয়তো নীলমাধব মহাপাত্র নামে অন্য কোনও লোক ওই সময় মারা গিয়েছেন। ভাগ্যিস, মৃত্যুর খবরটা তখন ফোন করে কুন্তীকে ও দেয়নি। দিলে কুন্তী হয়তো তখনই সোজা চলে যেত ভুবনেশ্বরে।

নীলমাধববাবু বেশ সুদর্শন। কথাও বলেন পিতৃসুলভ। ট্রেন ওঠার পর কুন্তী যখন পরিচয় করিয়ে দেয়, তখন উনি পাণ্ডুকে আন্তরিকভাবে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। নিজের বাবার কথা পাণ্ডুর মনে নেই। ওর খুব অল্প বয়সে উনি মারা যান। বাবাকে ও চিনেছে, দেওয়ালে টাঙানো ছবি থেকে। বাবার দায়িত্বটা বরাবর পালন করেছেন মা। কুন্তীর বাবাকে দেখার পর পাণ্ডুর চোখের সামনে বাবার সেই ছবিটা ভেসে উঠেছিল। বছরে একটা দিন ছবিতে মালা পরিয়ে দিত মা। বাবার মৃত্যুদিনে ওকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে যেত। তখন বলত, 'সময়-সুযোগ করে একবার গয়ায় গিয়ে বাবার পিণ্ডদান করে আসিস। না হলে উনি উদ্ধার পাবেন না।' ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করার পরই চাকরিতে ঢুকে পড়েছে পাণ্ডু। গয়ায় আর যাওয়া হয়নি। ট্রেনের কামরায় বসে হঠাৎই ওর মনে হল, খুব অন্যায় করেছে। ছেলের কর্তব্য এবার ওকে করতেই হবে। গয়ায় গিয়ে বাবা আর মা-দু'জনেরই পিণ্ডদান করে আসবে।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, শাড়ির আঁচল দিয়ে নীলমাধববাবুর মুখ মুছিয়ে দিয়ে কুন্তী বলল, 'আপনি একটু রেস্ট নিন বাপ্পা। আমি পাণ্ডুর কাছে গিয়ে বসেছি।'

নীলমাধববাবু বললেন, 'কতদিন পর তোকে কাছে পেলাম রে ঝিও। তোর সঙ্গে কথা বলতে পেরে মনটা ভালো হয়ে গেল। আমার প্রবলেমটা কী জানিস, সারাদিন কথা বলার লোক নেই।'

কুন্তী উঠে আসতে গিয়েও বসে পড়ল। ট্রেনে ওঠার পর থেকে ও বাবার কাছছাড়া

হয়নি। দেখা হওয়ার পর তো ও আবদারই করেছিল,'আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আমার সঙ্গে শিসপাহাড়িতে থাকবেন চলুন।' নীলমাধববাবু হেসে উড়িয়ে দেন তখন কথাটা। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে তার পর উনি পাণ্ডুর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর পরিবারের কথা জানতে চান। তখনই কুন্তীর মনে পড়ে গাজরের হালুয়া আনার কথা। ও যখন বাবাকে খাইয়ে দিচ্ছিল, সেই সময় পাণ্ডু উঠে এসে জানলার কাছে বসে। বাবা আর মেয়েকে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ দিয়ে।

বাবার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কুন্তী জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কী হয়েছিল বাপ্পা? হাসপাতালে ভর্তি হতে হল কেন?' হয়েছিল কথাটা ও খুব নরমভাবে বলল।

নীলমাধববাবু বললেন, 'আর বলিস না। তোর বড়ো পিউসি এসে সেদিন আমার সঙ্গে এমন ঝগড়া করল, ও চলে যাওয়ার পরই আমার চেস্ট পেন শুরু হল। ভাবলাম, পেটে গ্যাস থেকে হচ্ছে। সেই পেন এমন বেড়ে গেল যে, শেষ পর্যন্ত প্রভারা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।'

'কী নিয়ে ঝগড়া, সম্পত্তি?'

'ওর তো সেই একই অ্যাজেন্ডা, তুই সেটা জানিস। পুরীতে তোর ঠাকুরদা যে বাড়িটা রেখে গিয়েছে, সেটা ওর ছেলের নামে লিখে দিতে হবে। সে নাকি হোটেল খুলবে। একটা অকালকুষ্মাণ্ড। না করল লেখাপড়া, না চালাতে পারল ওদের পৈতৃক ব্যবসা। স্রেফ ড্রিংক করে সব উড়িয়ে দিল। কেন তাকে দিতে যাব বাড়িটা? তোর পিউসিকে আমি না করে দিয়েছিলাম।'

'কেন ঝামেলা করতে গেলেন বাপ্পা? শরীর তো আপনারই খারাপ হল, তাই না?'

'না রে ঝিও, তেমন কিছু হয়নি। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সেরে গিয়েছিলাম। হয়তো বাড়িতেই ফিরে যেতাম। কিন্তু, কাল রাতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। তখন পৌনে দশটা হবে, বিছানায় শুয়ে আছি। দেখি, লম্বা মতো একটা লোক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "চল রে নীলমাধব, তোর টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে। তোকে এখন নতুন জগতে যেতে হবে।" আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। নতুন জগত মানে? লোকটা বলল, "গেলেই বুঝতে পারবি। শোন, তোকে আর মিনিট পনেরো সময় দিলাম। এর মধ্যে তোর এখানে যা কিছু আছে, সব কিছু গুছিয়ে নে। কাউকে কোনও খবর দেওয়ার থাকলে, দিতে পারিস।"...'

কুন্তী বলল, 'আশ্চর্য তো! কে এই লোকটা? আপনাকে নিয়েই বা যাচ্ছে কোথায়?'

'জানি না। আগে কখনও একে দেখিনি। বলেওনি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।'

'ওর পরিচয় আপনি জানতে চাননি?'

'চেয়েছিলাম। কিন্তু তখন নামটা বলল...কিমিন্দম। কিন্তু, পরিচয় দিল না। উলটে বলল, "তোর কাছে কেন এলাম, সেটা বলি। আপাতত, আমার কাজ হল তোকে ট্রেনে তুলে দেওয়া। আর সেই ট্রেন চেক পোস্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। এ বার তোর কর্মফল। চেক পোস্ট পার করে দেওয়ার পর আমার আর কোনও দায়িত্ব নেই। এই নে তোর টিকিট। চেক পোস্ট পেরনোর সময় দেখতে চাইলে দেখাবি। হারিয়ে ফেলিস না যেন।

এই টিকিট হারিয়ে ফেললে তুই কিন্তু নিজেও হারিয়ে যাবি। হাজার বছর ঘোরাঘুরি করেও আর ফিরে আসতে পারবি না।" এই কথাগুলো বলে লোকটা ট্রেনের একটা টিকিট আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "ট্রেন শিসপাহাড়ি জংশন থেকে ছাড়বে রাত ঠিক দুটো উনচল্লিশ মিনিটে। কাউকে বলার থাকলে বলে দিস।"

বাবা আর মেয়ের কথোপকথন পাণ্ডু মন দিয়ে শুনছিল। এ বার ও জিজ্ঞেস করল, 'এই কিমিন্দম লোকটা কি স্যার খুব লম্বা? ঘাড় পর্যন্ত চুলে আর মুখে দাড়ি-গোঁফ আছে?'

নীলমাধববাবু পাশ ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'ওই লোকটা আমাদের হাতেও টিকিট ধরিয়ে দিয়েছে। মনে হয়, এই ট্রেনের গার্ডজাতীয় কেউ হবে।'

'হতে পারে। কিন্তু, একটা কথা বলি। তোমরা তো আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে বাবা। ট্রেন ছাড়ার সময় নেমে গেলে না কেন?'

পাণ্ডু বলল, 'নামার চেষ্টা করেছিলাম স্যার। কিন্তু বেরতে গিয়ে দেখি, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। দেখি, পরের স্টেশনে নামা যায় কি না। যাক সে কথা, কিমিন্দম লোকটা আপনাকে ভুবনেশ্বর থেকে শিসপাহাড়িতে নিয়ে এল কী করে?'

'বলতে পারব না। যতদূর মনে আছে, হাসপাতালে লোকটা আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিল। তার পরই বুঝলে, মনটা আনন্দে ভরে গেল। সারা জীবন হাসপাতালে চাকরি করেছি। প্রতি মুহূর্তে টেনশন আর স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছি। প্রোফেশনাল রাইভালরি, চাকরির উন্নতির জন্য ল্যাং মারামারি, কত কী। সারা জীবন অশান্তির মধ্যে দিয়েই চলে গেল। কিন্তু বলব কী বাবা, ওই লোকটা কপালে হাত বুলিয়ে দেওয়ার পর মনে হল চাওয়া-পাওয়ার জীবন কত তুচ্ছ। মনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই দিদিকে ফোন করে বলে দিলাম, পুরীর সম্পত্তি তুই নিয়ে নে। উফ্ কী যে রিলিফ হল, তোমাকে কী বলব। তার পরই কুন্তীকে মেসেজ পাঠালাম। মনে হল, মেয়েটার সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করে যাই। তার পর কী হল, জানি না। চোখ খুলে দেখি, এই ট্রেনের কামরায় শুয়ে আছি।'

কুন্তী বলল, 'বড়ো পিউসিকে সব সম্পত্তি দিয়ে এসেছেন? খুব ভালো করেছেন বাপ্পা। এ বার শান্তিতে আপনি জীবন কাটাতে পারবেন।'

'ঠিক এই ফিলিংসটাই হচ্ছে রে ঝিও। মনে হচ্ছে, বাকি জীবনটা আমার খুব আনন্দে কাটবে। পাণ্ডুর কথা তোর কাছে এত শুনেছি। ওকে দেখারও খুব ইচ্ছে হয়েছিল। ওকে সঙ্গে নিয়ে এসে তুই খুব ভালো করেছিস কুন্তী। কবে আবার ফিরতে পারব, জানি না। তোরা দু'জন বিয়েটা সেরে ফেলিস। সুখে-শান্তিতে ঘর করিস। বাপ্পা হিসেবে আর কী চাই আমার?'

টানা অনেকক্ষণ কথা বলার জন্য একটু হাঁফাচ্ছে নীলমাধববাবু। সেটা লক্ষ করে কুন্তী বলল, 'থাক, আপনাকে আর কথা বলতে হবে না। এ বার শুয়ে পড়ুন।'

কথাটা শুনে বাধ্য ছেলের মতো নীলমাধববাবু টানাটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। ওঁর

গায়ে একটা কম্বল টেনে দিল কুন্তী। জানলার দিকে চোখ ফিরিয়ে পাণ্ডু ভাবল, বাবা আর মেয়ের মধ্যে কী সুন্দর সম্পর্ক। কুন্তী যে এত কেয়ারিং, পাণ্ডু তা ভাবতেও পারেনি। আজ পর্যন্ত ওকে যতটা দেখেছে, তা হাসপাতাল চত্বরে অথবা পেশাগত কর্মব্যস্ততার মধ্যে। ওকে নিষ্ঠাবতী ডাক্তার বলেই মনে হয়েছে বরাবর। ওর পারিবারিক সম্পর্কগুলিও যে এত মধুর, দেখে পাণ্ডুর খুব ভালো লাগল। আচ্ছা, ওদের দাম্পত্য জীবন শুরু হলে কুন্তী কি ওর এই রকমই যত্ন নেবে? নিশ্চয়ই নেবে। একটু আগে বিয়ের অনুমতি দিলেন নীলমাধববাবু। কিন্তু, বিয়ের উদ্যোগটা নেবে কে? ওর তরফে আত্মীয়স্বজন বলে তো কেউ নেই। তা হলে? পরক্ষণেই সিস্টার ফুলমণির কথা মনে পড়ল পাণ্ডুর। শিসপাহাড়িতে ফিরে খবরটা দিলে আনন্দে হয়তো ফেটেই পড়বেন সিস্টার ফুলমণি। দীর্ঘদিন উনি পাণ্ডুর পিছনে লেগে রয়েছেন। নানাভাবে বলতে চেয়েছেন, কুন্তীকে বিয়ে করে এ বার সংসার পাতুক। মা বেঁচে থাকলে, আর কুন্তীর সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা জানতে পারলে... হয়তো একই কথা বলত। ভেবে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে পাণ্ডু বুঝতে পারল, ট্রেন পাহাড়ের সরু রাস্তা দিয়ে উপরের দিকে উঠছে। একটা গুহার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা কি তা হলে এখন শিসপাহাড়িতে? রেঞ্জ বেয়ে ট্রেনটা যাচ্ছেই বা কোথায়? হতভম্ব হয়ে পাণ্ডু তারার আলোয় দেখল, অনেক নীচে ইউক্যালিপটাস গাছগুলোকে বনসাইয়ের মতো দেখাচ্ছে। হাসপাতাল থেকে দেখার সময় গাছগুলিকে যেমনটা দেখাত। হাসপাতালের কথা মনে পড়তেই দুঃশ্চিন্তা শুরু হল পাণ্ডুর। রাতের ডিউটিতে কোনও ডাক্তার নেই। হাউস স্টাফ ডাঃ দশরথের ভরসায় পেসেন্টদের ছেড়ে আসাটা বোধ হয় ওদের ঠিক হয়নি। হঠাৎ যদি এমার্জেন্সিতে কোনও ক্রিটিকাল কেস আসে, তা হলে দশরথ খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। এমনিতে বিষাক্ত মদ খেয়ে ভর্তি হওয়া কিছু পেশেন্ট এখনও মুমূর্ষু অবস্থায় ভর্তি রয়েছে। কাল রাতেও হাসপাতাল থেকে বেরনোর আগে পাণ্ডু ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে এসেছে বুধিরাম বলে একটা জোয়ান ছেলের। ওর বউটা তখন কাঁদতে কাঁদতে পায়ে এসে পড়েছিল। 'মোর মরদটাকে বাঁচাইন দে ডাগদারবাবু। কার সনে মো বাঁচবক। মোর যে ছেলেপুলাও হয় লাই।'

মাথা চাপড়ে বুধিরামের বউ কাঁদছিল। সেই কান্না এখনও কানে বাজছে। সিস্টার ফুলমণি ওকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল তখন। ডাক্তার হিসেবে ঠিক এই সময়টায় খুব অসহায় বোধ হয় পাণ্ডুর। দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসছিল। এমন সময় পাশ থেকে ফিসফিস করে কুন্তী জিজ্ঞেস করল, 'চুপচাপ বসে কী ভাবছ গো?'

পাণ্ডু বলল, 'হাসপাতালের কথা। কাল সকালের মধ্যেই কিন্তু আমাদের ফিরে যেতে হবে।'

'ফিরবে কী করে? ট্রেনটা কোথায় যাচ্ছে, সেটাই তো আমরা জানি না।'

'আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। ট্রেনে উঠে এইভাবে ফেঁসে যাব, ভাবতে পারিনি। সুপার সাহেবকে বলে আসা উচিত ছিল আমার।'

'ট্রেন কোথায় থামবে, কাউকে জিজ্ঞেস করা যায় না?'

'কাকেই বা জিজ্ঞেস করবে? কেউ তো জেগে নেই। ট্রেনটা যে ছুটছে, টের পাচ্ছ তুমি? কোনও শব্দ পর্যন্ত হচ্ছে না। আমার কেমন যেন একটা অদ্ভুত ফিলিংস হচ্ছে কুন্তী। আমার বোধ হয় ট্র্যাপড হয়ে গিয়েছি। মনে হচ্ছে, শিসপাহাড়িতে আর কোনওদিন ফিরতে পারব না।'

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুন্তী। তার পর ভারী গলায় বলল, 'আমারই দোষ। তোমাকে এর মধ্যে না জড়ালেই ভালো হত।'

কুন্তীকে কাছে টেনে নিয়ে পাণ্ডু বলল, 'প্লিজ, এ কথা বোলো না। এখানে না এলে তোমার বাবার সম্মতিটা কি পেতাম?'

'তা ঠিক। হ্যাঁ গো, কেমন মনে হল আমার বাপ্পাকে?'

'মনে হল, খুবই সজ্জন ব্যক্তি।'

'জানো, বাবা সারা জীবন সরকারি হাসপাতালে চাকরি করেছেন। কখনও কোনও অন্যায় কাজ করেননি। বিনা পয়সায় কত লোকের যে চিকিৎসা করেছেন, তুমি ভাবতে পারবে না। অথচ সেই বাবাকেই বদনাম নিয়ে বেরতে হয়েছিল। উনি নাকি হাসপাতালের ওষুধ পাচার চক্রকে মদত দিতেন। রিটায়ার করার পর গুমরে গুমরে থাকতেন। আজই দেখলাম, কেমন যেন একটা আনন্দের ঘোরে রয়েছেন। দেখে খুব ভালো লাগল।'

'তোমার বাবার ইচ্ছেটা কবে পূরণ করা যায়, বলো তো?'

'কোন ইচ্ছে?' জিজ্ঞেস করেই, প্রশ্নটা বুঝতে পেরে কুন্তী আদুরে গলায় বলল, 'সে তোমার ইচ্ছে।'

'ফিরে গিয়ে সিস্টার ফুলমণির উপরই তা হলে দিন ঠিক করার দায়িত্বটা ছেড়ে দেব, কী বলো?'

ওর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে কুন্তী বলল, 'জানি না যাও।'

উলটোদিকে, তলার বার্থে নীলমাধববাবু পাশ ফিরে ঘুমিয়ে আছেন। সেদিকে একবার তাকিয়ে পরম নিশ্চিন্তে কুন্তীকে জড়িয়ে ধরল পাণ্ডু। আনমনা হয়ে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ট্রেন খুব ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তারার আলোয় বহুদূর পর্যন্ত সব পরিষ্কার দৃশ্যমান। হঠাৎই হাসপাতালের পাশে গির্জার চুড়োটা চোখে পড়ল পাণ্ডুর। দেখামাত্রই কুন্তীকে বাঁকুনি দিয়ে ও বলল, 'ওই দেখো, আমাদের গির্জাটা দেখা যাচ্ছে।'

সোজা হয়ে বসে কুন্তী জানলা দিয়ে তাকিয়ে বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে। ইশ, এখানে নেমে পড়লে শুঁড়িপথ ধরে হাসপাতালে চলে যাওয়া যেত। ওই দেখো, আমাদের পিকনিক স্পট। নামার জন্য একবার ট্রাই করবে নাকি?'

পাণ্ডু বলল, 'চলো, চেষ্টা করে দেখি।'

দু'জনে মিলে সিট ছেড়ে নেমে দ্রুত পায়ে দরজার কাছে গেল। কিন্তু কোথায় দরজা? ডান দিকে গভীর খাদ, বাঁ দিকে পাহাড় আর জঙ্গল। পাণ্ডু বাঁ দিকে অনেক

খোঁজাখুজি করে কোথাও দরজা খুঁজে পেল না। ট্রেনের সবগুলো দরজাই ডান দিকে। যা খুলে নেমে যাওয়ার চেষ্টা মানে... আত্মহত্যার সমান। হতাশ হয়ে পাণ্ডু বলল, 'আমার সন্দেহটাই সত্যি হল কুন্তী। আমরা ট্র্যাপড হয়ে গেছি।'

ওদের গলা শুনে লোয়ার বার্থের এক প্যাসেঞ্জার উঠে বসেছে। শরীরের আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলতে তুলতে সে বলল,' নেমে যাওয়ার চেষ্টা করিস না পাণ্ডু। তোদের দু'জনকে নিশ্চয়ই দরকার আছে, তাই ট্রেনে তুলে নেওয়া হয়েছে। আর কিছুক্ষণ পর চেক পোস্ট আসার কথা। তখন না হয় নামিস।'

চমকে উঠে লোকটার দিকে তাকাল পাণ্ডু। মুখের দিকে তাকিয়েই ও চিনতে পারল। লোকটা আর কেউ নয়, সুরপতি মাইতি! ওর ছোটোবেলার বন্ধু!

১২

সুরপতি বলল, 'তোর কাছে পাঠাব বলে ল্যাপটপে একটা মেল লিখে রেখেছিলাম রে পাণ্ডু। কিন্তু, পাঠাতে গিয়ে দেখি, তোর মেল অ্যাড্রেসটা আমার কাছে নেই। হারিয়ে ফেলেছি।'

উলটোদিকের লোয়ার বার্থে বসে রয়েছে কুন্তী। ওর বাঁ পাশে পাণ্ডু। ট্রেন থেকে আর নামতে পারবে না, একটু আগে সুরোর মুখে এই কথা শোনার পর ওরা দু'জন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তখন প্রায় জোর করেই ওদের বসিয়েছে সুরো। বলেছে, 'অত ঘাবড়ে গেলি কেন ভাই। আমিও তো তোদের সঙ্গে যাচ্ছি। দেখবি চল, যেখানে যাচ্ছি, সে এক আশ্চর্য জায়গা।'

ওর গলা শুনে উপরের বার্থ থেকে ওদেরই বয়সি একজন নেমে এসেছিল। সে নিজের পরিচয় দিয়েছে, রকিবুল হাসান রুমি বলে। খুব আড্ডাবাজ টাইপের। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে নিজেই বলে দিয়েছে, বর্ধমানের ছেলে। সদ্য আমেরিকা থেকে এসেছে। নিউ জার্সির কোন এক ইউনিভার্সিটিতে নাকি কেমেস্ট্রি পড়াত।

সুরোবাবুর কথা শুনে একটু স্বস্তিবোধ করছে কুন্তী। যাক, ট্রেনে তবুও একজনকে পাওয়া গিয়েছে, যে পাণ্ডুর চেনা। ভদ্রলোকের পেটানো শরীর। কথাবার্তাতেও আত্মবিশ্বাসের ছাপ। অসম্ভব ইন্টেলিজেন্ট, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা, লোয়ার বার্থে ওরা বসার পরই সুরোবাবু বলেছিলেন, 'ভয় পেয়ো না কুন্তী। বিয়ের আগেই আপাতত হনিমুনটা সেরে নাও।' শুনে কুন্তী চমকে উঠেছিল। ভদ্রলোক ওর নাম জানলেন কী করে? পরক্ষণেই ওর মনে হয়েছিল, বাপ্পার সঙ্গে ও যখন কথা বলছিল, তখন হয়তো নামটা শুনেছেন। পরে পাণ্ডুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখে, ওদের সম্পর্কটাও হয়তো বুঝে নিয়েছেন। তার মানে, সুরোবাবু অনেকক্ষণ ধরেই ওদের দিকে নজর রাখছিলেন। ভদ্রলোক কে, পাণ্ডুর সঙ্গে সম্পর্কই বা কী, তা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পায়নি কুন্তী। ও চুপ করে দু'জনের কথা শুনতে লাগল।

সুরোবাবু মেলের কথা তুলতেই পাণ্ডু বলল, 'হ্যাঁ, তোর ল্যাপটপে মেল-টা আমি

পড়েছি। কিন্তু, কিছুই বুঝতে পারিনি। মেলে তুই একটা আত্মাবাহী ট্রেনের কথা উল্লেখ করেছিলি। এটাই কি সেই ট্রেন?'

'ইয়েস। ঠিক ধরেছিস। মেল-টা পড়েছিস, তার মানে তুই এও নিশ্চয়ই জেনেছিস, আমি কী নিয়ে রিসার্চ করছিলাম। হলটা কী জানিস, গত ছ'মাস ধরে শিসপাহাড়ি রেঞ্জে অনেক চেষ্টা করেও পাতালে যাওয়ার গুহামুখটা আমি খুঁজে পেলাম না। তখন এক মিডিয়ামের মাধ্যমে জানতে পারলাম, মনুষ্যদেহে সেখানে যাওয়া খুব কঠিন। তার থেকে অনেক সহজ হল আত্মাবাহী এই ট্রেনে করে যাওয়া। প্রাণ থাকতে সেটা সম্ভব নয়। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, প্রাণত্যাগ করাটাই ভালো। তবে, তার আগে কোনও একজনকে আমার রিসার্চের ব্যাপারটা জানিয়ে যাব। তখন তোর কথা প্রথমে আমার মনে এল। তাই তোর জন্য লিখতে বসেছিলাম।'

পাণ্ডু জিজ্ঞেস করল, 'তোর হেড ইনজুরিটা হল কী করে?'

'আর বলিস না। আত্মহত্যার কথা যখন ভাবছিলাম, সেই সময় একটা সুযোগ এসে গেল। শিসপাহাড়িতে এক ধরনের হড়কা বান হয় এই সময়। ক্লাউড বাস্ট করার জন্য। বুঝতে পারিনি, তাঁবুতে শুয়ে থাকার সময় কাল বিকেলে হঠাৎ সেই বান। ল্যাপটপের ব্যাগটা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু, জলের এমন তোড় যে, ভেসে গেলাম। ওখানেই কোথাও পাথরের আঘাতে হেড ইনজুরি হয়েছিল। সেন্স ছিল না। যখন সেন্স এল, তখন দেখি, শুক্তিমতী নদীর চরায় পড়ে রয়েছি। তখন কোনওরকমে তোর হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছলাম। তার পরের কথা তুই তো জানিস। নিজের হাতে তুই আমার ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিস। এই যে আমি... তোর ছোটোবেলাকার বন্ধু সুরো... তোর সামনে বসে রয়েছি, সেই আমি এখন সুরো নই। সুরোর দেহ আমি ছেড়ে দিয়েছি। সত্যি বলতে কী, এই ট্রেনে এখন যারা ট্রাভেল করছে, সবাই তাদের দেহ ছেড়ে এসেছে। সবাই এখন মুক্ত।'

সুরোবাবুর কথাগুলো দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে কুন্তীর। অবাক হয়ে ও একবার পাণ্ডুর দিকে তাকাল। এতক্ষণে ও বুঝতে পারল, পাণ্ডুর সঙ্গে সুরোবাবুর সম্পর্কটা কী। এর পর যে প্রশ্নটা মনে এল, সেটা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল,'এই ট্রেনটা যাচ্ছে কোথায় সুরোবাবু?'

'গুড কোয়েশ্চেন। এই ট্রেনটা যাচ্ছে... পাতালের দিকে, তবে পাতালে নয়। পাতাল সম্পর্কে তোমার কি কোনও ধারণা আছে কুন্তী?'

'আছে, ভাসা ভাসা। মায়ের কাছে শুনেছি, পাতালে নাকি নাগলোক। নাগলোকের রাজা বাসুকির সাতটা ফণা। একটা ফণার উপর তিনি পৃথিবীটা ধারণ করে আছেন। সেই ফণা ক্লান্ত হয়ে গেলে তিনি পৃথিবীটাকে অন্য ফণায় ধারণ করেন। আর তখনই পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়।'

'বাঃ, তো তুমি এত খানিকটা জানো। কিন্তু, বাসুকি কে, আর কেন তিনি পাতালে গিয়েছিলেন, তা কি শুনেছ? আমার কাছ থেকে তা হলে শোনো। সে এক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। বাসুকির মা ছিলেন দক্ষকন্যা কদ্রু। বাবা মহর্ষি কশ্যপ। এই সেই বাসুকি, সমুদ্র

মন্থনের সময় দেবতারা যাঁকে মন্থনের দড়ি হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। একবার কদ্রুর ইচ্ছে হল সতীন বিনতাকে দাসী করে রাখবেন। তাই সর্পপুত্রদের তিনি কপট উপায় নিতে বললেন। কিন্তু, তাতে রাজি হলেন না জ্যেষ্ঠপুত্র বাসুকি। কদ্রু তাঁকে শাপ দিলে বাসুকি নানা তীর্থে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। বাসুকির কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা খুশি হয়ে জানতে চাইলেন, তাঁর মনোবাসনা কি? বাসুকি তখন বললেন, 'ভাইদের কপটতা দেখে তিনি এমন বিরক্ত যে, পরলোকেও তাদের সংস্পর্শে থাকতে চান না। তপস্যা করে তিনি জীবন বিসর্জন দেবেন। ব্রহ্মা তখন তাঁকে পরামর্শ দিলেন, তা হলে পাতালে চলে যাও। সেখানে গিয়ে এই পৃথিবীকে ধারণ করো। তাতে মানুষের উপকার হবে। ব্রহ্মার কথা শুনে বাসুকি পাতালে গেলে সেখানকার নাগেরা তাঁকে রাজা বলে মেনে নেয়।'

দুঃশ্চিন্তায় পুরাণের এসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না। কুন্তী জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু, এই ট্রেন আপনাদের পাতালে নিয়ে যাচ্ছে কেন সুরোবাবু?'

'এটাই যে নিয়ম। মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার দেহ ছেড়ে আত্মা বেরিয়ে যায়। আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। এক দেহ ছেড়ে সে অন্য দেহ ধারণ করে। ফের নতুন দেহ গ্রহণ করার নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। সেটা নির্ভর করে তার কর্মফলের উপর। এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে যাওয়ার আগে, অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণ করার আগে সে থাকে কোথায়? এটা বিরাট প্রশ্ন। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝে একটা জগৎ আছে। সেই জগতে থাকেন দেবদূত বা পরীরা। মানুষের কল্যাণের জন্য ঈশ্বর নাকি মাঝে মাঝে তাঁদের মর্ত্যে পাঠান। তখন থেকেই আমার মনে হত, তা হলে মর্ত্য আর পাতালের মাঝেও নিশ্চয় একটা জগৎ আছে। আত্মারা প্রথমে সেখানেই যায়।' কথাগুলো বলেই সুরোবাবু থেমে ফের বললেন, 'কুন্তী, তুমি কি বুঝতে পারছ, আমি কী বলছি? নাকি পাণ্ডুর মতো তোমারও মনে হচ্ছে আমার কথার মধ্যে অসঙ্গতি আছে।'

কুন্তী বলল, 'না, না, আমি তা মনে করব কেন? আপনি বলুন।'

সুরোবাবু দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে শুরু করলেন, 'পাতাল সম্পর্কে আমারও আগে কোনও ধারণা ছিল না, জানো। কিন্তু, পরে বিষ্ণুপুরাণে পড়েছি, সে এক আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। পাতালের সাতটা স্তর। নামও আলাদা আলাদা। অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, সুতল ও সপ্তম পাতাল। কোনওটার মাটির রং সাদা, কোনওটার কালো, পীত, লাল, আবার কোনওটার শর্করা শৈল আর কাঞ্চনময়। জানো, একবার নারদ মুনি পাতাল ভ্রমণ করে, স্বর্গে ফিরে গিয়ে দেবতাদের বলেছিলেন, স্বর্গের থেকেও সপ্তপাতাল অনেক বেশি সুন্দর। হবেই বা না কেন? পাতাল তৈরি করেছেন ময়দানব। তিনিই আর্কিটেক্ট ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, পাতাল স্বর্গের থেকে অনেক বেশি সুন্দর হোক।'

'পাতালে বাস করেন কারা?'

'দানব, দৈত্য, যক্ষ, মহানাগরা। পাতালে সব প্যালেসিয়াল বিল্ডিংসে বাস করেন

তাঁরা। সুন্দর সব বাগিচা আর জলাশয় রয়েছে। সেখানে প্রমোদ বিহার করেন দানব, দৈত্য আর যক্ষদের বধূ ও কন্যারা। তাঁরা সুন্দর অলংকার পরে থাকেন। গায়ে সুগন্ধি মাখেন। সব সময় সেজেগুজে থাকেন, যাতে খুব অ্যাট্রাক্টিভ লাগে। পাতালে যত্রতত্র সুপ্রভাশালী মণি পাওয়া যায়। সেই মণি ধারণ করেন নাগেরা। এককথায় পাতাল হল বিলাস থাকার জায়গা। সেখানে সূর্যরশ্মি আছে, কিন্তু তাপ নেই। সেখানে চাঁদের কিরণ আছে, কিন্তু তা শীতের কারণ হয় না। সেটা একটা এমন আনন্দের জায়গা যে, দিন-রাত্তির কোথা দিয়ে কেটে যায় কেউ টেরও পায় না। সেখানে পুরুষ কোকিলের মধুর আলাপে মন ভরে যায়। একটু পরে তুমি নিজেও দেখতে পাবে। আমরা এখন সেই পাতালের দিকেই যাচ্ছি।'

'কিন্তু কেন যাচ্ছি, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'শুদ্ধিকরণের জন্য। একটু আগে ইঙ্গিতটা আমি দিয়েছি। হয়তো তুমি খেয়াল করোনি। এই ট্রেনটা গিয়ে থামবে একটা চেকপোস্টে। সেই জায়গাটা হল পাতালে ঢোকার এন্ট্রি পয়েন্ট। সেখানে তোমার পাপ-পুণ্যের হিসেব নিকেশ করা হবে। যদি দেখা যায়, তোমার পাপের ভাগ বেশি, তা হলে তোমাকে নরকে নিক্ষেপ করা হবে। আর পুণ্যের ভাগ বেশি হলে তুমি মর্ত্য আর পাতালের মাঝামাঝি এক আশ্চর্য জায়গায় যাবে। সেখান থেকে পাতালে যাওয়ার সুযোগ তোমাকে দেওয়া হবে, যাতে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া পাপের ভাগ তুমি কমাতে পারো। কমতে কমতে যেদিন তা শূন্যে এসে দাঁড়াবে, সেদিন তুমি ফের জন্মগ্রহণ করার জন্য ইহলোকে ফিরে আসবে।'

'নরক জায়গাটা কোথায় সুরোবাবু?'

'পৃথিবী আর জলের তলায়। সে এক বীভৎস জায়গা। বিষ্ণুপুরাণে পড়েছি, শাস্তি দেওয়ার জন্য পাপিষ্ঠদের নরকে ছুড়ে ফেলা হয়। কত ধরনের নরক আছে, তাও বিশদভাবে বলা আছে বিষ্ণুপুরাণে। রৌরব, শূকর, বিশসন, তাল, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, শ্বসন, রুধিরাব্ধ, বৈতরণী, ক্রিমীশ, অসিপত্রবন, লালাভক্ষ, বহ্নিঃজ্বাল, অধঃশিরা...। একেক ধরনের পাপকর্মের জন্য একেক ধরনের নরকে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। যেমন ধরো, যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, মিথ্যে কথা বলে, সম্পূর্ণ পক্ষপাত করে, তাকে রৌরব নরকে যেতে হয়। সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণহত্যাকারীদের পচতে হয় শূকর নরকে। যারা ধর্ষণ করে, তারা যায় মহাজ্বাল নরকে। তবে, চিরদিন তাকে সেখানে থাকতে হয় না। শাস্তির ফলে তার পাপ কমতে থাকে। একদিন সে পুনর্জন্মও নিতে পারে।'

মায়ের মুখে নরকের কথা শুনেছে কুন্তী। কিন্তু, এত বিশদভাবে শোনেনি। শুনে ও শিউরে উঠল। মানুষ জন্মানোর পরই কেন তাকে এই শাস্তির কথা বলে দেওয়া হয় না? তা হলে তো সে অপরাধ করার কথা ভাবেই না। সুরোবাবুর কাছ থেকে নরক সম্পর্কে আরও কিছু জানার জন্য ও জিজ্ঞেস করল, 'মানুষ নরকে যায় কীভাবে?'

সুরোবাবু বললেন, 'মানুষ যখন মারা যায়, তার ঠিক আগে যমলোক থেকে দূতেরা এসে হাজির হন। প্রাণবায়ু শরীরের ঠিক কোনখান দিয়ে বেরিয়ে আসবে, তার জন্য তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রাণ সাধারণত শরীরের পাঁচটি জায়গা দিয়ে বেরয়।

নাক, মুখ, কান, পায়ু আর লিঙ্গ। প্রাণ বা আত্মা বেরিয়ে এলেই যমদূতরা তাকে ধরে ফেলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যমলোকে নিয়ে যান না। পিণ্ডদানের জন্য তেরো দিন অপেক্ষা করেন। এই যে কিমিন্দমকে দেখছ, সে হচ্ছে যমলোকের দূত। কিমিন্দম আমাদের চেকপোস্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই... ফের ট্রেন নিয়ে ফিরে যাবে মর্ত্যে।'

রকিবুল হাসান রুমি এতক্ষণ চুপ করে সুরোবাবুর কথা শুনছিল। নরকের কথা শুনে সে বলল, 'আরে মিঞা, ইসলাম ধর্মেও তো প্রায় একই ধরনের কথা আছে। বেহেশত বা দোজখ, জান্নাত আর জাহান্নাম। মুসলমানদের মধ্যে কেউ যখন মারা যায়, তখন কবরে শুয়ে থাকার সময় তার সামনে বেহেশত বা দোজখ তুলে ধরা হয়। বলা হয়, এটাই তাদের শেষ ঠিকানা। সে যদি বেহেশতী হয়, তা হলে সকাল সন্ধ্যা তাকে বেহেশত দেখানো হয়। আর দোজখী হলে দোজখ। রোজ এইভাবে চলতেই থাকবে, কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে কবর থেকে তুলবেন।'

কুন্তী জিজ্ঞেস করল, 'দোজখটা কী?'

সিটের উপর পা তুলে, গুছিয়ে বসে রুমি বলল, 'সে এক ভয়ানক জায়গা। দোজখে একখণ্ড পাথর ফেলে দিলে, তা একেবারে তলায় পৌঁছতে সত্তর বৎসর লেগে যাবে। দোজখের দেওয়াল এমন পুরু, এক পাশ থেকে হাঁটতে শুরু করলে অন্য পাশে যেতে চল্লিশ বছর সময় লাগবে। সেখানে সর্বদাই অন্ধকার বিরাজ করে। হাজার হাজার বৎসর ধরে আগুন জ্বলার ফলে দোজখ পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। আব্বার মুখে শুনেছি, জীবিতকালে যে মানুষ সত্যের প্রতি বিমুখ ছিল আর আল্লাহ পাকের আনুগত্য অস্বীকার করেছিল, দোজখ নিজেই তাকে ডেকে নেবে। সেই সময় ক্রোধ প্রকাশ করবে, তর্জন-গর্জন করবে। দোজখে দীর্ঘ গর্দান বিশিষ্ট উটের সমান সাপ আর বিছে রয়েছে। তাদের দংশন এমন বিষাক্ত যে, দোজখীকে চল্লিশ বছর ধরে তার যন্ত্রণা অনুভব করতে হবে। চিরদিন সে সেখানেই বন্দি হয়ে থাকবে। তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হবে, যেমন কর্ম, তেমন ফল। আরও শুনুন, দোজখে তাকে খেতে হবে জখমের পুঁজ অথবা জাক্কুমি গাছ। এই গাছ হল পাপীদের খাবার। গলে যাওয়া তামার মতো তরল। পেটে গেলে যা টগবগ করে ফুটতে থাকবে।'

দৃশ্যটা কল্পনা করে কুন্তীর পেটের ভিতরটা গুলিয়ে উঠল। এ সব কী ভয়ংকর কথা শুনছে। পাশ ফিরে ও দেখল, পাণ্ডু জানলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। উদ্বেগে ওর মুখটা অসম্ভব ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। উদ্বেগ হওয়ারই তো কথা। ক'টা বাজে, তা বোঝার উপায় নেই। ট্রেনে কতক্ষণ আগে ওরা উঠেছে, তাও আন্দাজ করতে পারল না কুন্তী। তখনই ওর মোবাইল ফোনটার কথা মনে হল। ফোন হাতের সামনে থাকলে সময়টা দেখে নেওয়া যেত। কিন্তু, সেটটা রয়েছে হ্যান্ড ব্যাগে, আর ব্যাগ ফেলে এসেছে ওদের বার্থের উপর। ব্যাগের খোঁজে একা উঠে যেতে কুন্তীর ভয় ভয় করতে লাগল। যাত্রীরা কেউ মানুষ নয়। সবাই বিদেহি আত্মা। ছোটোবেলায় মায়ের কাছে কুন্তী আত্মাদের সম্পর্কে যা শুনেছে, তাতে ওর ভয় হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক।

ট্রেন বোধ হয় একটা টানেলের মধ্যে ঢুকেছে। দু'পাশেই ঘন অন্ধকার। কিন্তু, ট্রেনের

ভিতরে হালকা নীল আলো, কেমন যেন রহস্যময় পরিবেশ। পাণ্ডুর কাঁধে হেলান দিয়ে কুন্তী চোখ বুঁজল। পাণ্ডু ঠিকই বলেছে, ওরা দু'জন ফাঁদে আটকা পড়েছে। পরিত্রাণ পাওয়ার আদৌও সম্ভাবনা আছে কি না, কুন্তী বুঝতে পারল না। সুরোবাবু আর রুমি বলে ছেলেটা এখনও কথা বলে যাচ্ছে। রুমি জান্নাতের কথা শোনাচ্ছে। জান্নাতের একটা ইট নাকি সোনার। আর একটা ইট হচ্ছে রুপোর। মশলা হচ্ছে সুগন্ধময় মেশক। জান্নাতের পাথর মতি আর ইয়াকুতের। মাটি জাফরানের। যে জান্নাতে যাবে, সে চিরকাল নেয়ামত ভোগ করবে। অনন্তকাল সে জীবিত থাকবে। তার যৌবন শেষ হবে না। কুন্তীর মনে এল সুরোবাবু বলছেন, 'আত্মায় তা হলে আপনারা বিশ্বাস করেন না।'

রুমি জোর দিয়ে বলল, 'না। একেবারেই না। জিন বা ভূতে যেমন বিশ্বাস করি না, তেমনই আত্মাতে। আপনাদের পুনর্জন্মেও আমার বিশ্বাস নেই। সত্যি কথা বলতে কী, আমি কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করি না। এ সব আমার বুজরুকি বলে মনে হয়। এই যে... মারা যাওয়ার পর কাউকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, কাউকে আবার পাঠানো হয় কবরে। ধর্ম অনুযায়ী, এই ভিন্ন প্রথাও আমি মানি না। প্রথা অনুযায়ী, আমার এখন মাটির তলায় শুয়ে থাকার কথা। কিন্তু, আমার স্ত্রী ক্যাথরিনকে বলে দিয়েছিলাম, কোনও কারণে যদি তোমার আগে আমার মৃত্যু হয়, তা হলে আগে আমাকে অর্ধেক পুড়িয়ে, তার পর দাফন কোরো। দেখিই না, তার পর আমার কী হয়! ইচ্ছেটা যে এত অল্প বয়সে পূরণ হয়ে যাবে, তা ভাবতেও পারিনি।'

'কী হয়েছিল আপনার?'

'আরে, ইকো ট্যুরিজমের টানে নিউ ইয়র্ক থেকে আমি আর ক্যাথরিন...দিন কয়েক আগে শিসপাহাড়ির আদিবাসী বস্তিতে বেড়াতে এসেছিলাম। পরশু রাতে আদিবাসীদের কী এক পরব ছিল। সেখানে কান্ট্রি লিকার টেস্ট করতে গিয়ে আমার মৃত্যু হল। আমি যা চেয়েছিলাম, ক্যাথি সেটাই কাল বিকেলে করেছে। আমাকে অর্ধেক পুড়িয়ে, তার পর আমার অর্ধদগ্ধ দেহটা কবর দিয়েছে। রাতে জ্ঞান ফিরতেই দেখি, একটা কিম্ভূতদর্শন লোক আমাকে এই ট্রেনে তুলে দিচ্ছে।' কথাগুলি বলে একটু থেমে রুমি ফের বলল, 'কী আশ্চর্য, বলতে না বলতেই লোকটা উদয় হল! কী কুৎসিত চেহারা, দেখলে ভয় করে।'

চোখ খুলে কুন্তী দেখল, কিমিন্দম বলে লোকটা করিডোর দিয়ে আসছে। আসার সময় দু'পাশে মুখ ঘুরিয়ে কী যেন বলছে। ভয়ে ও চোখ বন্ধ করে ফেলল। আজ সকালে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল কে জানে? এমন সব ঘটনা ঘটছে, দুঃস্বপ্নের মতো। অথচ আজকের দিনটা ওর জন্য সব থেকে সুন্দর দিন হতে পারত। আজই ওকে প্রোপোজ করেছে পাণ্ডু। এতদিন মনের ভিতর জমিয়ে রাখা একটা কথা ও নিজেও বলে ফেলেছে পাণ্ডুকে। শিসপাহাড়িতে থাকলে পাণ্ডুকে নিজের কোয়ার্টারে ডেকে এনে সন্ধেটা খুব সুন্দর কাটাতে পারত কুন্তী। নিজের হাতে রান্না করে প্রিয় মানুষটাকে খাওয়াত। তার পর হাসপাতালের বাইরে বনবীথিতে হাঁটতে বেরিয়ে আলোচনাটা সেরে নিতে পারত, কীভাবে সংসার শুরু করবে। কিন্তু, তার বদলে একটা অনিশ্চিত

ভবিষ্যতের দিকে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। কিমিন্দম দেখে, দম বন্ধ করে বসে থাকার সময় পাণ্ডুকে জোরে আঁকড়ে ধরল কুন্তী।

তখনই শুনতে পেল ঘড়ঘড়ে গলায় কিমিন্দম বলছে,'একটু পরেই আমরা চেকপোস্টে পৌঁছব। কারও যদি কনফেশন করার থাকে, সে তা হলে আমাকে জানাতে পারে।'

১৩

ছুটির দিন বাড়ির কাজগুলো সারা হপ্তার জন্য সেরে রাখেন ফুলমণি। পোষা কয়েকটা মুরগি আর ছাগল আছে। ওদের দেখভাল করেন। মুরগির খাঁচা পরিষ্কার করান, ছাগলের খোঁয়াড়ও। ওই একটা দিন পোষ্যদের উঠোনে ছেড়ে দেন তিনি। আগে জঙ্গল থেকে বনবিড়াল এসে উৎপাত করত। মুরগি আর ছাগলের লোভে চোর হানা দিত। কিন্তু, এখন আর কেউ আসে না। গাউলি গাছে তাঁর মরদ জঙ্গল হেমব্রমের পেরেতেকে আটকে রাখার পর থেকে এই একটা সুবিধে হয়েছে ফুলমণির। একবার একটা বনবিড়ালের মাথা মুচড়ে দিয়েছিল জঙ্গলের পেরেত। সকালে তার চেহারা দেখে আঁতকে উঠেছিল আশপাশের লোক। আর একবার, জঙ্গলের পেরেত একটা চোরকে এমন ভয় দেখিয়েছিল, উঠোনে সে সকাল অবধি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। মুরগি আর ছাগলের সংখ্যা তার পর থেকে দিন কে দিন বেড়েছে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান হলে এখন বাজার থেকে কিনে আনতে হয় না ফুলমণিকে।

উঠোনে গমের দানা ছড়িয়ে দিয়েছেন। মুরগিগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। গায়ে একটা শাল জড়িয়ে রোদ পোহাতে পোহাতে ফুলমণি চোখ রেখেছেন সেদিকে। কিন্তু, তাঁর মন পড়ে আছে হাসপাতালে। বেলা দশটা বেজে গিয়েছে, এখনও ডাঃ পাণ্ডু আর কুন্তী দিদিমণির কোনও পাত্তা নেই। আজ ডাঃ পাণ্ডুর ডিউটি আছে ইমাজেন্সিতে। আর কুন্তী দিদিমণির... আউটডোরে। একটু পরে সুপার সাহেব চলে আসবেন অফিসে। তখন নিশ্চয়ই তাঁর কানে যাবে, দু'জন ডাক্তার ডিউটিতে নেই। তাঁকে কিছু না জানিয়ে, গরহাজির। পরিস্থিতিটা এমন হলে, উনি খুব অসন্তুষ্ট হবেন। কাল রাতে ডাঃ পাণ্ডু বলে গেলেন, জংশন থেকে ভোরবেলাতেই ওঁরা ফিরে আসবেন। সকালে দু'জনের বাড়িতে অন্তত বার দশেক ফোন করেছেন ফুলমণি। অথচ কেউ ফোন তুলছেন না। রুমালি একবার দু'জনের কোয়ার্টারেই ঢুঁ মেরে এসেছে। দরজায় তালা দেওয়া। রাস্তায় কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হল নাকি ওঁদের? কুন্তী দিদিমণির বাবারও খারাপ কিছু হতে পারে। একটু আগে রুমালি বলল, হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় তিনি নাকি ভুবনেশ্বরের হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। আরে, তাই যদি হয়, তা হলে কুন্তী দিদিমণিরা জংশনে দেখা করতে গেলেন কার সঙ্গে?

কথাটা মনে হওয়ার পরই মনটা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠল ফুলমণির। নিশ্চি[illegible] নয়তো? এক ধরনের পেরেত আছে, যারা গভীর রাতে ডেকে নিয়ে যায়। পরিচিত

কোনও লোকের গলার স্বর নকল করে। কুন্তী দিদিমণি কি এই রকমই কোনও পেরেতের কবলে পড়েছেন? দু'জনেই ডাক্তার, অথচ কারও মাথায় এল না, হার্ট অ্যাটাকের একজন রোগী কিভাবে ভুবনেশ্বর থেকে আসবেন শিসপাহাড়ির জংশনে? নানা সম্ভাবনার কথা মাথায় ঘুরতে লাগল ফুলমণির। সব খারাপ খারাপ সম্ভাবনা। এমনও হতে পারে, লাশপুর দিয়ে জংশনে যাওয়ার সময় ওঁরা পেরেতের মুখোমুখি হয়েছেন!

পেরেতেরা ওঁদের মেরে ফেলেছে। লাশ ওখানেই কোথাও পড়ে রয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সটারই বা কি হল? ওটা ফিরে না এলে তো আরও সর্বনাশ। হাসপাতালে মাত্র দুটো অ্যাম্বুলেন্স। সুপার সাহেবের অনুমতি না নিয়েই ডাঃ পাণ্ডুরা একটা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে জংশনে গিয়েছিলেন। কোনও কারণে অ্যাম্বুলেন্স দুটো একসঙ্গে আজ দরকার হয়ে পড়লে, কী হবে? সুপার সাহেব তখন কৈফিয়ত চাইবেন, ব্যক্তিগত দরকারে ওঁরা অ্যাম্বুলেন্সটা ব্যবহার করেছেন কেন?

'মাসি, কুন্তীদিদির কী হল বলো তো?'

পাশ ফিরে ফুলমণি দেখলেন, রুমালি এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতে কফির কাপ। চোখ মুখে অসম্ভব উদ্বেগ। হওয়ারই কথা। ও কুন্তী দিদিমণির ভরসাতেই শিসপাহাড়িতে রয়েছে। ওর হাতে থেকে কাপটা নিয়ে ফুলমণি বললেন, 'বসে বসে মো সি কথাই ভাবছি রে বিটি। উরা গেল কুথাকে?'

রুমালি বলল, 'সকালবেলায় হাসপাতাল থেকে একবার ঘুরে এলাম। শুনলাম, অ্যাম্বুলেন্সটা ফিরে এসেছে। শোনার পর থেকে মাসি আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। তা হলে কুন্তী দিদিরা ফিরল না কেন?'

'শম্ভু ডেরাইভার ফিরেইনছে?'

'কেউ বলতে পারল না মাসি। অ্যাম্বুলেন্সটা নাকি ডেরাইভার ছাড়াই রাত তিনটের সময় ফিরে এসেছে। চাবি দিতে অফিসে কেউ যায়নি। চাবি নাকি গাড়িতেই ঝোলানো ছিল।'

'কী কথা কইছিস? উদের ফেলে রেইখে অ্যাম্বুলেন্স ...।' কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না ফুলমণি। বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। কোনও সন্দেহ নেই, মারাত্মক খারাপ কিছু ঘটেছে। আর দেরি করা উচিত না। এক্ষুনি সুপার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলা দরকার। তেমন হলে পুলিশেও একটা রিপোর্ট করতে হবে। একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে, রাতে হয়তো ওঁরা মন বদলেছেন, এবং ভোরবেলায় ট্রেনে করে ভুবনেশ্বরে যেতেও পারেন। কিন্তু, ডাঃ পাণ্ডু আর কুন্তী দিদিমণি এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন নন যে, কোথাও আটকে যাওয়ার খবরটা হাসপাতালে জানাবেন না।' দু'জনের কাছেই মোবাইল ফোন আছে। ফোন যখন করেননি, তখন বুঝতে হবে, ফোন ব্যবহার করার মতো পরিস্থিতিতে ওঁরা নেই। দু'জন বেঁচে আছেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ হতে লাগল ফুলমণির। সব থেকে ভয় পাওয়ার মতো ঘটনা, ড্রাইভার ছাড়াই অ্যাম্বুলেন্সের ফিরে আসাটা! কিন্তু, রুমালির সামনে তিনি দুর্ভাবনা প্রকাশ করতে চাইলেন না। তাই বললেন, 'তু চিন্তা করিস না বিটি। মো শম্ভুর ঘরকে লোগ পাঠাইনছি।'

রুমালি বলল, 'একবার বাজারের দিকে যাব মাসি? জোসেফকে গিয়ে একবার বলি। ও যদি কোনও কাজে লাগে। তা ছাড়া, ঘরে আনাজপাতিও কিছু নেই। রান্না করব কী দিয়ে?'

কথাটা মন্দ বলেনি রুমালি। জোসেফকে একবার আদিবাসী বস্তিতে পাঠানো যেতে পারে। ও সাইকেলে করে গেলে, ওখান থেকে আধঘণ্টার মধ্যেই ঘুরে আসতে পারবে। শম্ভুটা হয়তো রাতে দেশি মদ খেয়ে কোথাও উলটে পড়ে আছে। গাড়ির চাবিটা তাই অফিসে ফেরত দিতে ভুলে গিয়েছে। রাতে কী হয়েছে, ও ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। রুমালি যাক, জোসেফকে নিয়ে আসুক। মনে মনে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফুলমণি বললেন, 'যা, তু বাজারে যা। জুসেফকে একবার মোর কানছে লিয়ে আয়। আর শুন, চাঁপামণিকে বল ব্রেকফাস্ট রেডি কইরতে।'

'সে তো বাড়িতে নেই। সেই সক্কালেই বেরিয়ে গিয়েছে। তোমায় বলে যায়নি?'

রাতে রুমালিকে চাঁপার ঘরে শুতে দিয়েছিলেন ফুলমণি। যাতে চাঁপা পেরেতের ভয় না পায়। সে নেই শুনে একটু অবাক হয়েই ফুলমণি বললেন, 'কুথাকে গেনছে, তুকে বুলে গিয়েনছে?'

'না মাসি। অদ্ভুত মেয়ে। ও কিন্তু কাল রাতে একদম ঘুমোয়নি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল। অনেক রাতে একবার আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তখন দেখি, জানলায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে চাঁপা ফিসফিস করে কথা বলছে। আমাকে জেগে উঠতে দেখে ছেলেটা হঠাৎ উবে গেল। ছেলেটা কে, জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু, চাঁপা বললই না।'

'তু ঠিক দেখেইনছিস বিটি?'

'স্পষ্ট দেখলাম। আচ্ছা মাসি, চাঁপা বলছিল, তোমার বাড়িতে নাকি পেরেত আছে। আমাকে ও ভয় দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, আমাদের কোয়ার্টারেও পেরেত আছে। সে কোনও ক্ষতি করে না।'

'উর কথায় কান দিস না বিটি। উয়ার মাথার ঠিক লাই।' বাড়িতে পেরেত পোষার কথা ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন ফুলমণি। চাঁপা মেয়েটাকে নিয়ে মনে হয়, ভবিষ্যতে সমস্যায় পড়তে হবে। রাস্তা থেকে তুলে ওকে বাড়িতে না নিয়ে এলেই তিনি ভালো করতেন। অত রাতে কার সঙ্গে কথা বলছিল মেয়েটা? মরদ জুটিয়েছে নাকি? ভোরবেলায় উঠে গেলই বা কোথায়? বান্দোয়ানে ওর পিসির কাছে যাওয়ার জন্য জিদ ধরেছিল কাল। সারাদিন ধরে একই কথা। না জানিয়ে মেয়েটা কি সেখানেই চলে গেল? কিন্তু, কী করেই বা যাবে? বাসের ভাড়া পাবে কোথায়? নিশ্চয় আশপাশে কোথাও গিয়েছে। একে মাথায় দুই ডাক্তারকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তার জট পাকিয়ে রয়েছে। তার উপর চাঁপার ভাবনা ভাবতে চাইলেন না ফুলমণি। রুমালিকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি তৈরি হতে লাগলেন সুপার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলে।

শাড়ি বদলে বাড়ি বেরনোর সময়ই বাধা। ফুলমণি স্পষ্ট শুনলেন, কোথাও ঢেঁকি ভানার শব্দ হচ্ছে। খারাপ, খুব খারাপ। কোনও শুভ কাজে বেরনোর সময় ঢেঁকির শব্দ

মানেই অমঙ্গলের বার্তা। ফুলমণি নিশ্চিত হয়ে গেলেন, নিকট ভবিষ্যতে খুব খারাপ খবর শুনবেন। বারান্দায় রাখা বেতের মোড়ায় ধপ করে তিনি বসে পড়লেন। হাসপাতালে গিয়ে আর দরকার নেই। তার থেকে বরং ফোনে সুধাদির সঙ্গে কথা বলে নেওয়া যাক। তা হলেই টের পেয়ে যাবেন, হাসপাতালে কী হচ্ছে!

মোবাইল থেকে ফোনটা করতেই ও প্রান্ত থেকে সুধাদি বললেন, 'তোমাকে আমি এক্ষুনি ফোন করতে যাচ্ছিলাম ফুলমণি। একটা ভালো খবর আছে। নয় নম্বর বেডের পেশেন্ট সুস্থ হয়ে গিয়েছে। কাল তোমাকে কয়েকটা কটু কথা বলে ফেলেছি। সরি ফুলমণি, কিছু মনে কোরো না।'

শুনে মনে স্বস্তি পেলেন ফুলমণি। কাল রাতে বাড়ি ফেরার আগে তিনি একবার ফিমেল ওয়ার্ডে গিয়েছিলেন। তখন লাল কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া ছিল নয় নম্বর বেড। পেশেন্টের অবস্থা খারাপ হলে বা মারা গেলে লাল কাপড় দিয়ে বেড ঘিরে দেওয়া হয়। দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল ফুলমণির। ডিউটিতে ছিল রুমা বলে একজন নার্স। সে ঘাড় নেড়ে ইশারা করেছিল, না মরেনি। মেয়েটার বাড়ির লোকজন নাকি রাতে গাঁয়ে ফিরে যায়নি। হাসপাতালেই রয়ে গিয়েছে। যাক, চন্দ্রমুখীর বিপদ তা হলে কেটে গিয়েছে। ফুলমণি জিজ্ঞেস করলেন, 'উয়াকে কবে রিলিজ কইরবেন সুধাদি?'

'আজকের দিনটা রেখে দিতে বললেন সুপার সাহেব। কাল সকালে রিলিজ করে দেব।'

ইশ, আজ একবার গাঁ থেকে সোনামণিকে ডেকে আনলে ভালো হত। মেয়েটাকে নিজের চোখে দেখে যেতে পারত তা হলে। কিন্তু, মেয়ে দেখানোর মেজাজ এখন ফুলমণির নেই। জোসেফের কপালে থাকলে, পরে পাররা গ্রামে গিয়েই সবাই মিলে চন্দ্রমুখীকে দেখে আসা যাবে। তার আগে নন্দার কী হল, সেটা জানা দরকার। নার্সদের ডর্মিটারিতে কাল ওকে শুইয়ে দিয়ে এসেছিলেন ফুলমণি। তার পর আর খোঁজ নিতে পারেননি। মেয়েটা পিঠে চোট পেয়েছিল। সোজা হয়ে শুতে পারছিল না। কথাটা মনে পড়ায় ফুলমণি জিজ্ঞেস করলেন, 'নন্দা কেমুন আনছে সুধাদি?'

'ওর খবরটা জানানোর জন্যই তোমাকে ফোন করতে বললেন সুপার সাহেব। নন্দাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। একটু পরে ডাঃ পাণ্ডু এলে ওর পিঠে এক্স রে করতে হবে। মেয়েটা ভয়ানক মেন্টাল ট্রমার মধ্যে রয়েছে। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। আর জ্ঞান হলেই তোমাকে খুঁজছে। কী করা যায় বলো তো?'

'উর ভয় লাই সুধাদি। মো একটো মাদুলি পাঠঠিয়ে দিনছি। উর বালিশের তলায় রেইখে দিতি হবেক।'

'আমি একজন ওয়ার্ড বয়কে তোমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যা করার, তাড়াতাড়ি করো।'

'ডাঃ পাণ্ডু আখুনও ইমাজেন্সিতে যান লাই?'

'আরে, ওঁর কী হল বলো তো? ডাঃ পাণ্ডু আর ডাঃ কুন্তী... দু'জনই আজ

অ্যাবসেন্ট। কোথায় গেলেন, তুমি জানো কিছু? নানা রকম বাজে কথা রটছে ওদের নামে।'

'কী রটেইনছে উদের নামে?'

'ওরা নাকি কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ চলে গিয়েছেন। শিসপাহাড়ি হাসপাতালে আর কাজ করবেন না।'

'কে রটাইনছে ই সব কথা?'

সুধাদি ঠাট্টা করলেন, 'না বাবা, তোমাকে বলব না। তুমি তা হলে ভূত প্রেত লাগিয়ে দেবে তাঁর পিছনে।'

'ঠাট্টা লয় সুধাদি। উরা মুনে হয়, বিপদে পড়েইনছেন।' রাতে যা হয়েছে, সুধাদিকে সব খুলে বললেন ফুলমণি।

শুনে সুধাদি বললেন, 'এতক্ষণে তুমি এ সব কথা বলছ ফুলমণি? সুপার সাহেবকে এক্ষুনি সব জানাচ্ছি। ইমিডিয়েটলি পুলিশকে ইনফর্ম করা দরকার।' দ্রুত কথাগুলো বলে উনি লাইন ছেড়ে দিলেন।

বেতের মোড়া থেকে উঠে ফুলমণি ঘরে এসে ঢুকলেন। কাল অনেক রাত পর্যন্ত তিনি জেগে ছিলেন। নন্দার আতঙ্কিত মুখটা তিনি ভুলতে পারছিলেন না। বুঝতে পারছিলেন না, কে এই সাহেব পেরেত? তাঁকে বাঁচানোর জন্য এমনভাবে চড়াও হলেন নন্দার উপর? অনেকক্ষণ ভেবেও ফুলমণি কোনও উত্তর খুঁজে পেলেন না। ছোটোবেলায় হাসপাতাল আর গির্জায় অনেক সাহেব দেখেছেন তিনি। তাঁদের মধ্যে সব থেকে বেশি স্নেহ পেয়েছেন হাসপাতালের ডাক্তার উইলিয়াম লংম্যানের কাছ থেকে। এই ডাক্তারের বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজ করতেন তাঁর মা ঠাকুরমণি। মনে আছে, ছোটোবেলায় কোনওদিন মায়ের সঙ্গে লংম্যান সাহেবের বাড়িতে গেলে, উনি ডাকতেন, 'ইধার আও বেটি। তুমকো লিয়ে ম্যায় এক টয় লেকে আয়া।' প্রায় নানা রকম খেলনা আর পোশাক উপহার দিতেন লংম্যান সাহেব। উনি মাথায় হাত না রাখলে ফুলমণি আজ নার্সই হতে পারতেন না। ছোটোবেলায় আর একজন সাহেবও ওঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি ফাদার ক্যানিংহ্যাম। কিন্তু, এঁদের মধ্যে কেউ পেরেত হতে পারেন না।

কাল বিকেলে ওই ঘটনার পর রাতে মুখে কিছু রোচেনি। এখন খিদে পাচ্ছে। চট করে কিছু বানিয়ে নেওয়ার তাগিদে ফ্রিজ খুলে ফুলমণি দেখলেন, বড়ো একটা বাটিতে খিচুড়ি রাখা আছে। তার মানে কাল রাতে রুমালি করে রেখেছে। গরম করে নিলেই চলবে। গ্যাস ওভেন জ্বালিয়ে বাটিটা বসিয়ে দেওয়ার ফাঁকে হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, 'ফুলি, ইদিকে আয় বউ। মোর একটো কথা শুন।'

কথাটা আসছে জানলার দিক থেকে। তাকিয়ে ফুলমণি দেখতে পেলেন, জঙ্গল হেমব্রমের পেরেত শিক ধরে দাঁড়িয়ে। বাড়িতে কেউ নেই দেখে গাছ থেকে সুড়সুড় করে নেমে এসেছে। মাতালটাকে দেখেই মুখ কঠিন করে ফেললেন তিনি। নিশ্চয়ই কোনও আবদার নিয়ে এসেছে। কাল রাতে কি ওকে কম হাড়িয়া দিয়েছিলেন? নাহ, শুতে যাওয়ার

আগে এক হাড়ি হাড়িয়া তিনি রেখে এসেছিলেন গাউলি গাছের তলায়। উত্তর না দিয়ে ফুলমণি গ্যাস ওভেনের দিকে মন দিলেন। খিচুড়ির সুন্দর গন্ধ বেরচ্ছে। বারতিনেক মিনতি করার পর... এদিক থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে জানলা থেকে উধাও জঙ্গলের পেরেত। ফুলমণি নিশ্চিন্ত হলেন, যাক, আপদ বিদেয় হল তা হলে!

প্লেটে করে খানিকটা খিচুড়ি নিয়ে কিচেন থেকে বেরনোর মুখে ফুলমণি দেখলেন, জঙ্গলের পেরেত বেডরুমের খাটে বসে পা দোলাচ্ছে। কী আস্পর্ধা! দেখেই সারা শরীর জ্বলে উঠল ফুলমণির। মাতলামির জন্য বিয়ের মাসখানেক পরই মরদকে বেডরুম থেকে বের করে দিয়েছিলেন তিনি। রাতে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে শুতেন। এ নিয়ে প্রচুর ঝগড়া আর মারামারি হয়ে গিয়েছে দু'জনের মধ্যে। শেষের দিকে মরদটাকে বাড়িতেও ঢুকতে দিতেন না। তাই কড়া চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তুকে কত্তবার কয়েছি, মোর বেডরুমে ঢুইকবি লা?'

সঙ্গে সঙ্গে দরজার আড়ালে চলে গেল জঙ্গলের পেরেত। দরজাটাকে ঢাল করে মিনমিন করে বলল, 'হাড়িয়া খেইয়ে খেইয়ে মোর অরুচি হইয়ে গেইনছে। তু দিশি মদ আনি দে বউ। কত্তদিন খাই লা রে।'

ফুলমণি রেগে বললেন, 'শখ কত্ত! উয়ার জন্যি মো দিশি মদ কিইনতে যাবক। মো তুকে ঝানটা পিটা করবক।'

'গুসসা করছিস ক্যানে বউ?' বলেই জঙ্গলের পেরেত ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল, সারাদিন ধরে ও কত কাজ করে দেয় ফুলমণির। বাড়ি পাহারা দেয়। আপাদ-বিপদ থেকে রক্ষা করে। তার বদলে ফুলমণি ওর সামান্য ইচ্ছেটা পূরণ করবে না? জোসেফ তো একটু পরেই এ বাড়িতে আসবে। ফুলমণির কষ্ট করার দরকার নেই। জোসেফকে ফোন করে দিলেই তো বাজার থেকে ও দিশি মদ কিনে আনতে পারবে।

ওহ, গাছের মগডালে বসে মরদের পেরেত তা হলে সব কথাই শুনেছে! ফুলমণি সাবধান হয়ে গেলেন। না, উঠোনে বসে আর কোনও আলোচনা তিনি করবেন না। তাড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'তু যা, অ্যাখুন বিরক্ত করিস না। মোর মন ভালো লাই।'

জঙ্গলের পেরেত হঠাৎ বলে বসল, 'তুর ডাক্তারের কী হইয়েনছে মো জানি।'

শুনে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ফুলমণি। আরে, এই কথাটা তো আগে মাথায় আসেনি! জঙ্গল এখন পেরেত হয়ে গেছে। ওর পক্ষে অনেক কিছুই জানা সম্ভব। কিন্তু, বেশি আগ্রহ দেখালে লাই পেয়ে যাবে। মদের বোতল আদায় করে ছাড়বে। তাই নিরাসক্ত গলায় ফুলমণি বললেন, 'ডাক্তারের কী হইয়েনছে?'

'মো কইব না। আগে পিতিজ্ঞে কর, মোকে দিশি মদ আনি দিবি।'

জঙ্গলের পেরেত ধূর্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে। পাক্কা শয়তান! বিয়ের পর থেকে মরা পর্যন্ত... হাড়মাস জ্বালিয়েছে। এখনও রেহাই নেই। কিন্তু, ডাঃ পাণ্ডু আর কুন্তী দিদিমণির খবরটা পাওয়া দরকার। ওঁদের কথা ভেবেই এক পা পিছিয়ে ফুলমণি বললেন, 'দুববো। তু আগে বল, উরা কুথায়?'

'উরা এ জগতে লাই রে বউ। টেরেনে উঠঠে গেইনছে।'

এ জগতে নেই... তার মানেটা কী! মারা গিয়েছেন নাকি! শুনে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন ফুলমণি। জঙ্গলের পেরেত হেঁয়ালি করছে বলে মনে হল। একটু অধৈর্য হয়েই তিনি বললেন, 'সাফ সাফ বল তু। উরা কি বেইনচে লাই?'

'কইলাম, বুঁইতে পারলি লা? উরা মরে লাই, বেইনচেও লাই। উরা দু'জন উ পারে চইলে গেনছে। মারাংবুক উদের দু'তিনদিন পর ফিরায়ে আনবেক।'

শুনে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন ফুলমণি। হাড়িয়া খেয়ে খেয়ে মরদটার বোধবুদ্ধি হারিয়ে গিয়েছে। যা ইচ্ছে, তাই বলে যাচ্ছে। ওকে বিশ্বাস করা কঠিন। কড়া গলায় তিনি বললেন, 'উয়ারা আগে ফিরে আসুক, ত্যাখুন তুকে দিশি মদ দিবক। তু অ্যাখুন যা জঙ্গল। মোকে রেস্ট নিতে দে।'

১৪

ট্রেন থেকে বাইরে বেরিয়ে পাণ্ডু টের পেল, বাতাস সুগন্ধে ভরে আছে। পুরুলিয়ায় ওদের বাড়ির কাছে ধূপ তৈরির কারখানা ছিল। তার পাশ দিয়ে যাতায়াত করার সময় বেল আর জুঁই ফুলের মতো মিষ্টি গন্ধ ওর নাকে আসত। সুন্দর গন্ধের একটা প্রভাব আছে। মনটাকে তরতাজা করে দেয়। কামরার ভিতর যে উদ্বেগ এতক্ষণ পাণ্ডুকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, চেকপোস্টের প্ল্যাটফর্মে পা দেওয়ার পরই সেই অস্বস্তিটা ওর কেটে গেল। মনের প্রফুল্লতা ফিরে এল। দাঁড়িয়ে পড়ে পাণ্ডু বেশ কয়েকবার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে, তার পর পাশ ফিরে কুন্তীকে বলল, 'জায়গাটা কী সুন্দর, তাই না?'

প্ল্যাটফর্মে নেমেও কুন্তী ওর হাত ছাড়েনি। হাসিমুখে ও বলল, 'সত্যিই সুন্দর। বাব্বা, তোমার বন্ধু এতক্ষণ কামরায় বসে যা ভয় দেখাচ্ছিলেন...।'

পাণ্ডু বলল,'সুরোর কথা বলছ। ও একটা পাগল। ওর কথা মাথায় রেখো না। চলো, কিমিন্দম আমাদের লাইনে দাঁড়াতে বলছে। আমরা লাইনে গিয়ে দাঁড়াই।'

কুন্তী বলল,'তুমি এগোও। আমি বাবাকে নিয়ে আসছি।'

লাইনের একেবারের শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল পাণ্ডু। চার পাশে নজর বুলিয়ে ও বুঝতে পারল, বিশাল একটা গুহামুখে এসে ট্রেনটা থেমে গিয়েছে। গুহার ভিতরে অসংখ্য টুনি বাল্ব জ্বলছে। পুজো বা অন্য কোনও উৎসবের সময় যে ধরনের রঙিন আলো দিয়ে প্যান্ডেল সাজানো হয়, অনেকটা সেই রকম। ফলে গুহার ভিতরটা ঝলমল করছে। দেওয়ালের দিকে একটু ভালো করে তাকাতেই অবশ্য পাণ্ডুর ভুল ভেঙে গেল। টুনি বাল্ব নয়, ঝিকমিক করছে হিরে-পান্না জহরত। একটু আগে সুরো গল্প করছিল পাতালের অসীম বৈভব নিয়ে। কথাগুলো তখন বিশ্বাস করেনি পাণ্ডু। নিজের চোখে অমূল্য সম্পদ দেখে ওর চোখ কাপালে উঠে গেল। পাগলা সুরো বেঠিক কিছু বলেনি। হিরে-জহরত তো মাটির তলাতেই পাওয়া যায়!

কিমিন্দম বলেছিল, যাঁরা কনফেশন করতে চান, তাঁরা ডানদিকে সাদা আলোর

গেটের দিকে যাবেন। আর যাঁরা চান না, তাঁরা বাঁদিকে হলুদ আলোর গেটে। প্রথমে পাণ্ডুরা কেউ বুঝতেই পারেনি, কনফেশন বলতে কিমিন্দম কী বোঝাচ্ছে। কনফেশন করার প্রথা তো আছে ক্রিশ্চানদের মধ্যে। কোনও পাপ কাজ করলে গির্জায় গিয়ে তারা ফাদারকে জানায়। তার পর কনফেশন বক্সে গিয়ে পাপের কথা স্বীকার করে। হিন্দুদের মধ্যে তো এই প্রথা নেই। কিন্তু, কেউ প্রশ্নটা করার আগে মুখ দেখেই ব্যাপারটা কিমিন্দম বুঝে গিয়েছিল। তখন নিজেই ও বলে, যদি কেউ নিজে থেকে পাপ স্বীকার করে এবং অনুতপ্ত হয়, তা হলে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেন। পাপের শাস্তি কমিয়ে দেন। এই চেকপোস্ট হচ্ছে মুক্তি সোপান। এখানেই বিচার হবে পাপ-পুণ্যের। এর পর কিমিন্দম বক্তৃতার ঢঙে আরও বলেছিল, ডাক পাওয়ার আগে ওরা যেন পাপকর্মের কথা স্মরণ করে নেয়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ পাপের কথাও। স্বীকার করার সময় যেন কোনও ঘটনা বাদ না পড়ে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। সব কিছু তিনি মিলিয়ে নেবেন। কেউ যদি তাঁর কাছে গোপন করার চেষ্টা করে, তা হলে এখান থেকেই তাকে রৌরব নরকে ছুড়ে ফেলা হবে।

মুশকিল হল, পাপকর্মের কথা পাণ্ডু কিছুতেই মনে করতে পারছে না। জ্ঞানত ও কোনও পাপ করেছে কি না, পাণ্ডু জানে না। ছোটোবেলায় করলেও করে থাকতে পারে। তা ছাড়া, কোনটা পাপ, কোনটা নয়, এটাও ওর কাছে সমস্যার বলে মনে হতে লাগল। সুরোর সঙ্গে একবার আলোচনা করে নিলে ভালো হত। ছোটোবেলা থেকে ওরা একসঙ্গে বড়ো হয়েছে। সুরোর স্মৃতিশক্তি অনেক বেশি। ওর মনে থাকলেও থাকতে পারে। লাইনের সামনের দিকে তাকিয়ে পাণ্ডু সুরোকে খুঁজতে লাগল। ও নিশ্চয়ই সাদা আলোর গেটের লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালো করে খুঁজতেই পাণ্ডুর নজরে পড়ল, একেবারে সামনের দিকে দাঁড়িয়ে সুরো হেসে হেসে কথা বলছে রুমির সঙ্গে। পাণ্ডু ঠিক করতে পারল না, ওর কাছে গিয়ে স্মৃতিচারণে সাহায্য নেবে কি না? ট্রেনে দেখা হওয়ার পর থেকে সুরোর হাবভাব পাণ্ডুর ভালো লাগছে না। কেন জানে না, ওর মনে হচ্ছে, ওদের ফাঁদে ফেলার পিছনে সুরোর হাত আছে। এবং সুরো খুব ভালোমতোই জানে, ওকে আর কুন্তীকে কেন মুক্তি এক্সপ্রেসে তুলে দেওয়া হয়েছে।

'এই দেখো দেখো, উপরের দিকে তাকিয়ে দেখো তো... ওঁরা কারা?'

নীলমাধববাবুকে সঙ্গে নিয়ে কুন্তী ওর পিছন পিছন লাইনে এসে দাঁড়িয়েছে। কুন্তীর কথায় চটকা ভাঙল পাণ্ডুর। গুহার উপরের দিকে তাকাল ও। আরে, এতক্ষণ লক্ষই করেনি। গুহার ভিতরটা একদম অডিটোরিয়ামের মতো। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত গোলাকার চারটি ধাপ। চারদিকে সোনার সিংহাসনে বসে আছেন অতিবৃদ্ধ কিছু মুনিঋষি। পরনে শ্বেতশুভ্র রেশমের পোশাক। শরীরে নানা রত্নখচিত অলংকার। আলোর ছটায় প্রথমে ওঁদের দেখতে পায়নি পাণ্ডু। কুন্তীর কথায় ওঁদের দেখে সারা শরীরে ও শিহরন অনুভব করল। ওঁরা কারা? খিলানে বসে ওঁরা কাদের উপর নজর রাখছেন? প্রত্যেকের পাশে একটা করে বিরাট এলসিডি টিভির মতো বড়ো পর্দা। তাতে কী সব ছবি ফুটে উঠছে। তলা থেকে আলাদা আলাদা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে সৌম্যকান্তি

ওই মুনি ঋষিদের দিকে। সর্বোচ্চ ধাপে যেতে অন্তত হাজার সিঁড়ি ভাঙতে হবে। সিঁড়ির দিকে চোখ যেতেই পাণ্ডু অবাক হয়ে গেল। এস্কেলেটরের মতো সিঁড়িগুলি উপর দিকে উঠে যাচ্ছে! সেখান থেকে নানা রঙের আভা বেরচ্ছে।

কুন্তীর দিকে তাকিয়ে পাণ্ডু পালটা প্রশ্ন করল, 'ওই মানুষগুলি কারা হতে পারেন, বলো তো?'

'আমার মনে হচ্ছে, ওঁরা দেবতাগোছের কেউ হবেন। কনফেশন করার জন্য হয়তো ওঁদেরই কারও কাছে আমাদের পাঠানো হবে।'

'হতে পারে। কিন্তু, কনফেশন করার কী আছে, সেটাই তো আমার মনে পড়ছে না। তোমার কি মনে পড়ছে, কবে তুমি কোন পাপ কাজ করেছ?'

'মনে পড়ছে। পাপ তো করেইছি। সব তোমাকে বলা যাবে না। জানো, শিসপাহাড়ির হাসপাতালে জয়েন করার আগে আমি কয়েক মাস কটকের এক নার্সিং হোমে কাজ করেছিলাম। সেখানে নানা ধরনের ম্যালপ্র্যাকটিস হত। নিজের অজান্তেই তাতে আমি জড়িয়ে গিয়েছিলাম। পরে যখন বুঝতে পারলাম, তখন বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল, চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া।'

পাণ্ডু কখনও নার্সিং হোমে চাকরি করেনি। ওর কোনও অভিজ্ঞতাই নেই নার্সিং হোম সম্পর্কে। ও জিজ্ঞেস করল, 'ম্যালপ্র্যাকটিস মানে? কী ধরনের ম্যালপ্র্যাকটিস হত ওখানে?'

'তুমি ভাবতেও পারবে না। ভুলভাল ডায়গনেসিস করতে হত। পেটে সামান্য ব্যথা নিয়ে কেউ ভর্তি হলেই বলতে হত, অপারেশন করাতে হবে। নানারকম ভয় দেখিয়ে পেশেন্টকে বেশিদিন আটকে রাখা হত নার্সিং হোমে। নানা রকম টেস্ট করার অছিলায় বিল বাড়িয়ে দেওয়া হত। অনেকেই বিলের টাকা মেটাতে পারত না। একবার তো নার্সিং হোমের ছাদ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে এক বয়স্ক পেশেন্ট সুইসাইড করেছিলেন। তাঁর ফ্যামিলির লোকজন বিলের টাকা দিতে পারছিলেন না বলে। উফ, ওঁর স্ত্রীর কান্না দেখে আমার বুক ফেটে গিয়েছিল। তখনই আমি ঠিক করে ফেলি, নাহ আর না। জেনেশুনে আর পাপ করব না। কয়েকদিন বাদে অবশ্য আমাকে রেজিগনেশন দিতে হয়েছিল।'

'এতে তোমার পাপ হল কোথায়?'

'নিশ্চয়ই পাপ। একটা মানুষ যখন অসুস্থ হয়, তখন সে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তাররা তার কাছে তখন ভগবানের মতো। রোগ নিয়ে তাকে মিথ্যে কথা, ভয় দেখানো কি একজন ডাক্তারের উচিত? তার পর ভাবো, অপারেশনের নামে অহেতুক পেশেন্টের অঙ্গহানি করা, সেটাও তো অপরাধ। এই কাজটা আমাকে দিনের পর দিন করতে হয়েছে। আমাকে ভয় দেখানোও হত। বলত, ওরা ব্যাবসা করতে নেমেছে। এমন ডাক্তার রাখবে, যাদের দিয়ে ব্যাবসা হবে। তাই ওদের কথামতো যদি না চলি তা হলে, চাকরি থেকে আমাকে বরখাস্ত করা হবে। সারাক্ষণ এইসব কথা শুনতে শুনতে ডাক্তারি পেশার উপরই আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।'

'আগে তো কখনও বলোনি এসব?'

'বলার ইচ্ছে থাকলেও, সুযোগ পেলাম কই? হাসপাতালে তুমি এত সিরিয়াস হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে ... যেন ডাক্তারি ছাড়া আর কোনও বিষয়ে তোমার আগ্রহ নেই। তবে সত্যি বলছি, নার্সিং হোমের সেই বিশ্রী অভিজ্ঞতার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, শিসপাহাড়িতে তোমাকে দেখে। ডাক্তারি পাশ করার পর আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল, এটা একটা মহান পেশা। মানুষের সেবার দিকেই আমাদের নজর দিতে হবে। কিন্তু, জীবনের প্রথম চাকরিটা করতে গিয়ে দেখলাম, বাস্তবে তা হয় না। সিস্টেমে পড়ে... ইচ্ছে না থাকলেও অনেক অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে হয়। উফ, শিসপাহাড়িতে চাকরিটা পেয়ে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। না পেলে হয়তো আমাকে আরও কত পাপের ভাগীদার হতে হত, কে জানে?'

'এই সব কথা কি তুমি এখানে স্বীকার করবে নাকি?'

'অবশ্যই করব। আরও অনেক কিছু বলব। তাতে যদি পাপের ভার কিছুটা কমে। জানো, আমাদের ভুবনেশ্বরের বাড়িতে পুজোআচ্চার সময় একজন কথক ঠাকুর আসতেন। উনি বলতেন, জীবনে চলার পথে অনেক ভুলভ্রান্তি হবে মা। অনেক কাঁটা মাড়িয়ে তোকে এগোতে হবে। সব প্রভু জগন্নাথের উপর ছেড়ে দিস। দিনান্তে একবার ওকে স্মরণ করিস। উনিই রাস্তা দেখাবেন। বলে দেবেন, কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক।'

'কুন্তী ঠিকই বলছে।' কানের কাছে পুরুষালি গলা শুনে পাণ্ডু পাশ ফিরে তাকাল। কে বলল কথাটা, সুরো? হ্যাঁ, ওর গলা বলেই তো মনে হল! আশ্চর্য, পাশ ফিরে পাণ্ডু কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। একটু অবাক হয়ে ও কুন্তীর দিকে ফের পাশ ফিরতেই দেখতে পেল সুরো দাঁড়িয়ে হাসছে। আশ্চর্য, সুরো উদয় হল কোত্থেকে? প্রশ্নটা ও করার আগেই সুরো বলল, 'একটু আগে আমাকে স্মরণ করছিলি কেন, বল।'

কাল রাতে ট্রেনে ওঠার পর থেকে যা ঘটে চলেছে, পাণ্ডুর আর অবাক হতে ইচ্ছে করছে না। তবুও ও জিজ্ঞেস করল, 'তুই জানলি কী করে?'

সুরো হেঁয়ালি করে বলল,'আমি তোর আশপাশেই ছিলাম। তুই দেখতে পাসনি। যাক গে, তুই যা জানতে চাইছিস, তাড়াতাড়ি বল। আমার এখুনি ডাক আসবে।'

'ওই উপরে সিংহাসনে যাঁরা বসে আছেন, ওঁদের কি তুই চিনিস?'

'সবাইকে চিনি না। কিন্তু, ওঁরা কারা জানি। ওঁরা হচ্ছেন, পুরাণকালের ত্রিকালজ্ঞ সব মুনি-ঋষি। তপস্যার বলে যাঁরা অমর হয়ে রয়েছেন। মুক্তি সোপানে ওঁরাই আমাদের ইন্টারভিউ নেবেন। আমাদের নাক বরাবর যে সিঁড়িটা উঠে গিয়েছে, তার শেষ প্রান্তে যিনি বসে রয়েছেন, তিনি কে জানিস? বশিষ্ঠমুনি। সপ্তর্ষিদের অন্যতম। সূর্যবংশের কুলগুরু ও কুলপুরোহিত। ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখ, ওর শরীর থেকে কেমন আলোর আভা ঠিকরে বেরচ্ছে। ওঁর পাশে পর পর যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা হলেন মরিচী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, ভৃগু ও নারদ। এই দশজন ঋষিই হলেন প্রজাপতি। এঁরাই ব্রহ্মার মানসপুত্র। আর এই মানসপুত্র হতেই মানবের সৃষ্টি।'

সুরোর কথা শুনে কুন্তী ঋষিদের উদ্দেশে গড় হয়ে প্রণাম করল। ওর ভক্তি দেখে পাণ্ডু মনে মনে হাসল। এই ঋষিরাই যদি মানুষের সৃষ্টিকর্তা হন, তা হলে ডারউইনের

তত্ত্বটা কী? কুন্তীর নিশ্চয়ই ক্রমবিবর্তনবাদ পড়া আছে। তা সত্ত্বেও, ও কী করে সুরোর কথা বিশ্বাস করে নিচ্ছে? এটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে কুন্তীর প্রশংসাও করল পাণ্ডু। ও ঠিকই আন্দাজ করেছিল। উপরের ওই মানুষগুলি দেবতাদের মতো কেউ হবেন। কুন্তীর মতো একজন ইন্টেলিজেন্ট মেয়েকে ও স্ত্রী হিসেবে পাবে, ভাবতেই গর্বে পাণ্ডুর বুকটা ভরে উঠল। পরক্ষণেই ওর মনে প্রশ্ন জাগল, সত্যিই কী ওকে পাবে? ওদের দু'জনকে ঘিরে যা চলছে, তাতে পাণ্ডুর ঘোরতর সন্দেহ হচ্ছে, স্বাভাবিক জীবনে ওরা আর ফিরে যেতে পারবে কি না।

প্রশ্নটা মনে উদয় হয়েই মিলিয়ে গেল। পাণ্ডু দেখল, সিঁড়ি দিয়ে কিছু লোক উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু, সবাই উঠতে পারছে না। কিছু লোক ছিটকে নীচে পড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় তারা কাতরাতে শুরু করেছে। দেহ থেকে তাদের কোনও না কোনও অঙ্গ আলাদা হয়ে গুহার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ছে। কেন এমন হচ্ছে, পাণ্ডুর মনে এই প্রশ্নটা জাগা মাত্র পাশ থেকে সুরো জবাব দিল, 'এই মানুষগুলি জীবনে কখনও পুণ্য করেনি, বুঝলি। এদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে রয়েছে। সারাটা জীবন বোধ হয় এরা দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করেছে। অন্যের অঙ্গহানি করেছে। সেই কারণেই দশ প্রজাপতির কাছে এরা যেতে পারছে না। দেখবি, যমদূতরা এখনই এসে হাজির হবে। এদের নিয়ে গিয়ে ছুড়ে ছুড়ে ফেলবে নরকে।' কথাগুলি দ্রুত শেষ করে সুরো লাইনের সামনের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখল। তার পর, 'যাই রে' বলে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

মুক্তি সোপানে মাঝে মধ্যেই শঙ্খধ্বনির মতো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা কোত্থেকে আসছে, তা বোঝার চেষ্টা করতে লাগল পাণ্ডু। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ও বুঝতে পারল, শঙ্খনিনাদ আসছে গুহার তলা থেকে। আওয়াজটা কীসের জন্য, সুরো হয়তো বলতে পারত। কিন্তু, ও তো তাড়াহুড়ো করে উবে গেল। পাণ্ডুর এ বার বিশ্বাস হতে লাগল, সুরো এখন আত্মা হয়ে বেঁচে আছে। কাছে না থেকেও ওর কথা সুরো শুনতে পাচ্ছে। থটরিডিং করে উত্তর দিচ্ছে। একমাত্র আত্মার পক্ষেই সেটা সম্ভব। সুরোর জন্য পাণ্ডু দুঃখবোধ করল। পরক্ষণেই ওর মনে হল, দুঃখ করার তো কিছু নেই। পৃথিবী ছেড়ে আসার জন্য সুরোর মধ্যে কোনও রকম আক্ষেপ লক্ষ করেনি পাণ্ডু। ও নিজেই প্রাণত্যাগ করতে চেয়েছিল, পাতালে আসবে বলে। তাই, দিব্যি আনন্দে রয়েছে।

•

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার জন্য কখন ওর ডাক আসবে, তার জন্য পাণ্ডু অপেক্ষা করতে লাগল। চোখের সামনে কিছু মানুষ আর্তনাদ করছে। দেখে ওর ভয় ভয় করতে লাগল। কুন্তী চাপাস্বরে কথা বলছে নীলমাধববাবুর সঙ্গে। মেয়ের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছেন নীলমাধববাবু। তাঁর মুখে 'মালিকা সাহিত্য' কথাটা বার দুয়েক শুনতে পেল পাণ্ডু। ওড়িয়া ভাষায় মালিকা সাহিত্যে নাকি বিশদ লেখা আছে পরলোক সম্পর্কে। সে সব নাকি খানিকটা পড়া আছে নীলমাধববাবুর। সে কথা তিনি উগড়ে দিচ্ছেন কুন্তীকে। এ সব গল্পকথায় গতকাল পর্যন্ত পাণ্ডু বিশ্বাস করত না। বিজ্ঞান ওকে শিখিয়েছে, মৃত্যুর সঙ্গেই মানুষের সবকিছু শেষ হয়ে যায়। আত্মা বলে কিছু নেই। পুনর্জন্ম বলে কিছু হয় না। ওসব মনগড়া কথা।

পরজন্ম নিয়ে ভাবার মাঝেই কিমিন্দম বলে লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল। উলটো দিকের একটা সিঁড়ি দেখিয়ে বলল, 'পাণ্ডু, তুমি এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাও। জরৎকারু মুনি তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। শোনো, যাওয়ার আগে একটা কথা বলে দিই। উনি কুপিত হন, এমন কোনও আচরণ তুমি করবে না। উনি যা জিজ্ঞেস করবেন, তুমি তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। আর উত্তর দেওয়ার সময় ওঁকে তুমি মহাত্মন বলে সম্বোধন করবে।'

'ওঁর পরিচয়টা কি জানতে পারি?'

'না। জানার দরকার নেই। আগ বাড়িয়ে কোনও কথা তুমি বলবে না। প্রশ্ন করা বা কিছু চাওয়ার জন্য তুমি ওঁর কাছে যাচ্ছ না। তুমি যাচ্ছ, স্রেফ প্রশ্নের উত্তর দিতে। কি, কথাটা মনে থাকবে?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে, সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল পাণ্ডু। ও শেষবারের মতো কুন্তীর দিকে তাকাল। কাল রাত থেকে ওরা একসঙ্গে রয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও আলাদা হয়নি। কুন্তীকে ছেড়ে একা উপরে যেতে ওর মন চাইল না। মাত্র কয়েক ঘণ্টার সাহচর্য, অথচ পাণ্ডুর মনে হচ্ছে, কুন্তীর সঙ্গে ওর যেন জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। না, কুন্তীকে ফেলে ও কোথাও যাবে না। সিঁড়ির কাছে গিয়ে পাণ্ডু দাঁড়িয়ে পড়ল। ওকে ইতস্তত করতে দেখে গম্ভীর হয়ে কিমিন্দম বলল, 'তোমাকে একাই যেতে হবে পাণ্ডু। নীলমাধব আর কুন্তীর পথ আলাদা। ওদের সঙ্গে কথা বলবেন পুলস্ত্য আর ক্রতু মুনি। তোমার আর কুন্তীর কপালে যদি মিলন লেখা থাকে, তা হলে অতলে ফের তোমাদের দেখা হতে পারে। যাও, আর দেরি কোরো না। দেরি হলে জরৎকারু মুনি কিন্তু রেগে যাবেন।'

বাধ্য হয়ে পাণ্ডু চলন্ত সিঁড়িতে উঠে পড়ল। পা দেওয়ার ঠিক আগে ও দেখল, নীলমাধববাবুর পাশে দাঁড়িয়ে ওর দিকে করুণ দৃষ্টিতে কুন্তী তাকিয়ে রয়েছে। ওর মন বলল, কুন্তীর সঙ্গে ফের ওর দেখা হবেই। খানিকটা উপরে ওঠার পরই হঠাৎ পাণ্ডুর ভয় করতে লাগল। ছিটকে নীচে যেন পড়ে না যায়। সিঁড়িটা যত উপরের দিকে উঠতে লাগল, ততই ওর মন খুশিতে ভরে যেতে থাকল। না, সিঁড়ি থেকে ও ছিটকে পড়ে যায়নি। সুরোর কথা অনুযায়ী, পাপের পরিমাণ তা হলে ওর কম। নীচে দাঁড়িয়ে থাকা লোজন ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে। একটা সময় কুন্তীও ওর চোখের আড়ালে চলে গেল।

মুখ ফিরিয়া পাণ্ডু এ বার উপরের দিকে তাকাল। সিংহাসনে বসে থাকা মহর্ষি জরৎকারু সস্নেহে দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। দেখামাত্রই পাণ্ডুর মন অনাবিল আনন্দে ভরে গেল।

কিমিন্দমের নির্দেশে ও ভুলে মেরে দিল! বেদির নীচে পৌঁছে, শরীর ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে ও বলে উঠল, 'আমাকে আশীর্বাদ করুন মহাত্মন।'

'ভ্রূণহত্যা মহাপাপ, তুমি কি তা জানো?'

মহর্ষি ক্রতুর প্রশ্নটা শুনে কুন্তী চমকে উঠল। ওর শরীরটা থরথর করে কাঁপতে থাকল। মনে হল, এখুনি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাবে। বেদির নীচে হাতজোড় করে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। মহর্ষি ক্রতু ওকে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, আর কুন্তী তার উত্তর দিচ্ছে। সুরেশবাবু একটু আগে বলেছিলেন, এই ঋষিরা হলেন ত্রিকালজ্ঞ। এঁদের কাছে কোনও কিছু গোপন করা সম্ভব না। এঁরা সব জানেন। ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় তাই এই অপ্রিয় প্রশ্নটা যে উঠবেই, কুন্তী তা জানত। ভ্রূণহত্যার কথা শুনে ওর চোখে জল এসে গেল। মেয়েরা কত অসহায়। যৌন লালসার শিকার হয়ে একবার ওকে ভ্রূণহত্যা করতে হয়েছিল। এ কথা আর জানতেন মাত্র একজন। তিনি ডাঃ চপলা শতপথী, কটকের নবজীবন নার্সিং হোমের এক ডাক্তার। শিসপাহাড়িতে গিয়ে কুন্তী ভুলতে শুরু করেছিল সেই সব কথা। মহর্ষি ক্রতু আজ মনে করিয়ে দিলেন।

সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কুন্তী বিবশ হয়ে গেল। কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে পড়া একটা মেয়ের পক্ষে যে কতটা লজ্জার, সেটা ওর মতো আর কে জানে? সত্যি কথাটা আজ ওকে বলতেই হবে। যদি তা পাপের ভার কিছু লাঘব হয়। উত্তর দিতে গিয়ে কুন্তীর কান্না পেয়ে গেল। কী করে বলবে ও সেই দুঃস্বপ্নের কথা? ওর নজরে পড়ল, মহর্ষি ক্রতুর সিংহাসনের পাশেই বিরাট এলসিডি-র মতো পর্দায় ওর ছোটোবেলাকার ছবি দেখা যাচ্ছে। আরে, ওই তো মা...চুলের মুঠি ধরে ওকে বকছে। জানতে চাইছে, স্কুল থেকে ফিরে ও কেন মাকে মিথ্যে কথা বলেছিল? পাঠ্যবই কোন এক গরিব বন্ধুকে দিয়ে এসে মাকে কেন বলেছিল, বই হারিয়ে ফেলেছে? ওই দিনগুলোর ছবি তোলা আছে নাকি! ওর জীবনে ঘটে যাওয়া সব ঘটনার ছবি? তা হলে তো ওকে আরও লজ্জার মুখ পড়তে হবে।

হতভম্ব হয়ে ও মহর্ষি ক্রতুর দিকে তাকাতেই উনি নরম গলায় বললেন, 'তোমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে, সব আমাদের কাছে রেকর্ড করা আছে। যাক সে কথা, তোমাকে যে প্রশ্নটা করলাম, তার উত্তর দাও। আমি জানি, তুমি পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলে। কিন্তু, তোমার অপরাধ, তুমি কুন্তীর মতো আচরণ করোনি।'

মহর্ষির গলার স্নেহের আঁচ। কান্নারোধ করে কুন্তী বলল, 'আপনি কোন কুন্তীর কথা বলছেন মহাত্মন?'

'পাণ্ডবদের মাতা ... মহীয়সী নারী কুন্তীর কথা বলছি। যাঁর নামে তোমার নাম। রাজা কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তী। কুমারী অবস্থায় তিনিও তো একবার গর্ভবতী হয়ে পড়েছিলেন। মহাভারতে তাঁর কথা পড়নি?'

'পড়েছি মহাত্মন। তাঁর সেই অবৈধ পুত্রের নাম কর্ণ। সূর্যের কবচকুণ্ডল নিয়ে যিনি জন্মেছিলেন।'

'ঠিক।' কিন্তু, তুমি কি জানো, কী পরিস্থিতিতে কুন্তী গর্ভবতী হয়েছিলেন?'

ভুবনেশ্বরের বাড়িতে কথক ঠাকুরের মুখে মহাভারতের কথা কুন্তী শুনেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের পাপ-পুণ্যের হিসাব দিতে গিয়ে ওর কোনও কিছুই মনে পড়ল না।

মাথা নীচু করে ও বলল, 'না, আমার মনে পড়ছে না মহাত্মন। গোড়া থেকে আমাকে সব বলুন।'

'শোনো তা হলে। কুন্তী যখন রাজকন্যা, বালিকা বয়সে সেই সময় তিনি একটা দায়িত্ব পান। রাজপুরীতে পুজো-আচ্চা হলে বা কোনও মুনি ঋষি এলে অতিথি সেবার দায়িত্বটা তিনি পালন করতেন। একবার দুর্বাসা মুনি এলেন রাজপুরীতে। কুন্তী মন প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। খুশি হয়ে দুর্বাসা মুনি তাঁকে একটা মন্ত্র দিয়ে বললেন, মন্ত্রবলে কুন্তী ইচ্ছে করলেই যে কোনও দেবতাকে আহ্বান করতে পারবেন। সেই দেবতার ঔরসেই কুন্তীর সন্তান হবে। তবে, এই মন্ত্র কুন্তী জীবনে মাত্র পাঁচবারই ব্যবহার করতে পারবেন। দুর্বাসা মুনি চলে যাওয়ার পর...কৌতূহল মেটাতে কুন্তী সেই মন্ত্রবলে সূর্যদেবতাকে ডাকেন। সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদেবতা এসে হাজির। তাঁকে দেখে কুন্তী খুব ভয় পেয়ে যান। তখন কুমারী, তিনি সন্তানের মা হবেন কী করে? লোকলজ্জার ভয়ে তিনি সূর্যকে চলে যেতে বলেন। কিন্তু সূর্যদেবতা তাতে রাজি নন। সূর্যদেবতা তখন আশ্বাস দেন, গর্ভসঞ্চার হলেও কুন্তী কুমারীই থেকে যাবেন। বাধ্য হয়ে কুন্তী তখন গর্ভসঞ্চারে রাজি হয়ে...তেজস্বী পুত্র চান সূর্যের মতো ...।'

মহাভারতে কুন্তীর জীবনের বাকি অংশটা কুন্তীর জানা। এইবার ওর মনে পড়তে লাগল। কান দিয়ে পুত্রকে প্রসব করেছিলেন কুন্তী। একমাত্র ধাত্রী ছাড়া আর কেউ এ কথা জানতেন না। কিন্তু, পাণ্ডবমাতা কুন্তীর সঙ্গে মহর্ষি ক্রতু ওর তুলনাটা টানলেন কেন, সেটা ও বুঝতে পারল না। পাণ্ডবমাতা স্বেচ্ছায় সূর্যদেবতাকে ডেকে এনেছিলেন। ওর ক্ষেত্রে তো তা হয়নি। ছলনা করে ওকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নিশ্চয় সে সব ঘটনা মহর্ষির জানা আছে। পাণ্ডবমাতা কুন্তীকে নিয়ে মহর্ষি ক্রতু আরও কী সব বলে যাচ্ছেন। তাতে কান না দিয়ে মুক্তি সোপানের সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে কুন্তী সেই দিনটার কথা ভাবতে লাগল, যেদিন ও কুমারীত্ব হারিয়েছিল।

বছর তিনেক আগের কথা। ভুবনেশ্বর মেডিক্যাল কলেজে কুন্তী তখন হাউস স্টাফ। কলেজের রি-ইউনিয়নের উৎসবে সেবার আসার কথা হেল্‌থ মিনিস্টার ডাঃ দুর্বা মিশ্রের। কমিটির কর্তারা এসে ধরলেন, 'কুন্তী, তোকে ডাঃ মিশ্রের দেখভাল করার দায়িত্ব নিতে হবে। উনি সুন্দরী মেয়েদের নাকি খুব পছন্দ করেন।' প্রথমে না না করে, পরে কুন্তী রাজি হয়ে গিয়েছিল। কথাটা সুরমাই ওর মাথায় ঢুকিয়েছিল। হেল্‌থ মিনিস্টার আসছেন... একবার যদি তাঁর চোখে পড়ে যেতে পারিস, তা হলে সরকারি হাসপাতালে ভালো পোস্টিং... কে আটকায় তোকে? রি-ইউনিয়নের দিন দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত ভদ্রমহিলার খিদমত খেটেছিল কুন্তী। ভদ্রমহিলা নিজেও একসময় খুব সুন্দরী ছিলেন। তবে বয়স্কা মানুষ, তার ওপর ওজন বেশি। বাতের ব্যথাতেও কাতর। হেল্‌থ মিনিস্টারের সঙ্গে কুন্তীর এত ভালো পরিচয় হয়ে গিয়েছিল যে, সেদিন উনি একবার বলেও ফেলেছিলেন, 'তুমি খুব মিষ্টি মেয়ে মা। ইশ, তোমার মতো একটা ঝিও যদি আমার থাকত...। আমার একটাই ছেলে। সে বেঙ্গালুরুতে মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এমবিএ করেছে। এই মাসখানেক হল ফিরে এসেছে।'

কথায় কথায় বাবার নাম বলতেই সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছিলেন ডাঃ দুর্বা মিশ্র। বাবার ফোন নাম্বার চেয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু, পরদিন বাবার কাছে হেল্‌থ মিনিস্টারের কথা তুলতেই, উনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, 'আমাকে জিজ্ঞেস না করে ফোন নাম্বারটা তোর দেওয়া উচিত হয়নি মা। মহিলাকে আমি খুব ভালো করে চিনি। বাইরে থেকে দেখে তোর যা মনে হয়েছে, সেটা ওঁর আসল চেহারা নয়। কলেজ লাইফেই পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েছিল। খুব ডেঞ্জারাস টাইপের। কোনও কিছু অ্যাচিভ করার জন্য যে কোনও লেভেলে নামতে পারে। দুর্বার অত্যাচারে ওর হাজব্যান্ড সুইসাইড করেছিল। ওকে অ্যাভয়েড করবি।'

কুন্তী অনেক পরে বুঝেছিল, বাবা ঠিকই বলেছিলেন। ততদিনে অবশ্য ওর যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে। রিইউনিয়ন ফেস্ট শেষ হয়ে যাওয়ার দিন তিনেক পরই একদিন সকালে বাড়িতে ফোন এসেছিল ডঃ দুর্বা মিশ্রের সিএ-র কাছ থেকে, 'আপনি কি আজ দুপুরে ফ্রি আছেন ম্যাডাম? ওঁরা বাড়িতে আপনাকে লাঞ্চে ডাকতে চান। আপনি কি বেলা একটার সময় ইউনিক পার্কে আসতে পারবেন? তা হলে গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

প্রথম দিন কুন্তী এড়িয়ে গিয়েছিল এক পেশেন্টের অপারেশন আছে বলে। কিন্তু, দ্বিতীয়বার আমন্ত্রণটা এসেছিল হাসপাতালের সুপার মারফত। সেদিনে ডিউটিতে যেতেই অর্জুন সাহু ওকে বলেছিলেন, 'কুন্তী, মিনিস্টার ম্যাডাম তোমার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন। তোমাকে আজ ডিউটি করতে হবে না।'

কুন্তী সেদিন না করতে পারেনি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ওকে রাজি হতে হয়েছিল। গাড়িতে ওঠার আগে গদগদ হয়ে অর্জুন সাহু বলেছিলেন, 'কুন্তী,তোমার সঙ্গে ম্যাডামের... হাসপাতাল নিয়ে যদি কোনও কথা হয়, তা হলে ওঁকে বোলো, এক্স রে মেশিনটা খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। সেটা যেন দ্রুত রিপ্লেস করার ব্যবস্থা করেন।'

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটা অবশ্য খারাপ হয়নি কুন্তীর। ইউনিয়ন পার্ক-টু-তে মিনিস্টারের বাড়িতে গিয়ে ও তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। কত টাকা পয়সা থাকলে মানুষ বাড়ি এই রকম সাজাতে পারে! এমনিতেই ওটা অভিজাতদের এলাকা। সেখানে বাংলো টাইপের বাড়ি, সামনে বিরাট লন, বাহারি গাছ দিয়ে সাজানো। একপাশে একটা দোলনাও ছিল। চাঁদনি রাতে দুর্বা মিশ্র নাকি তাতে বসে দোল খান। বাড়ির একপাশে ছোটো একটা মন্দির। দেখেই কুন্তী বুঝতে পেরেছিল, রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি নিত্য পূজা হয়। সেদিনই লাঞ্চের সময় ছেলে অনুপমের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন দুর্বা মিশ্র। দেখতে হ্যান্ডসাম, কিন্তু ছেলেটার কথাবার্তা শুনে ভালো লাগেনি কুন্তীর। একটু চালিয়াত ধরনের। ওড়িয়া মেয়েরা যে কত ব্যাকডেটেড, তা নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই কুন্তীর ধারণা হয়েছিল, অনুপম ছেলেটা ভালো নয়। বড়োলোকের বখে যাওয়া ছেলে।

লাঞ্চের পরও সেদিন অনেকক্ষণ দুর্বা মিশ্রের বাড়িতে ছিল কুন্তী। কথায় কথায় উনি বলেছিলেন, 'কটকে আর মাস তিনেকের মধ্যে অনুপম একটা বড়ো নার্সিং হোম খুলছে। আমি চাই, তোমার মতো ইয়ং ডক্টরেরা সেখানে কাজ করুক। তোমার সম্পর্কে

আমি খোঁজ নিয়েছি মা। অর্জুন সাহু তো খুব প্রশংসা করলেন তোমার সম্পর্কে। মনে হয়, তোমরাই আমার ছেলের নার্সিং হোমটা দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে। অফার লেটার আমি পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। টাকা পয়সার কথা তুমি পরে অনুপমের সঙ্গে বসে ঠিক করে নিয়ো।'

অপ্রত্যাশিতভাবে জীবনের প্রথম চাকরির অফার পেয়ে কুন্তী একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল। নার্সিংহোমটা ভুবনেশ্বরে হলে ওর কোনও অসুবিধা ছিল না। বাড়ি থেকেও ও যাতায়াত করতে পারবে। কিন্তু কটকে ও থাকবে কোথায় তা ছাড়া, বাবার সঙ্গে একবার কথা না বলে... রাজি হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কুন্তীর মন অবশ্য বলছিল, বাবা কিছুতেই রাজি হবেন না। কিন্তু, মিনিস্টারের কথা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার ফল ভালো হবে না। তাও ও বলছিল, 'আমাকে একটু ভাবার সময় দিন।'

ওর কথা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন দুর্বা মিশ্র। 'অত ভাবাভাবির তো কিছু নেই মা। ওখানে তোমার থাকার কোনও অসুবিধে হবে না। নার্সিং হোমেই ডক্টরস কোয়ার্টার। তোমার খুব পছন্দ হবে।' চলে আসার সময় এক্স রে মেশিনের কথাটা মনে পড়েছিল কুন্তীর। শুনে দুর্বা মিশ্র বলেছিলেন, 'এতক্ষণ বলোনি কেন মা। আমি কালই এক্স রে মেশিন পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।'

সত্যি সত্যিই পরদিন হাসপাতোলে এক্স রে মেশিন চলে এসেছিল। এর ফলে কুন্তীর ওজন বেড়ে গিয়েছিল ডাক্তার আর নার্সদের মধ্যে। সবাই একটু খাতির করতে শুরু করেছিল। দুর্বা মিশ্র প্রায়ই ফোন করতেন ওকে। সুরমা তো একদিন ঠাট্টা করে বলেই ফেলেছিল, 'আমার ভয় হচ্ছে ভাই। তোকে না উনি আবার ছেলের বউ করে নিয়ে যান। তখন আমাদের চিনতে পারবি তো?'

মাসখানেক পরে অফার লেটারটা পেয়ে কুন্তী চমকে উঠেছিল। প্রাইভেট নার্সিং হোমে যে এত টাকা মাইনে দেয়, সে সম্পর্কে ওর কোনও ধারণাই ছিল না। অফার লেটারটা দেখে বাবা অবশ্য বলেছিল, 'দুর্বার ট্র্যাপে পা বাড়াস না মা। তুই বললি, এটা ওর ছেলের নার্সিং হোম। কিন্তু দ্যাখ, চিঠিতে সই করেছেন নন্দিনী পাণিগ্রাহী বলে একজন। ডিরেক্টর্স বোর্ডের চেয়ারপার্সন। ব্রোসিয়রে লক্ষ করেছিস, খাতায়-কলমে কিন্তু কোথাও মিশ্র ফ্যামিলির কেউ নেই। আসলে এটা দুর্বারই নার্সিং হোম। চালাবে বকলমে।'

কুন্তী তখন উভয় সংকটে পড়েছিল। অফার লেটার ফিরিয়ে দিলে হেল্‌থ মিনিস্টার যে ওর পিছনে লাগবেন, সেটা ও বুঝতে পারছিল। আবার, চাকরিটা নিলে বাবাও যে খুব অসন্তুষ্ট হবেন, সেই ভাবনাও ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। বাবাকে কষ্ট দিতে ও চায়নি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কুন্তী বাবার মত আদায় করেছিল। ও যেদিন কটকের ট্রেন ধরে, সেদিন বাবা মন খারাপ করে বলেছিল, 'নিজেকে প্রোটেক্ট করিস মা। আবার বলছি, বিপদ বুঝলেই চলে আসবি। কোনও অন্যায় কাজে নিজেকে জড়াস না। আগে তোকে বলিনি। আজ বলছি, কলেজে পড়ার সময় দুর্বা আমার সঙ্গে ফ্লার্টিং করার চেষ্টা করেছিল। আমি তখন পাত্তা দিইনি। রাইট অ্যান্ড লেফট মিথ্যে কথা বলত। রিফিউজ

করেছিলাম বলে আমাকে একবার ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছিল, দেখে নেবে। আমি ভয় পাচ্ছি কোথায়, জানিস মা। ও ভীষণ ভিডিক্টিভ মহিলা। আমাকে তো কিছু করতে পারেনি। তোর উপর শোধ তুলবে। না হলে এত ডাক্তার থাকতে তোর মতো সদ্য ডাক্তারি পাশ করে মেয়ের উপর ওর নজর পড়বে কেন?'

এ সব কথা শুনে ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল কুন্তীর। কিন্তু, কটকে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে ও ভুলতে শুরু করেছিল বাবার সাবধানবাণী। মহনদীর ধারে বিশাল জায়গা জুড়ে নার্সিং হোম। পরিবেশই অন্যরকম, সরকারি হাসপাতাল থেকে ওখানে গিয়ে ও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। নার্সিং হোমে অত্যাধুনিক সব সরঞ্জাম, হাসপাতালে যা ওরা পেত না। দুর্বা মিশ্র ঠিকই বলেছিলেন, ডাক্তারদের কোয়ার্টারগুলোও দারুণ। সপ্তাহে একদিন উনি কটকে আসতেন, ওর খোঁজ খবর নিতেন। একবার উনি বাপের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গেও কুন্তীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। নার্সিংহোম চালু হওয়ার ঠিক আগে যখন আলোচনা চলছে, কীভাবে পাবলিসিটি করা হবে, শহরে কতগুলি হোর্ডিং দেওয়া হবে, হোর্ডিংয়ে কী লেখা থাকবে, কাকে মডেল হিসেবে নেওয়া হবে...সেই সময় দুর্বা মিশ্র হঠাৎ বলেছিলেন, 'হোডিংয়ে কুন্তীকে ইউজ করলে কেমন হয় রে অনুপম?'

শুনে অনেকেই লাফিয়ে উঠেছিল। অনুপমও সায় দিয়েছিল। 'খুব ভালো হয়। তা হলে মডেলের খরচটা আমাদের বেঁচে যাবে। অমন একটা সুন্দর মুখ, দেখলেই লোকে হোর্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে।' বলেই অনুপম নিলর্জ্জের মতো ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। দেখে বুকটা ধক করে উঠেছিল কুন্তীর। এটা দুর্বা মিশ্রর কোনও চাল নয়তো? ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখছেন হয়তো।

আপত্তি করেও কুন্তী আটকাতে পারেনি, সারা শহর ওর ছবি দেওয়া হোর্ডিংয়ে ছেয়ে গিয়েছিল। রাস্তা-ঘাটে যখন ও বেরত, তখন লোকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকত। নার্সিং হোমের অন্য ডাক্তাররা এই কারণেই ওকে হিংসে করতে শুরু করেছিলেন। শুরুর দিকে তুচ্ছ কারণে দু'একজন নালিশও করেছিলেন ওর বিরুদ্ধে নন্দিনী পাণিগ্রাহীর কাছে। ব্যতিক্রম ছিলেন ডাঃ চপলা শতপথী, ওকে বোনের মতো দেখতেন। মাস তিনেকের মধ্যেই কুন্তী বুঝতে পেরে গিয়েছিল, সৎভাবে চাকরি করা ওর সম্ভব হবে না। এক, পেশেন্ট পার্টির রক্ত চুষতে ও পারবে না। দুই, অনুপম ছেলেটাকে খুব বেশিদিন সহ্য করা সম্ভব না। নানা ছল ছুতোয় অনুপম ঘরে ডেকে পাঠাত। যখন তখন ওর শরীর ছোঁয়ার চেষ্টা করত। ওকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করত। ওদের দু'জনকে নিয়ে কানাঘুষোও শুরু হয়ে গিয়েছিল ডাক্তার আর নার্সদের মধ্যে। মাঝে মাঝে কুন্তীর মনে হত, বাবাকে সব জানায়। কিন্তু, সাহস পায়নি। জানালে বাবা তখনই বলত, 'তোকে চাকরি করতে হবে না। তুই চলে আয় মা।'

তারপর এল সেই সর্বনাশের দিনটা। কী একটা কারণে ভুবনেশ্বরের তাজ হোটেলে পার্টি ছিল। পার্টি শেষ হতে অনেক রাত্তির হয়ে গিয়েছিল। ভুবনেশ্বরে গিয়ে কুন্তী বাবার সঙ্গে দেখা করবে না, তা হতে পারে না। ও ঠিক করেছিল, রাতটা বাড়িতে

কাটিয়ে পরদিন দুপুরে কটকে চলে যাবে। বাবা বার বার ফোন করে জানতেও চাইছিল, কখন আসছিস। সন্ধের পর থেকেই বাবার কাছে যাওয়ার জন্য কুন্তী সেদিন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অনুপমকে না বলে চলে গেলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। তাই নার্সিং হোমের অন্যরা যে যার ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর কুন্তী গিয়েছিল অনুপমের ঘরে। আর তখনই জোর করে...।

'আমার প্রশ্নটার কিন্তু তুমি উত্তর দাওনি মা।'

মহর্ষি ক্রতুর গলা শুনে কুন্তীর ঘোর ভাঙল। অজান্তেই ওর চোখ চলে গেল পর্দার দিকে। ও দেখল, এতক্ষণ ও যা ভাবছিল, সবই পর্দায় দেখা যাচ্ছে। ও বসে আছে ডাঃ চপলা শতপথীর চেম্বারে। উনি বলছেন, 'তোমার ইউরিন টেস্ট পজিটিভ কুন্তী। কী করে এ সব হল?' শুনে কুন্তী কান্নায় ভেঙে পড়ছে। অনুপমের কথা শুনে ডাঃ চপলা বলছেন, 'ছয় সপ্তাহের বেশি প্রেগনেন্সি হয়নি। এখনও সময় আছে। অ্যাবরসনটা করিয়ে নাও বোন। তার পর চাকরিটা ছেড়ে চলে যেয়ো।'

গর্ভপাতের কথা শুনে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। ও কী যেন একটা বলতে যাচ্ছে। ওকে বাধা দিয়ে চপলাদি বলছেন, 'শোনো বোন, পুলিশে কমপ্লেন করে কোনও লাভ হবে না। দুর্বা মিশ্রের হাত অনেক লম্বা। উলটে, উনিই প্রমাণ করে দেবেন, তোমার চরিত্র খারাপ। অনুপমকে যা শাস্তি দেওয়ার, দেবেন প্রভু জগন্নাথ। চুপচাপ অ্যাবরসনটা করিয়ে নাও। আমি ওয়াশ করে দেব। কেউ টেরও পাবে না। প্লিজ কুন্তী, তুমি আর কাউকে বলতে যেয়ো না।'

পর্দা থেকে জোর করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মহর্ষির দিকে তাকল কুন্তী। উনি বললেন, 'বেশ, তোমাকে কিছু বলতে হবে না মা। একটা প্রাণ তুমি হত্যা করেছ। কিন্তু, চিকিৎসা করে অনেক প্রাণও তুমি বাঁচিয়েছ। তোমার পাপের ভাগ কম। মুক্তি সোপানের নিয়ম অনুযায়ী, তোমাকে আগে পাপের ফল ভোগ করতে হবে। সেই কারণে তোমাকে আমি ভ্রূণলোকে পাঠাচ্ছি।'

কুন্তী জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে আমায় কী করতে হবে মহাত্মন?'

'যে ভ্রূণকে তুমি হত্যা করেছিলে, ওখানে গিয়ে তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে তাকে। সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে, তা হলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। ওই যে ডান দিকে একটা দরজা দেখছ, সেখান দিয়ে তুমি বেরিয়ে যাও। বাইরে দেখবে ভ্রূণলোকের রথ দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

গড় হয়ে মহর্ষিকে প্রণাম জানিয়ে কুন্তী দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

১৬

এত তাড়াতাড়ি যে মহর্ষি জরৎকারুর কাছ থেকে ছাড়া পাবে পাণ্ডু তা ভাবতেই পারেনি। আশীর্বাদ চেয়ে ফেরার পর ও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল এই ভেবে যে, মহর্ষি রেগে ওকে ভর্ৎসনা করবেন। কিন্তু, উনি ডেস্কে সাজানো কলকব্জা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া

করে তার পর মৃদুস্বরে বললেন, 'বৎস, কোথাও একটা ভুলচুক হয়েছে। তোমার ভিডিয়ো ক্লিপংস আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

ভিডিয়ো ক্লিপিংস বলতে মহর্ষি জরৎকারু কী বোঝাচ্ছেন, পান্ডুর তা বোধগম্য হল না। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। কিমিন্দম মানা করে দিয়েছে। তাই উৎসুক চোখে ও তাকিয়ে রইল। এঁরা সব ত্রিকালজ্ঞ। মনের কথা পড়ে নিতে পারেন। নিশ্চয়ই বুঝে যাবেন, ওর মনের ভিতরে কী চলছে। আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি বললেন, 'তোমার জীবনে যা কিছু ঘটে গিয়েছে, তার ভিডিয়ো ক্লিপিংস আমার কাছে থাকার কথা। কিন্তু, সেটা আমি ওপেন করতে পারছি না। আমার মনে হয়, পরলোকে যাওয়ার সময় তোমার হয়নি। তুমি বরং ফিরে যাও।'

পাণ্ডু বুঝতে পারল না, ও ফিরে যাবে কী করে? পিছন ফিরে ও দেখল চলন্ত সিঁড়ি উপরের দিকে উঠে আসছে। কিন্তু, নীচে নেমে যাওয়ার সিঁড়ি নেই। মহর্ষিকে প্রশ্ন করা চলবে না। তাই ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বুঝতে পেরে জরৎকারু মুনি বললেন, 'বৎস পাণ্ডু, তুমি এক কাজ করো। এই দরজাটা দেখছ, এটা মায়ালোক যাওয়ার পথ। আপাতত তুমি ওখানে চলে যাও। মায়ালোক থেকে তুমি ইহলোকে যাওয়ার মুক্তি এক্সপ্রেস পেয়ে যাবে। আপাতত, তোমায় একটা সুযোগ দিচ্ছি। মায়ালোকে তোমার একজন প্রিয় জন আছে। তার কাছে কিছু সময় তুমি কাটিয়ে আসতে পারো।'

মহর্ষির কথামতো দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পাণ্ডু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, জায়গাটা একেবারে শুনশান। কেউ কোথাও নেই। যেখানে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই এয়ারপোর্টের মতো বিশাল টার্মিনাল। অদ্ভুত সুন্দর সাজানো। জায়গাটা দেখেই ওর ব্যাংককের কথা মনে পড়ল। বছর দুয়েক আগে ডাক্তারদের এক কনফারেন্সের জন্য পান্ডুকে ব্যাংকক যেতে হয়েছিল। কনফারেন্সটা হয়েছিল ইউনিসেফের উদ্যোগে। আদিবাসী অঞ্চলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, এমন সব ডাক্তার সেই কনফারেন্সে আমন্ত্রিত ছিলেন। ব্যাংককের সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টে নেমে, তার বিশালত্ব দেখে পাণ্ডু খেই হারিয়ে ফেলেছিল। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার জন্য লম্বা লম্বা চলন্ত সিঁড়ি। হাঁটার কোনও দরকার নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লোকজন গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। এয়ারপোর্ট যে এত বিরাট হয়, সে সম্পর্কে পাণ্ডুর কোনও ধারণাই ছিল না। অত রাত্রেও সেখানে লোকজনে খুব জমজমাট।

মায়ালোকের রাস্তাগুলিও ব্যাংককের মতো, গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কদাচিৎ একটা করে লোক তাতে দেখা যাচ্ছে। অবাক চোখেই পাণ্ডু জায়গাটা জরিপ করতে শুরু করল। আলোয় উদ্ভাসিত, কিন্তু কোথাও বালব লাগানো নেই। স্তম্ভের গায়ে অসংখ্য মণিমাণিক্য। তারই ছটায় চারিদিক আলোয় ভেসে যাচ্ছে। ট্রেনে আসার সময় সুরো বলেছিল বটে, পাতালের স্থপতি ছিল ময়দানব। এখন দেখছে, কথাটা সত্যি, এই ডেকোরেশন কোনও মানুষের পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। দেওয়ালের গায়ে মণিগুলো এমনভাবে ফিট করা, পাণ্ডুর চোখ ফের ধাঁধিয়ে গেল। মায়ালোকে পা দিয়ে ও কোথায় যাবে বুঝতেই পারল না।

এই সময় পাশ থেকে কে যেন ফিসফিস করে বলল, 'ডাগদারবাবু, তু যাবি কুথাকে?'

শুনে গা ছমছম করে উঠল পাণ্ডুর। ও যে ডাক্তার, মায়ালোকে তো কারও জানার কথা নয়! চট করে পাশ ফিরে লোকটাকে দেখে ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার শম্ভু কিস্কু। আরে, ও এখানে এল কী করে? শম্ভুদাকে শেষবার পাণ্ডু দেখেছিল শিসপাহাড়ি জংশনে আসার সময় ড্রাইভারের সিটে। তারপর হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার বদলে গিয়েছিল। কী করে সেটা হল, তা জানার জন্য মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন করল, 'শম্ভুদা, আচমকা তুমি কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলে?'

শম্ভুদা বলল, 'আর বলিস না বাপ, রাস্তায় লংম্যান সাহেবের পেরেত ধরেনছিল বটে। মোকে ছুড়ে ফেলি দিল ডেরাইভারের সিট থেইকে। উ কথা আর জিগাস না ডাগদার। বল, তু কুথাকে যাবি।'

পাণ্ডু বলল, 'জানি না। কিন্তু...তুমি এখানেও গাড়ি চালাচ্ছ নাকি?'

'মো তো আর কিছু জানিক নাই। সাধু বুঢ়াটা এই কামটাই মোকে দিল। হুই যে...তুর গাড়ি দাঁইড়ে আছে। চল ক্যানে, উ অ্যাক আজব গাড়ি।'

শম্ভুদার সঙ্গে গড়িতে পা দিয়ে পাণ্ডু বুঝতে পারল, সত্যিই একটা অদ্ভুত যান। গাড়ি না বলে উড়ন্ত চাকি বলা উচিত। আকৃতি গোল থালার মতো। সামনে পিছনে মাত্র দুটো সিট। পাণ্ডু পিছনের সিটে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে চাকিটা জমি থেকে কয়েক ফুট উপরে উঠে...তারপর সাঁ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। টিভিতে হলিউডের সিনেমায় এই রকম উড়ন্ত যান দেখেছে পাণ্ডু। ওর বেশ মজাই লাগল অভিনব গাড়িতে চড়ে। কিন্তু, টার্মিনালের বাইরে বেরনোর পরই অজানা এক আশঙ্কায় সেই ফুরফুরে মেজাজটা উবে গেল। ও দেখল, নীচে জমির রং জ্বলন্ত আগুনের মতো এবং সেটা দিগন্তবিস্তৃত। একবারে দিগ্‌বলয়ে কালো বর্ডার। একবার ডিসকভারি চ্যানেলে আগ্নেয়গিরি নিয়ে একটা প্রোগ্রাম দেখেছিল পাণ্ডু। আগ্নেয়গিরির ভেতরটা ঠিক এই রকম দেখেছিল। পাণ্ডুর মনে প্রশ্ন জাগল, ওরা কি কোনও জ্বালামুখের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে? টিভির সেই প্রোগ্রামে ফুটন্ত লাভা দেখেছিল পাণ্ডু। এখানে সে রকম কিছু ওর চোখে পড়ল না। আগুনের তাপও ও টের পেল না।

আকাশের দিকে তাকিয়ে পাণ্ডু আরও অবাক। বিশাল বিশাল সব ঝলমলে গাছ, শূন্যে ভাসছে। কোনওটা বেগুনি, কোনটা গোলাপি, কোনওটা বা নীল রঙের। গাছগুলো যেন পুরো আকাশটাকেই ঢেকে রেখেছে। তখনি ওর মনে পড়ল, মায়ালোকে আকাশ থাকবে কী করে। ও যে এখন পাতালপুরীতে! অসংখ্য রত্ন দিয়ে গাছগুলি মোড়া। পান্না, চুনি, হিরে, জহরত। ওর মুখ থেকে 'বাহ' শব্দটা বেরিয়ে আসতেই শম্ভুদা বলল, 'ডাগদারবাবু, তু জানিস উ গাছগুলো কীসের লেগে?'

মুখ ফিরিয়ে পাণ্ডু বলল, 'না, আমি জানব কী করে?'

'উ হচ্ছে প্রায়শ্চিত্তির গাছ। ইখেনে থাকলেই তু সব জানি যাবি।'

'তুমি কদ্দিন আছ এখানে, শম্ভুদা?'

ইখেনে দিন-রাইতের কুনও হিসাব নাই রে ডাগদার। মো লাশপুরের জঙ্গলে পইড়ে ছিলাম। যমদূত মোকে ধইরে নে গেল রেলওয়ে জংশনে। মো আর বুধিরাম একই সঙ্গে আসতে ছিলাম। হঠাৎ দেখি, বুধিরাম লাই।'

'নেই মানে? ও গেল কোথায়?'

'মারাংবুরু উকে টেরেনে ঢুকতে দেয় লাই। বস্তিতে ফিরায়ে লিয়েছে।'

'ত' হয় নাকি? এখানে এলে আবার ফেরত যাওয়া যায়?'

'হু', তাই হলক বটে। চোখের সমুখে দিখলাম।' এরপর শম্ভুদা যা বলল, তা বিশ্বাস করতে মন চাইল না পাণ্ডুর। ওদের দু'জনের আত্মাকে নাকি যমদূত ধরে আনছিল। কিন্তু, মারাংবুরুর আদেশে বুধিরামকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। শম্ভুদা বলল, বুধিরামের ডেডবডি নিয়ে নাকি ওর বউ পদ্মমণি শিসপাহাড়িতে মারাংবুরু থানে গিয়েছিল। সেখানে খুব কান্নাকাটি করে। মাথা খুঁড়ে মরতে যাচ্ছিল এই বলে যে, ওর কোনও ছেলেপুলে হয়নি। সারাটা জীবন তা হলে ও বাঁচবে কাকে নিয়ে? ওর কান্না দেখে মারাংবুরুর মনে নাকি তখন দয়া হয়। বুধিরামের দেহ তখনও সৎকার করা হয়নি। মারাংবুরু তাই ওর আত্মাকে তখন ফিরে যেতে বলেন। সেই আত্মা বুধিরামের দেহে প্রবেশ করে ওকে বাঁচিয়ে তুলবে, যাতে বউয়ের সঙ্গে সহবাস করার সুযোগ পায়। বউকে গর্ভবতী করে বুধিরামের আত্মা আবার এখানে ফিরে আসবে। ওর বউ ছাড়া এ কথা আর কেউ জানতে পারবে না।

পাণ্ডু অবিশ্বাসী মুখ করে আছে দেখতে পেয়ে শম্ভুদা বলল, 'তু বিশ্বাস করছিস না ক্যানে বাপ। সাধু বুঢাটা বলল, তুদের পুরাণেও লিখা আছে। সিখানেও ই রকম ঘটনা ঘটেইনছিল।' কথাটা বলার ফাঁকে উড়ন্ত চাকি নামাতে শুরু করল শম্ভুদা। তার পর বলল, 'ইবার যা ডাগদারবাবু। তুকে লিবার জন্য তুর আপনজনরা দাঁইড়ে আছে।'

নীচের দিকে তাকিয়ে পাণ্ডু দেখল, একটা দেওয়ালের ওপাশে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ পাশে উড়ন্ত চাকি নামলেই তার দিকে দৌড়ে আসছে। পাণ্ডু জিজ্ঞেস করল, 'এরা কারা শম্ভুদা?'

'যারা ইখানে আসে, তাদির পরিবারের লোক। তু দ্যাখ ক্যানে... তুর কে এসেনছেন। আমি চলি ডাগদার। দিয়ালের বাইরে মো যেতি পারবক না। মোর পরিবারের কেউ লাই রে ইখেনে। তাই টার্মিনালেই মোকে ভটকাতে হবেক।' বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে এল শম্ভুদার।

দেওয়ালের ও পাশে পা দিতেই পাণ্ডু চমকে উঠল। এ কী...মা! মা দাঁড়িয়ে আছে ভিড়ের মাঝে! দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ও মাকে দেখতে পেল। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে মায়ের? এত দুঃখী দুঃখী মনে হচ্ছে কেন? তবে যে সুরো বলেছিল, এখানে এসে আত্মারা খুব আনন্দে থাকে। মাকে দেখে তো মনেই হচ্ছে না আনন্দে রয়েছে। শুধু মা নয়, ভিড়ের মধ্যে আরও যে সব মহিলা রয়েছেন, তাঁদের সবার মুখে বৈধব্যজনিত বিষাদ, অপ্রাপ্তির চিহ্ন। সবার পরনেই সিল্কের সাদা শাড়ি। ওকে দেখে মা ছাড়া সকলের মুখ মলিন হয়ে গেল। মা দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে কাঁদতে শুরু করল। তার পর বলল, 'কতদিন পরে তোকে দেখলাম বাবা। আয়, আমার বুকে আয়।'

মাকে দেখে পাণ্ডুরও কান্না পেয়ে গেল। পাশ থেকে এক মহিলা তখন বলে উঠলেন, 'তোমার মা যত ইচ্ছে কাঁদুক বাছা, বাধা দিয়ো না। তোমার মা যত কাঁদবে, ততই ওর শান্তি কমবে। কিন্তু, তুমি কেঁদো না বাবা। তোমার চোখের একফোঁটা জল মাটিতে পড়ার অর্থ, সবিত্রীদির শাস্তি বেড়ে যাবে। এটাই মায়ালোকের নিয়ম,'

কথাটা শুনে পাণ্ডুর চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছে দিল মা। আঁচল দিয়ে নিজেরও মুখ মুছল। পুরুলিয়ায় সকালে ঘুম থেকে উঠে পাণ্ডু প্রথমেই মাকে প্রণাম করত। কোথাও গেলে মায়ের আশীর্বাদ না নিয়ে যেত না। কোনও জায়গা থেকে ফিরে এলে আগে মায়ের পা ছুঁত। সেকথা মনে পড়ায় মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করল পাণ্ডু। খুশি হয়ে মা সবাইকে বলল, 'এই দ্যাখো, এ হল আমার ছেলে পাণ্ডু... শিসপাহাড়ি হাসপাতালের ডাক্তার। অ্যাদ্দিন তোমাদের বলতাম না, আমাকে কত শ্রদ্ধা-ভক্তি করে?'

কে যেন বলল, 'তোমার ছেলে তো রাজপুত্তুর সাবিত্রীদি। এত অল্প বয়েসে এখানে চলে এল কেন গো? বিয়ে-থা হয়েছিল?'

প্রশ্নটা শুনে যেন অসন্তুষ্ট হল মা। উত্তর না দিয়ে পাণ্ডুকে বলল, 'চল বাবা, আমার ঘরে চল। এই কাছেই আমার থাকার জায়গা। তুই আমার কাছে থাকবি।'

মা ওর হাত ধরে টানার সঙ্গে সঙ্গে একমহিলা সামনে এসে বললেন, 'তু শিসপাহাড়িতে ছিলি, লয় বাপ? ফুলমণি বলে কাউকে কি তু চিনিস?'

সিস্টার ফুলমণির নাম শুনে পাণ্ডু দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'খুব ভালোমতো চিনি। উনি আমাদের হাসপাতালের সিনিয়র নার্স। আপনি ওঁকে জানেন কী করে?'

'মোর মেয়া যে। উ অ্যাখুন ক্যামন আছে গ?'

ইনিই তা হলে সিস্টার ফুলমণির মা ঠাকুরমণি! ভালো করে মহিলার দিকে তাকাতেই পাণ্ডু দেখল, হ্যাঁ দু'জনের চেহারার মধ্যে যথেষ্ট মিল। ও বলল, 'সিস্টার ফুলমণি ভালো আছেন। এই তো আসার দিন ওঁর সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হল।'

'মোর মেয়েটা খুব দুঃখী গ। মরদটা অকে সুখ দিল না। মেয়ার ভালো বিয়া হইল না। মোর পাপের ফল। উকে তো ভোগ করতেই হবেক...।

ফুলমণির মা-কে চুপ করিয়ে দিল মা, 'তুই থাম তো ঠাকুরমণি। ছেলেপুলের কাছে এসব কথা আলোচনা করতে আছে? এখানে এসেও তোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান হল না।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন বলে উঠল, 'ওকে বলতে দাও না সাবিত্রীদিদি। পাপের কথা বলে একটু হালকা হোক। তোমার আর কী। ছেলে পুণ্যি করে এসেছে। তাই তুমি সাত তাড়াতাড়ি ওকে কাছে পেয়ে গেছ। তোমার প্রায়শ্চিত্তিরের আর বেশি বাকি নেই। ঠাকুরমণি তো সে ভাগ্য করে আসেনি। মেয়েকে কবে কাছে পাবে তার ঠিক নেই। তিনলোক পেরিয়ে ওর মেয়েকে এখানে আসতে হবে। মেয়ের খোঁজখবর নিচ্ছে, একটু নিতে দাও না।'

শুনে অনেকেই একযোগে বলে উঠল, 'ঠিক কথা।'

সিস্টার ফুলমণি কতটা ভালো আছেন, সে কথা বলতে যাচ্ছিল পাণ্ডু। সেইসময়

পিছন থেকে এক বয়স্কা মহিলা এগিয়ে এসে বললেন, 'ডাক্তারবাবু আমাকে চিনতে পারছেন? আমি সুশীলা। শিসপাহাড়ি হাসপাতালে আপনার কাছে বেশ কিছুদিন ভর্তি ছিলাম।'

মহিলার দিকে তাকিয়ে পাণ্ডু চেনার চেষ্টা করল। সেটা লক্ষ করে মুখটা মলিন হয়ে গেল সুশীলার। বললেন, 'আমাকে মনে পড়ছে না, তাই না? মনে পড়বেই বা কী করে? এত পেশেন্ট... তার মধ্যে আমার মতো বুড়িকে আপনি মনে রাখবেনই বা কেন?'

গলার স্বর শুনে হঠাৎই পাণ্ডুর মনে পড়ল। সুশীলা মাইতি। সবসময় এই রকম আক্ষেপের সুরে কথা বলতেন। বছর তিনেক আগে কোলনে আলসার নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ভদ্রমহিলার তিন ছেলে। ভাগের মা, গঙ্গা পায় না! কথাটা যে কত সত্যি, এই ভদ্রমহিলাকে দেখে পাণ্ডু তা উপলব্ধি করেছিল। ছেলেরা প্রত্যেকেই ভালো চাকরি করতেন। মিশনারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয়, এই ধারণা নিয়ে ওঁকে ভর্তি করে দিয়ে যান বড়ো ছেলে। তার পর অপারেশনের খরচা দিতে হবে জেনে তিনি আর হাসপাতালমুখো হননি। মেজো আর ছোটো ছেলে একদিন মাত্র দেখতে আসেন মাকে। টাকা পয়সা খসে যাবে, বুঝতে পেরে ওঁরা উধাও হয়ে যান। সুশীলা মাইতিকে নিয়ে সেইসময় খুব বিপদে পড়েছিল পাণ্ডু। ভদ্রমহিলাকে ও চিনবে কী করে? শীর্ণ শরীর নিয়েই উনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এখন বেশ পৃথুলা।

সুশীলা মাইতি পেটের যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। অপারেশনও করতে পারছিল না পাণ্ডু। অপারেশনের আগে বন্ডে সইয়ের দরকার হয়। এ দিকে, ছেলেদের পাত্তা নেই। রেজিস্টার চেক করতে গিয়ে পাণ্ডু আবিষ্কার করেছিল, বড়ো ছেলে যে ঠিকানা লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার কোনও অস্তিত্ব নেই। অনেক সময় কাঁদতে কাঁদতে সুশীলা মাইতি বলতেন, 'আমার বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না ডাক্তারবাবু। আমাকে মেরে ফেলুন। আমাকে যেন বড়ো ছেলের বাড়িতে আর ফিরতে না হয়।' পাণ্ডু অনেক চেষ্টা করেছিল, ওঁর কাছ থেকে ছেলেদের ঠিকানা জানার। কিন্তু, ছেলেদের উপর অভিমানে উনি কারও ঠিকানা দিতে চাননি।

পাণ্ডু বলল, 'আপনাকে ভুলি কী করে সুশীলা মাসি? আপনাকে নিয়ে প্রায়ই আমরা আলোচনা করি। আপনি কি জানেন, আপনার বড়ো ছেলে একবার লুকিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। এটা সিওর হতে যে, সত্যিই আপনি মারা গিয়েছেন কি না। রেজিস্টার দেখেই উনি চলে যান।'

'হায় রে আমার পোড়া কপাল।' কপাল চাপড়ে সুশীলা মাইতি অন্য মহিলাদের বললেন, 'তোমরা শুনলে তো, কী ছেলে আমি গভ্যে ধরেছিলুম। জানোয়ার...সব জানোয়ার। কতবার ভেবেছি, গলায় দড়ি দিয়ে সুইসাইড করব। কিন্তু, যখনই এই ডাক্তারবাবু সামনে এসে দাঁড়াত, ততবারই বাঁচার ইচ্ছা জাগত। কী সেবা যত্নই না করেছে! আমার ওষুধের সব খরচ দিয়েছে। আমার জন্য আলাদা দাই পর্যন্ত রেখেছিল। দিনে দু'বার রাউন্ডে এসে এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত যে, চোখে জল এসে যেত। তখন ভাবতাম, ছেলেটার মা কত ভাগ্যবতী। আমার ছেলেরা কেন এমন হল না?

সাবিত্রীদিদি, আজ জানলাম, এ তোমার ছেলে। তোমাকেই আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে দিদি।'

মা খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, 'থাক থাক, বাড়াবাড়ি করো না। এতই যখন সেবা-যত্ন করেছে, তা হলে তোমায় ইহলোক ছাড়তে হল কেন?'

'সে আমার কপাল দিদি। পেটে বহুদিনের ঘা। শেষ পর্যন্ত ক্যানসার হয়ে গিয়েছিল। অন্য কেউ হলে তাকে হাসপাতাল থেকে হয়তো বের করে দিত। তোমার ছেলে তা হতে দেয়নি। মরার দিন পর্যন্ত আমাকে হাসপাতালে রেখে দিয়েছিল। নিজের খরচে আমার সৎকার পর্যন্ত করিয়েছে। আমি ভাবতেও পারিনি, এ জগতে এসে তোমার ছেলের সঙ্গে দেখা হবে। আমার কোয়ার্টারে ওকে একদিন নিয়ে এসো না দিদি। যত্ন করে খাওয়াব।'

মায়ের সঙ্গে কয়েক পা হেঁটে যাওয়ার পর পাণ্ডুকে ফের দাঁড়াতে হল। এক মহিলা ফের পথ আটকে ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও বাছা। কুন্তীকে তুমি কোথায় রেখে এলে?'

প্রশ্নটা শুনে পাণ্ডু হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

১৭

বেলা দু'টোয় কোয়ার্টারে ফিরে সিস্টার ফুলমণি দেখলেন, জোসেফ সোরেন বসে গল্প করছে রুমালির সঙ্গে। উঠোনে লাল রঙের সাইকেলটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, জোসেফ এসেছে, ছেলেটাকে এমনিতেই তিনি খুব পছন্দ করেন। ফলের ব্যাবসায় ভালো রোজগার করে। আগে কোনও দরকারে সোনামণি পাঠাতে চাইলে জোসেফ এ বাড়িতে আসতে চাইত না। বলত, দোকান নিয়ে এমন ব্যস্ত, কোথাও বেরতে পারে না। কিন্তু গত দু'দিন হল, ছেলেটা ঘনঘন আসছে। ভর দুপুরে দোকান ছেড়ে এসে এখানে ছোঁড়া কী করছে? রুমালির সঙ্গে পীরিত হয়েছে নাকি? হতেও পরে, মেয়েটা তো দেখতে খারাপ নয়। আদিবাসী মেয়েদের মতো নয়, সবসময় সেজেগুজে থাকে। জোসেফের মতো জোয়ান ছেলে আকৃষ্ট হবেই। মর্নিং ডিউটি থাকলে ফুলমণি কোনও দিন দুটোর মধ্যে কোয়ার্টারে ফেরেন না। পাণ্ডু ডাগদারবাবু অথবা কুন্তী দিদিমণির সঙ্গে কাজ করতে করতে বেলা তিনটে, কখনও কখনও চারটেও বেজে যেত। ওই দু'জনের একজনও এখন শিসপাহাড়িতে নেই। তাই ঠিক সময়ে কোয়ার্টারে ফিরে এসেছেন ফুলমণি। রুমালি বোধ হয় আশা করেনি, এত তাড়াতাড়ি উনি ফিরে আসবেন। জোসেফকে দেখে একটু বিরক্তই হলেন ফুলমণি।

ওঁকে দেখে অপ্রস্তুতভাবটা কাটিয়ে রুমালি বলল, 'ফুলমণিমাসি শোনো, আদিবাসী বস্তিতে কী হয়েছে। শুনলে তোমার গায়ের রোম খাঁড়া হয়ে যাবে। জোসেফ সেই কথাটাই তোমায় বলতে এসেছে।'

শুনে মনে মনে হাসলেন সিস্টার ফুলমণি। জোসেফ কার কাছে এসেছে, তিনি

জানেন। রুমালির মতো বয়সে তিনিও নির্জনে... একজনের সঙ্গে সময় কটাতে চাইতেন। মনের ভাব প্রকাশ না করে ফুলমণি বললেন, 'কী হইনছে রে জুসেফ? কী কইতে এসেইনছিস।'

'বুধিরাম বেঁচে উঠেনছে মাসি।'

কথাটা মাথায় ঢুকতে একটু সময় লাগল ফুলমণির। কী বলছে ছোঁড়া? বুধিরাম বেঁচে উঠেছে! এর মানেটা কী? এই তো কাল বিকেলে কাঁদতে কাঁদতে ওর ডেডবডি নিয়ে গেল পদ্মমণি, ওর বউ। ডেথ সার্টিফিকেট লিখেছিলেন ডাক্তার পাণ্ডু। মরা মানুষ আবার বেঁচে ওঠে নাকি? আজকাল দিনের বেলাতেই কি হাড়িয়া খাচ্ছে জুসেফ? না, তা তো হতে পারে না। সোনামণি বলেছিল, সে অভ্যাস ছোঁড়ার নেই, জুসেফ অন্য আদিবাসী ছেলেদের মতো নয়। বড়দের কাছে বাজে কথা বলবে না। কাজ-কাম ছেড়ে রুমালির সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে আসার জন্য কোথায় ওকে বকুনি দেবেন, তা না করে ফুলমণি বললেন, 'সত্যি কইছিস?'

জোসেফ উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'হ গ মাসি। নিজের চক্ষে দেখেইনছি। উর ঘরে এখন মেলা লোগ। বস্তির কেউ আর বাকি লাই। পদ্মর সঙ্গে মো কথা কইয়ে এলাম বটে।'

শুনে ফুলমণির চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল। তিরিশ-বত্রিশ বছর হাসপাতালে কাজ করা হয়ে গেল। কখনও তিনি শোনেননি, মরে যাওয়ার পরও কেউ বেঁচে উঠেছে। এ তো মারাত্মক ব্যাপার। নিশ্চয় বুধিরামের উপর ডাইন ভর করেছে। নয়তো পেরেত। না হলে ছোঁড়া বেঁচে উঠতেই পারে না। একটু ভয় ভয় করতে লাগল ফুলমণির। বললেন, 'তু উর সনে কী কথা কইলি জুসেফ?'

'মো জিগাইলাম, তুর মরদ বাঁচি উঠলি কেমন তরে। উ বলল, মো ফিরায়ো আনছি গ।'

শুনে ফুলমণি উত্তরোত্তর অবাক, 'পদ্মমণি! উ কী করে ফিরায়া আনল বটে!'

'পাহাড়ে মারাংবুরুর থানে লিয়ে গে।'এরপর জোসেফ যা বলল, তাতে সত্যি সত্যিই ফুলমণির গায়ের রোম খাঁড়া হয়ে গেল। পদ্মমণি... ওইটুকু এতটা বাচ্চা মেয়ে! কী সাহস! ও নাকি রাতে একাই ঠেলাগাড়িতে করে বুধিরামের ডেডবডি নিয়ে গিয়েছিল, শিসপাহাড়ির ওই উঁচুতে মারাংবুরুর থানে। দিনের বেলাতেও যেখানে লোকে একা একা যেতে ভয় পায়। ওখানে কী হয়েছিল, ফিরে এসে ওরা কাউকে তা বলেনি। সকালে বস্তির লোকেরা দেখেছে, নিজে ঠেলা চালিয়ে পদ্মমণি ফিরছে বুধিরামকে নিয়ে। ওদের ফিরে আসতে দেখে আদিবাসী বস্তিতে নাকি শোরগোল পড়ে গিয়েছে। শিসপাহাড়ির রেঞ্জ যে একেকটা অলৌকিক জায়গা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ছোটোবেলা থেকে ফুলমণি নানা অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনে আসছেনও। তবে আজ যা শুনলেন, তার তুলনা নেই। নাহ, বিকেলে একবার বস্তিতে যেতেই হবে। ফুলমণি ঠিক করে নিলেন, একটু ভাত-ঘুম দিয়েই সাইকেলে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়বেন। কতটা সত্যি, কতটা রটনা...জেনে আসতে হবে।

বলার মতো আর কিছু নেই বুঝতে পেরে জোসেফ উঠে পড়ল। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে ও বলল, 'মোর দুকানে তরমুজ এসেনছে গ মাসি। রুমালিরে পাঠায়া দিয়ো। তুমার লিগে পাঠায়া দিবঅ।'

তরমুজ পাঠানোটা একটা বাহানা মাত্র। আসলে সান্নিধ্য পেতে চায়। সেটা বুঝে ফুলমণি বললেন, 'দুপুর না খেয়া যাবি ক্যানে বাপ। আয়, দু মুঠা ভাত খেয়া যা।'

'না মাসি, মা দুকানে খাবার পাঠাইন দিছে।'

কথাটা বলেই জোসেফ সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে ফুলমণি দেখলেন, যাওয়ার আগে জোসেফ কানে হাত দিয়ে রুমালিকে কী যেন ইশারা করে গেল। দেখে মুচকি হাসলেন ফুলমণি। এই বয়স অনেকদিন আগে তিনি পেরিয়ে এসেছেন। জোসেফ ফোন করার কথা বলে গেল। তখনকার দিনে মোবাইল ফোন ছিল না। প্রেমিকের সঙ্গে ঘন ঘন কথা বলারও সুযোগ ছিল না। থাকলে ব্যানার্জি সাহেবও ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওঁকে ফোন করতেন। ব্যানার্জি সাহেবের সঙ্গে মাসে একবার কী দুবার দেখা হত। তাও, সেই শুক্তিমতি নদীর ধারে কোনও বনবীথিতে। বহুদিন পর সিস্টার ফুলমণির মনে পড়ল ব্যানার্জি সাহেবের কথা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বাথরুমে ঢুকলেন পোশাক বদলানোর জন্য।

খানিক পরে রুমালির সঙ্গে খেতে বসেও ফুলমণি মন থেকে সরাতে পারলেন না বুধিরামের কথা। তাঁর জীবনটা এখন বড্ড বেশি হাসপাতাল কেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে। খেতে খেতেই একটা সময় ফুলমণির মনে হল, হাসপাতালের কোনও গাফিলতি ছিল না তো? এমনও হতে পারে, বুধিরাম আদৌও মরেনি, অথচ ডাক্তার পাণ্ডু বুঝতে না পেরে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন। মানুষের মৃত্যু নির্ধারণ করাটা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। ঘণ্টা তিন-চারেক অপেক্ষা না করে ডাক্তাররা কেউ নিশ্চিত হতে পারেন না। এমন তো হতে পারে, ডাক্তার পাণ্ডু তাড়াহুড়ো করেছেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। কেননা, গত দু'দিন ধরে ওঁদের কোনও খবর নেই।

খাওয়ার ফাঁকেই কথাটা মনে হল বলে রুমালিকে প্রশ্ন করলেন ফুলমণি, 'হ্যাঁ রে, কুন্তী দিদিমণি কি তুকে আজ ফোন করেইনছিলক?'

রুমালি বলল, 'না গো মাসি, করেনি। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে, জানো? কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি, বাবাঠাকুর মারা গেছেন। দিদি খুব কান্নাকাটি করছে। এমনটা [illegible] যে হবে, জানতাম। পরশু রাতে দিদিরা যখন কোয়ার্টার থেকে বেরচ্ছিল, [illegible] টিকটিকি ডেকে উঠেছিল। মনের ভেতর কুডাক দিল। দিদিকে ত্যাখন বললাম, একটু বসে যাও। কিন্তু শম্ভুদা এমন তাড়া দিল...'

'উদের ভুবনেশ্বরের বাড়ির ফোন নাম্বারটা তু জানিস?'

'আমার মনে নেই। তবে দিদির খাতায় লেখা আছে। কোয়ার্টারে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।'

'দিদিমণির বাপ ভুবনেশ্বরের কুন হসপিটালে ভর্তি আছে?'

'দাঁড়াও, মনে করে বলি।... মনে হয়, মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে। তুমি একটা খোঁজ

নাও না মাসি। না হলে জোসেফকে একবার খোঁজ নিয়ে আসতে বলো। একটা বেলার তো ব্যাপার। কাল সকালে যদি যায়, তা হলে বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে।'

'তু উকে বল ক্যানে। উর সনে তু-ও ঘুরে আসবি লাকি?'

তোমার মাথা খারাপ? দিদি যদি জানতে পারে, তা হলে আমায় কেটে ফেলবে।'

'ক্যানে? তুর দিদিমণি জুসেফকে পসন্দ করে লাই?'

প্রশ্নটা শুনে রুমালি মুখ নীচু করে ফেলল। ওর হতাশ মুখটা দেখে ফুলমণি সব বুঝে গেলেন। বাঁ-হাত দিয়ে রুমালির মুখটা সামান্য তুলে ধরে সস্নেহে বললেন, 'জুসেফকে তু ভালোবাসিস? আমায় বল ক্যানে। উ তুকে বিয়া করবে বলেইনছে? উরা ক্রিশ্চান, তু কি জানিস বিটি?'

রুমালি মুখ তুলে বলল, 'আমিও ক্রিশ্চান হয়ে যাব মাসি।'

'কী বুলছিস তু? তুর বাপ মানবেক?'

'দিদি যদি বলে, তা হলে মানবে। দিদি যা বলবে, বাবা তাই শুনবে। দিদির সঙ্গে তুমি একবার কথা বলবে মাসি?'

রুমালির আর্জি শুনে ফুলমণি হসে ফেললেন। মনে মনে বললেন, দাঁড়া আগে তোর দিদির একটা গতি করি, তার পর তোর কথা ভাবা যাবে। ক'দিন আগেই জুসেফকে নিয়ে কথা হচ্ছিল সোনামণির সঙ্গে। ভালো কোনও মেয়ে সন্ধানে থাকলে সোনামণি খোঁজ নিতে বলেছি। লেখাপড়া না জানলেও চলবে। দূরের কোনও গাঁয়ের মেয়ে হলে ভালো। চন্দ্রমুখীর সঙ্গে সবদিক মিল হয়ে যাচ্ছিল। কোত্থেকে মেয়েটার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী এসে জুটল। চন্দ্রমুখীকে দেখলেও জোসেফের এখন ভালো লাগবে না। রুমালির পিছনে হুলো বেড়ালের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর কথাই সোনামণিকে বলতে হবে, চন্দ্রমুখীকে ভুল গিয়ে।

খাওয়া শেষ করতেই বেলা আড়াইটা বেজে গেল ফুলমণির। এখনই বেড়িয়ে না পড়লে সন্ধের আগে আদিবাসী বস্তি থেকে ফিরতে পারবেন না। শীতের বেলা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে। ভাত ঘুমের কথা ভুলে গিয়ে ফুলমণি পোশাক বদলে নিলেন। বস্তিতে মিনিট পঁচিশ তো লাগবেই। ওখানে ঘণ্টাখানেক থাকলে বেলা সাড়ে চারটের মধ্যে তা হলে ফিরে আসতে পারবেন তিনি। জানা ভীষণ জরুরি, বুধিরামের বেঁচে ওঠাটা বস্তির লোক কীভাবে নিয়েছে? ওখানে কয়েকটা লোক আছে, একেবারে বজ্জাত। খালি হাসপাতালের বদনাম করে, লোক খেপায়। আরে, মরা-বাঁচা কি ডাক্তারের হাতে? ও তো মারাংবুরুর ইচ্ছেয় হয়। কেউ মারা গেলে হাসপাতালের দোষ দিয়ে কী লাভ? ইদানীং বস্তির কিছু লোক অবশ্য হাসপাতালের উপর খেপে আছে বাপটু কিস্‌কুর কুকীর্তির জন্য। কিন্তু, তাকেও তো মারাংবুরু শাস্তি দিয়েছেন। এমন শাস্তি, যা কেউ ভাবতেও পারবে না।

রান্নাঘরে বাসনগুলো মেজে নিচ্ছে রুমালি। উঁকি মেরে ফুলমণি বললেন, 'ও বিটি, বস্তি থেইকে মো ঘুরে আসনছি। সাবধানে থাকিস।' আর কোনও কথা না বলে... উঠোনে দাঁড় করানো সাইকেলটা টেনে নিয়ে ফুলমণি কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলেন।

হাসপাতাল থেকে পাহাড়ের ঢালে আদিবাসী বস্তিতে যাওয়ার পথে, দু'পাশে তিন-চারটে গ্রাম পড়ে। তারই একটা...কলাবনীতে মায়ের বাড়ি ফুলমণির। সেই কলাবনীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মায়ের কথা মনে পড়ল ফুলমণির। মা মারা গিয়েছেন বছর চারেক আগে। গ্রামের বাড়িতে এখন তাই কেউ থাকে না। প্রতি বছর টুসু উৎসবের সময় এক সপ্তাহের জন্য সেখানে যান ফুলমণি। তার আগে হাসপাতালের কোনও এক ঝাড়ুদারকে পাঠিয়ে বাড়িটাকে বাসযোগ্য করে নেন। আশাপাশে অত্মীয়স্বজন যাঁরা থাকেন, তঁদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ হয় তখন। তিরিশ বছর আগে নার্সের ট্রেনিং নিতে মা ওঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হাসপাতালের হোস্টেলে। পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন একটা দুর্ঘটনার পর। ফুলমণির জীবনে ওই দুর্ঘটনাটা না ঘটলে হয়তো কোনওদিন নার্সের ট্রেনিং নেওয়া হত না।

রাস্তার ধারে ধানখেত। বিজলি বাতির লাইন গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে ধানখেতের মাঝখান দিয়ে। স্মৃতিমেদুর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সিস্টার ফুলমণি। গ্রামের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওই তো গির্জার চুড়ো দেখা যাচ্ছে। ক্রিসমাসের সময় ফাদারের কাছে চকোলেট আর লজেন্স পাওয়ার লোভে ওঁরা... ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা গির্জার কাছে ঘুরঘুর করতেন। সেই সময় ক্রিসমাস জিঙ্গল শুনতে খুব ভালোবাসতেন ফুলমণি। মা তখনও লংম্যান সাহেবের কোয়ার্টারে রোজ কাজ করতে যেত। সাহেবের বাড়িতে যেদিন পার্টি থাকত, সেদিন মা আর গ্রামে ফেরার সময় পেত না। পরদিন ফিরত সুন্দর সুন্দর কেক আর সুস্বাদু খাবার নিয়ে। গ্রামের লোকেরা আড়ালে আবডালে মায়ের সম্পর্কে বলত, লংম্যান সাহেবের রক্ষিতা।

ফুলমণি অবশ্য কোনওদিন এ নিয়ে মাথা ঘামাননি। তবে, লংম্যান সাহেবের অতিরিক্ত স্নেহ দেখে তিনিও মাঝে মাঝে ধন্দে পড়তেন। সেটা অবশ্য প্রকট হয়ে পড়েছিল, সে বার মাদার টেরিজা থ্যালাসেমিয়া ওয়ার্ড উদ্বোধন করতে এলেন, সে বার। মঞ্চে মাদারের গলায় মালা পরিয়ে দেবেন কে? লংম্যান সাহেব জিদ ধরে বসলেন, ফুলমণি। লংম্যান সাহেবের পক্ষপাতিত্ব অনেকেরই পছন্দ হয়নি। কিন্তু, লংম্যান সাহেবের বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন কে? ওই ফুলের মালাই পরে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় ফুলমণির জীবনে। এখনও স্পষ্ট মনে আছে সেই দিনটার কথা। মঞ্চে বসে আছেন মাদার টেরিজা আর ব্যানার্জি সাহেব। তখন সদ্য যুবা ব্যানার্জি সাহেব, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার। পরনে নতুন লাল-হলুদ ডোরা শাড়ি, খোঁপায় জুঁই ফুলের মালা। ফুলমণি প্রথমে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেছিলেন মাদার টেরিজাকে। তার পর কে যেন বলেছিল, পাশের মানুষটার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিতে। তখন কে জানত, পরপুরুষকে মালা পরানোর জন্য ফুলমণি ব্রাত্য হয়ে যাবেন আদিবাসী সমাজে?

মা বিয়ের উদ্যোগ নিতেই গ্রামে ফিসফাস শুরু হয়ে গিয়েছিল, পরপুরুষকে একবার মালা পরিয়েছে, এ মেয়ের বিয়া হয়ে গিয়েছে। বিয়ের সম্বন্ধ এলেই গ্রামের লোক ভাঙচি দিত। পুরুলিয়া থেকে এক স্কুল টিচার পাত্র পছন্দ করে গেলেন, কিন্তু মাকে, ছেড়ে অতদূরে যেতে চাননি ফুলমণি। তখন সবে নার্সের চাকরি পেয়েছেন

হাসপাতালে। চাকরি ছেড়ে পুরুলিয়া যাবেন কী করে? ওই সময় মা চোখে অন্ধকার দেখেছিল। বিয়া হয়ে যাওয়ার কথাটা লোকের মুখেমুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল। ব্যানার্জি সাহেবের কানেও পৌঁছেছিল। একদিন তিনি নিজেই এলেন দেখা করতে। প্রথম দেখাতেই প্রেম। তিন বছর ধরে সেই উদ্দাম প্রেম অনুভব করেছেন ফুলমণি। তারপর চাকরির নিয়মেই বদলি হয়ে শিসপাহাড়ি থেকে চলে গেলেন ব্যানার্জি সাহেব। পরে মাতাল জঙ্গল হেমব্রমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ফুলমণির। সেই বিয়ে সুখের হয়নি।

ব্যানার্জি সাহেবের কথা মনে পড়লে এখন সিস্টার ফুলমণির বুকটা আনন্দে ভরে যায়। এমন হয় না? মারাংবুরু ফের ব্যানার্জি সাহেবের সঙ্গে ওঁকে মিলিয়ে দেবেন? প্রার্থনায় মরা স্বামীকে যদি পদ্মমণি বাঁচিয়ে তুলতে পারে, তা হলে প্রার্থনা করে তিনিই বা কেন ব্যানার্জি সাহেবকে ফিরে পাবেন না? কিন্তু, উনি কি ফিরে আসবেন? হয়তো স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সুখে রয়েছেন এখন। কেন তাঁর জীবনে ফের নতুন করে পেরেম-পীরিতের ঢেউ তোলা? না না, করা উচিত হবে না। মনে মনে কথাটা বলেই সিস্টার ফুলমণি ফের বস্তির দিকে সাইকেল চালালেন।

খানিকটা এগোনোর পরই ফুলমণি দেখলেন মোটর বাইকে করে উল্টোদিক থেকে আসছেন শিসপাহাড়ি থানার এস আই সুবোধ হাজরা। দিন চারেক আগে এই অফিসারই হাসপাতালে গিয়েছিলেন সুরপতি মাইতির মৃত্যুর তদন্ত করতে। ফুলমণিকে দেখে বাইক থামিয়ে উনি বললেন, 'আপনি হাসপাতালের নার্স, তাই না? হাসপাতালে আপনি তো আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?'

সাইকেল থামিয়ে ফুলমণি বললেন, 'হ্যাঁ, তুকে চিনতে পেরেইনছি। ইনভেস্টিগেশন করে কিছু পেয়েছিস বাপ?

'ম্যাডাম, একটা খারাপ খবর আছে।'

শুনে বুকটা ধক করে উঠল ফুলমণির, 'খারাপ খবর? কী হইনছে?'

'শিসপাহাড়ি জংশনে দুটো আনকনসাস বডি পাওয়া গিয়েছে কাল ভোরে। অ্যাকসিডেন্ট কেস বলে মনে হচ্ছে। দু'জনেই আপনাদের হাসপাতালের ডাক্তার, একজন ডাক্তার পাণ্ডু। অন্যজন কুন্তী মহাপাত্র। বডি দুটো এখন রেল পুলিশের জিম্মায় আছে, ওখানে গিয়ে ওই দু'জনকে আইডেনটিফাই করতে হবে। রেল পুলিশ আমাদের খবর দিতে বলেছিল। ভালোই হল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

খবরটা শুনেই মাথা ঘুরে গেল সিস্টার ফুলমণির। সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে কোনওরকমে তিনি নিজেকে সামলালেন।

১৮

পায়েস খাইয়ে দিতে দিতে মা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে, কুন্তী বলে মেয়েটা কে রে?'

আচমকা প্রশ্নটা শুনে পাণ্ডু বিষম খেল। মুক্তি সোপানের বাইরে বেরিয়ে আসার পর থেকে একবারও ওর কুন্তীর কথা মনে পড়েনি, মায়ালোকে কুন্তীর মায়ের সঙ্গে যে ওর

দেখা হয়ে যাবে, পাণ্ডু ভাবতেও পারেনি। ভদ্রমহিলা ওকে চিনলেনই বা কী করে, সে প্রশ্নেরও ও উত্তর পায়নি। দায়সারা উত্তর দিয়ে ও মায়ের সঙ্গে চলে এসেছিল। ও জানত, মা কোনও না কোনও সময় কুন্তী প্রসঙ্গ তুলবেই। বিশদভাবে জানতে চাইবে, কুন্তী মেয়েটা কে? কিন্তু, সেই মুহূর্তটা যে এত তাড়াতাড়ি আসবে, কে জানত? মায়ের প্রশ্নটা শুনে...একটু সময় নেওয়ার জন্যই ও খুব কাশতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে মা ফের বলল, 'উফ্, ছেলেমানুষের মতো কী যে করিস? তাড়াহুড়ো করে খাওয়ার অভ্যেসটা তোর পালটাল না।'

মায়ের এই গোয়েন্দাগিরির অভ্যাসটা আর বদলাল না। ছোটবেলায় ওর সঙ্গে নতুন কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই মা মেলা প্রশ্ন শুরু করে দিত। ওকে এমন আগলে রাখত যে, ক্লাস টেন পর্যন্ত রোজ মা স্কুলে পৌঁছে দিয়েছে। বন্ধুরা সবাই হাসাহাসি করত তা দেখে। স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে সুরো ছাড়া আর কাউকেই মা বিশেষ পছন্দ করত না। আড়ালে সুরোর কাছ থেকে খবর নিত, পাণ্ডু কারও সঙ্গে বেশি মেশামেশি করেছ কি না। বিশেষ করে, কোনও মেয়ের সঙ্গে। ওদের স্কুলে সুচন্দ্রা বলে একটা মেয়ে পড়ত। ক্লাস টুয়েলভে স্কুল থেকে ফেরার পথে রিকশা দাঁড় করিয়ে মেয়েটা ওর সঙ্গে একদিন কথা বলেছিল। সেদিন সন্ধেবেলায় মা খুব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁরে, যে মেয়েটা সাহেববাঁধের কাছে আজ তোর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল, সে কে রে?'

পাণ্ডু অনেক চেষ্টা করেও সেদিন বুঝতে পারেনি, সুচন্দ্রার কথা মা জানতে পেরেছিল কী করে? সুচন্দ্রা ওর ক্লাসে পড়ে শুনে মা খুব বকাবকি করেছিল। কিন্তু, কথায় কথায় পাণ্ডু যখন বলেছিল, সুচন্দ্রা সেবা নার্সিং হোমের মালিক ডাঃ বুদ্ধদেব লাহিড়ির মেয়ে, তখন মা চুপ করে গিয়েছিল। অনেক পরে বলেছিল, 'আর যেন কোনওদিন না শুনি, রাস্তা-ঘাটে দাঁড়িয়ে কোনও মেয়ের সঙ্গে গল্প করেছিস। কথা বলতে হলে বাড়িতে এলেই তো পারে। ওদের বাড়ি এমন কিছু দূরে নয়।'

সুচন্দ্রার সঙ্গে বাইরে গল্প করা মা অবশ্য আটকাতে পারেনি। ওদের সম্পর্কটা গভীর হয়ে গিয়েছিল দু'জনে একই সঙ্গে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর। সে অনেক পরের কথা। মায়ের কাছে বকুনি খাওয়ার পরদিন স্কুলে এই সুচন্দ্রাই হাসতে হাসতে বলেছিল, 'উফ্ পাণ্ডু, তুই এত সাদাসিধে কেন বল তো? আমি যে তোর সঙ্গে কথা বলছি, মাসিমা সেটা জানল কী করে, তুই বুঝতে পারলি না? আরে বোকা, নিশ্চয়ই রিকশাওয়ালার কাছে খবরটা পেয়েছিল। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ, হয়তো রোজই ও রিপোর্টারের কাজটা করে।'

কাশতে কাশতে বহু বছর পর পাণ্ডুর মনে পড়ল সুচন্দ্রার কথা। ধনী পরিবারের মেয়ে, ডাক্তারি পাস করে ও চলে গিয়েছিল লন্ডনে। জেনোট্রান্সপ্লানটেশন নিয়ে পড়াশুনো করতে। প্রথম প্রথম কিছুদিন মেল করে খোঁজখবর নিত। পাণ্ডু শিসপাহাড়িতে চলে যাওয়ার আগে মাত্র একবারই সুচন্দ্রা পুরুলিয়ায় এসেছিল। তারপর থেকে ওদের মধ্যে আর কোনও যোগাযোগ নেই। নিশ্চয় বিয়ে-থা করে এখন লন্ডনেই রয়ে গিয়েছে। ওর

মতো সামান্য এক ডাক্তারের সঙ্গে সুচন্দ্রা সম্পর্ক রাখবেই বা কেন? কাশি থামার পর সুচন্দ্রার মুখটা পাণ্ডুর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। এই সময় মা ফের প্রশ্ন করল, 'কই বললি না তো, কুন্তী মেয়েটার সঙ্গে তোর আলাপ হল কী করে? ওর মা হরিপ্রিয়ার কথা শুনে তো মনে হল, তোর খুব ঘনিষ্ঠ।'

বলার আগে পাণ্ডু ঠিক করে নিল, মায়ের কাছে কিছু লুকোবে না। আর গোপন করে লাভটাই বা কী? কুন্তীর মাকে ও বলেছিল, মুক্তি সোপানেই ওরা আলাদা হয়ে গিয়েছে। তার পর কী হয়েছে, ও জানে না। কিন্তু, মাকে পাণ্ডু সব খুলে বলল। শিসপাহাড়ি হাসপাতালে পরিচয় হওয়া থেকে আত্মাবাহী ট্রেনে করে মুক্ত সোপানে পৌঁছনোর মধ্যে যা কিছু হয়েছে, সব কথা। শুনে মা, বলল, 'তুই কি সত্যিই মেয়েটা খুব ভালোবাসিস বাবা?'

পাণ্ডু বলল, 'হ্যাঁ মা। কুন্তী খুব ভালো মেয়ে।'

'তা হলে দাঁড়া। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি, ও এখন কোন লোকে আছে। মায়ালোকে এমন কয়েকজন আছেন, যাঁরা সব লোকে যাতায়াত করেন। তাঁদের কাউকে বললে মেয়েটার খোঁজ পাওয়া যাবে। ইহলোকে তো ছেলের বউ নিয়ে আমার ঘরসংসার করা হল না। দেখি, এখানেই, তোদের চার হাত এক করে দিতে পারি কি না? মেয়েটাকে তোর এত পছন্দ হল কেন রে? তোকে রূপে ভোলায়নি তো?'

'না মা, হাসপাতালে ওকে দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি। ভালো পরিবারের মেয়ে। তা ছাড়া, খুব কেয়ারিং। দেখলে তোমারও পছন্দ হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তাই হয় বাবা। আজকালকার মেয়েদের সম্পর্কে যা শুনি, তাতে ভয় হয়। তোর জীবন যেন মেয়েটা অতিষ্ঠ করে না তোলে। অবশ্য এখানে হরিপ্রিয়াকে আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয় ওর মেয়ে ভালোই হবে। খুব পুণ্যি করে এসেছে হরিপ্রিয়া। মায়ালোকে ওর থাকার কথা নয়। এতদিনে ওর ভক্তিলোকে চলে যাওয়ার কথা। শুধু বর আর মেয়ের মায়া কাটাতে পারছে না বলে এখনও এখানে রয়ে গিয়েছে।'

পায়েস খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। আঁচল দিয়ে মা মুখ মুছিয়ে দিল ছোটোবেলার মতো। সেই ফাঁকে পাণ্ডু জিজ্ঞেস করল, 'এই মায়ালোকে কারা থাকেন মা?'

মা বলল, 'এখানে কিছুদিন থাকলেই তুই বুঝতি পারবি, কারা থাকে এবং কেন? মায়ালোকে ভগবান পরীক্ষা নেন বাবা। আমরা মূঢ়মতিসম্পন্ন সব মানুষ। ইহলোকে ঈশ্বর ভজনা না করে স্বামী-সন্তান নিয়ে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি। দেহত্যাগ করে আসার পরও, আমরা অনেকে সেই বন্ধন ছিঁড়ে চলে আসতে পারি না। পিণ্ডদান হলে অবশ্য এমনিতেই বন্ধন কেটে যায়। তাতে আত্মার শান্তি হয়। তোরা... এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তো পিণ্ডদানের গুরুত্বটাই জানিস না। বা কখনও শ্রীমদ্ভাগবতগীতার পাতা ওলটাসনি। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা পড়লে বুঝতে পারতি।'

'কী লেখা আছে মা শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়?'

'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে অর্জুন দেখলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে যাঁরা

দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা সবাই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। যুদ্ধে জিততে হলে, নিকটাত্মীয়দের মেরে ফেলতে হবে। অর্জুনের তখন মনে হল, এ আমি কী করছি? তখন উনি যুদ্ধে অস্বীকার করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের রথের সারথি। তৃতীয় পাণ্ডব যুদ্ধ না করলে দুর্যোধনদের হারানো যাবে না। তাই বিপদ বুঝে শ্রীকৃষ্ণ তখন ওঁকে বোঝাতে শুরু করেন। কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে বোঝানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন, সে সব কথাই মদ্ভাগবতগীতায় লেখা আছে। একটা শ্লোক তোকে শোনাই বাবা। সেটাই জাগতিক মুক্তির সার কথা। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি...তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।'

মায়ের মুখে শুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত শ্লোক শুনে পাণ্ডু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মা এখন কথায় কথায় ভগবানের কথা বলছে। অথচ বাবা মারা যাওয়ার পর মা ভগবানে বিশ্বাসই করত না। ছোটোবেলায় পাণ্ডু দেখেছে, ওদের বাড়িতে ঠাকুর দেবতার ছবি পর্যন্ত ছিল না। একবার ও বাড়িতে সরস্বতী পুজোর কথা তুলেছিল বলে মা খুব রেগে গিয়েছিল। বলেছিল, 'তুই পড়াশুনো না করলে সরস্বতী ঠাকুর তোকে পাশ করাতে আসবে না। পুজো-আচ্চায় সময় নষ্ট না করে মন দিয়ে পড়।' ফলে সরস্বতী পুজোর দিন পাণ্ডুকে হয় স্কুলে যেতে হত, নয়তো সুরোদের বাড়িতে। খুব ধুমধাম করে তখন সরস্বতী পুজো হত সুরোদের বাড়িতে। কিন্তু, বছর শেষে স্কুলে ফার্স্ট হত পাণ্ডুই। তখন মা বলত, 'দেখলি তো...অত পুজো করেও সুরোর কোনও লাভ হল না।'

সেই মা কত বদলে গিয়েছে। মা বলত, মানুষই হল ভগবান, বুঝলি। মানুষের সেবা করতে পারলেই ভগবানের সেবা করা হয়ে যাবে। ও যাতে মানুষের সেবা করতে পারে, সেজন্য মা ওকে ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়েছিল। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ভালো রেজাল্ট করতে না পারলে অবশ্য পাণ্ডুর পক্ষে ডাক্তারি পড়া সম্ভবই হত না। পাণ্ডু দেখেছে, দুর্গা পুজোর সময় মা গ্রামের বাড়িতে চলে যেত। গ্রামের গরিব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করত। কিন্তু, কখনও বারোয়ারি পুজোয় চাঁদা দিত না। সুরোর মা মঝে মাঝেই পাণ্ডুকে জিজ্ঞেস করত, 'তোর মা এত নাস্তিক কেন রে?' পাণ্ডু মাকে কার্ল মার্কসের দাস ক্যাপিটাল-এর বাংলা তর্জমা পড়তে দেখেছে। তখন বামপন্থীদের যুগ। ওইসব-বই যত্রতত্র পাওয়া যেত। কিন্তু, মায়ের হাতে কখনও মদ্ভাগবতগীতা দেখেনি।

ওর চোখ-মুখে অবাক হওয়ার চিহ্ন দেখে মা বলল, 'কী রে, কিছু বুঝতে পারলি?'

পাণ্ডু বলল, 'না মা। এতদিন ডাক্তারি বই পড়ে এসেছি। সংস্কৃত শ্লোক বুঝব কী করে?'

'খুব সহজ রে। মানেটা হচ্ছে, মানুষ যেমন পুরোনো পোশাক ছেড়ে একটা সময় নতুন পোশাক পরে, তেমনই আত্মা জরাজীর্ণ দেহ ছেড়ে অন্য নতুন দেহ গ্রহণ করে। তবে মধ্যবর্তী এই সময়টায় আত্মার খুব কষ্ট হয়।'

'আত্মা কী মা?'

'আত্মা হচ্ছে অবিনশ্বর। আত্মার কখনও নাশ হয় না। আত্মা ছেদন করা যায় না। আত্মাকে দহন করাও যায় না। আত্মা হচ্ছে নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থিরস্বভাবের, অচল, ও সনাতন। গীতায় আছে, অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যো ক্লেদ্যোঽ শোষ্য বে চ...নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ। এই সব কথা শ্রীকৃষ্ণ কেন অর্জুনকে বলেছিলেন জানিস? তুমি যাঁদের হত্যা করে পাপ করার কথা ভাবছ, আসলে তাঁদের মৃত্যু হচ্ছে না। তাঁর এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন। তাই তাঁদের জন্য বৃথা শোক কোরো না। থাক বাবা, একদিনে এত তত্ত্বকথা তোর মাথায় ঢুকবে না। ডাক্তারি পড়ার সময় তুই শুধু দেহ নিয়ে পড়াশুনো করেছিস। দেহের মধ্যে যে বসবাস করে, সেই আত্মার কথা কেউ তোকে বলেনি। কয়েকটি দিন এখানে থাক। তা হলেই আত্মার মাহাত্ম্য বুঝতে পারবি। কুন্তীর মা...হরিপ্রিয়া মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। আমার থেকেও ও আরও ভালো জানে। তাই আমার থেকেও ও বেশি আনন্দে আছে।'

'তুমি কি খুব আনন্দে আছ মা?'

'নিশ্চয়ই। কেন, আমাকে দেখে কি তুই বুঝতে পারছিস না? এতদিন তোর মায়া আমি কাটাতে পারছিলাম না। এইবার সেই বন্ধনটা কেটে যাওয়ার সময় এসেছে। আমাকে হয়তো এ বার ভক্তিলোকে চলে যেতে হবে। এইভাবে এক লোক থেকে অন্য লোকে ঘুরতে হবে, যতদিন না আবার জন্ম নিই।'

'তবে যে এই একটু আগে বললে, এক দেহে ছেড়ে অন্য দেহ গ্রহণ করার আগে আত্মাদের খুব কষ্ট হয়।'

'হয় তো। কিন্তু, তুই কতটা কষ্ট পাবি, সেটা নির্ভর করে দেহে থাকার সময় তুই কতটা জগৎহিতায়ে কাজ করেছিস, তার উপর। ইহলোক ত্যাগ করার পর আগে যমালয়ে গিয়ে আত্মারা খুব কষ্ট পেত। কিন্তু, নচিকেতা যমরাজার কাছ থেকে বর পাওয়ার পর আত্মারা এখন অনেক সুখে আছে।'

পাণ্ডু জিজ্ঞেস করল, 'নচিকেতা কে মা?'

'নচিকেতা হলেন রাজা বাজশ্রবার ছেলে। স্বর্গে যাওয়ার জন্য একবার রাজা বাজশ্রবা এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। ব্রাহ্মণদের ডেকেই তিনি ধনরত্নদান করতে থাকেন। ওই যজ্ঞের সময় নচিকেতা তখন নেহাতই বালক। দানপর্বের শেষদিকে নচিকেতা দেখলেন, রাজা বাজশ্রবা এক ব্রাহ্মণকে বৃদ্ধ গোরু দান করছেন। দেখে তাঁর খুব খারাপ লাগল। বাবাকে তিনি বললেন, "এবার আমাকে দান করুন।" কিন্তু, বাজশ্রবা তাতে কান দিলেন না। নচিকেতা তৃতীয়বার একই অনুরোধ করায় বাজশ্রবা রেগে গিয়ে বললেন, "তোমাকে আমি যমের হাতে দান করলাম।" বলেই রাজার মনে হল, এ তিনি কী করলেন!'

'সত্যি সত্যি নচিকেতা যমলোকে গেলেন?'

'উপায় কী। নচিকেতা যখন যমলোকে গেলেন, তখন দেখলেন যমরাজ সেখানে নেই। কী একটা কারণে তিনি তিনদিনের জন্য স্বর্গলোকে গিয়েছেন। নচিকেতা তিনরাত্র

যমলোকে কাটালেন উপবাস করে। এর পর ফিরে এসে নচিকেতাকে দেখে যমরাজের খুব খারাপ লাগল। তার বাড়িতে একজন তিনদিন ধরে অভুক্ত আছেন বলে। তখন তিনি নচিকেতাকে বললেন, "তুমি তিনদিন আমার ঘরে অনাহারে আছ। সেইজন্য আমার কাছ থেকে তুমি তিনটি বর প্রার্থনা করো।"...'

'নচিকেতা কী বর চাইলেন মা?'

'নচিকেতা বললেন, "যমলোকে আমি কেমন আছি তা জানার জন্য বাবা খুব চিন্তায় আছেন। আপনি তাঁর সেই চিন্তা দূর করে দিন। আর আমাকে এমন বর দিন যাতে, উনি আমার উপর আগের মতো সন্তুষ্ট থাকেন।" যমরাজ বললেন, 'তথাস্তু।" এরপর দ্বিতীয় বর। নচিকেতা বললেন, 'ভবিষ্যতে যাঁরা পরলোকে আসবেন, তাঁদের যেন ইহলোকবাসীর মতো ক্ষুৎপিপাসা, জরা, বা শোকগ্রস্থ হতে না হয়। তাঁরা যেন সুখে আর আনন্দে থাকেন।" যমরাজ তাঁকে এই বরটাও দিলেন। এর পর তৃতীয় বরটা নিয়ে অবশ্য গণ্ডগোল বাঁধল।'

'গণ্ডগোল বাঁধল কেন মা? কী বর চেয়েছিলেন নচিকেতা?'

'যমরাজকে নচিকেতা বললেন, "মৃত্যুর পর কেউ বলেন জীবাত্মা আছেন। কেউ বলেন, নেই। আপনি এই সন্দেহটা দূর করে দিন।" যমরাজ কিছুতেই উত্তর দিবেন না। উনি অনেক ধনরত্ন প্রলোভন দেখালেন। কিন্তু, নচিকেতা নিতে রাজি নন। শেষে যমরাজ খুশি হয়ে নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করলেন। এ সব লেখা আছে কঠোপনিষদে।'

'কিন্তু মা, আমি যে প্রশ্নটা করলাম, তার উত্তর তো দিলে না।'

'সেই উত্তরটাই তো দিতে যাচ্ছিলাম বাবা। যে কারণে নচিকেতার প্রসঙ্গ আনতে হল। এ বার উত্তরটা শোন। যমরাজের কাছ থেকে নচিকেতা দ্বিতীয় বরটা চেয়েছিলেন বলেই আমরা মায়ালোকে ভালো আছি। যা চাই, যখন চাই, যেভাবেই চাই না কেন, হাতের কাছে সবকিছু পেয়ে যাই। তুই তো চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছিস, কষ্টের কোনও চিহ্নই নেই এখানে।'

'দেহত্যাগ করার পরও ইহলোকে কিছু আত্মা থেকে যায় কেন মা?'

'ওই যে তখন তোকে বললাম। বন্ধন কাটাতে পারে না। এখানে এসেও কেউ কেউ ইহলোকে যাতায়াত করে। প্রিয়জনেরা কেমন আছে, দেখতে চলে যায়। এই যেমন, তোর কুন্তীর মা হরিপ্রিয়া। ও মাঝে মাঝেই ইহলোকে চলে যায় ওর স্বামী আর মেয়েকে দেখতে। ওকে আমরা সবাই বোঝাই, মায়া কাটাও। আমাদের কথা হরিপ্রিয়া শোনেই না। যাক গে, অনেক কথা হল। তুই এবার একটু বিশ্রাম নে। পরে তোকে মায়াসাগর দেখাতে নিয়ে যাব।'

বলেই মা উঠে পড়ল। পাণ্ডু এবার বুঝতে পারল, কুন্তীর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা হরিপ্রিয়া জানতে পেরেছেন কী করে!

ভ্রূণলোক জায়গাটা যে এত বড়ো, সে সম্পর্কে কুন্তীর কোনও ধারণাই ছিল না। মুক্তি সোপানে মহর্ষি ক্রতু বলে দিয়েছিলেন, কুমারী অবস্থায় ও যে ভ্রূণকে হত্যা করেছিল, তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সে ক্ষমা না করলে মুক্তি পাওয়ার কোনও উপায় নেই। ভ্রূণলোকে সেই ভ্রূণকেই কুন্তী এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওর মনে আছে, কটকের নার্সিংহোমে গর্ভপাত করার পর একটা প্লাস্টিকের বালতিতে ভ্রূণটা ফেলে দিয়েছিলেন চপলাদি। সারা দিন হয়তো ওখানেই রক্তমাংসের দলা হয়ে পড়েছিল অন্য বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে। বিকেলের দিকে ক্লিনাররা সম্ভবত ফেলে দিয়েছিল আবর্জনার গাড়িতে। সমস্যা হচ্ছে, সেই ভ্রূণ যদি সত্যিই ভ্রূণলোকে এসে থাকে, তা হলে তাকে কুন্তী তাকে চিনবেই বা কী করে?

নার্সিংহোমে দিনে কম করে দুটো এমটিপি-র কেস আসত। মানে মেটারনাল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি। কুমারী মেয়েদের জন্য ছিল একরকম রেট। আর বিবাহিতাদের জন্য অন্যরকম। গোপনে এসব করা হত। চপলাদি এমটিপি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, কোনও কোনওদিন বিশ্রাম নেওয়ার সময় পর্যন্ত পেতেন না। মাঝে মাঝে উনি কুন্তীকে বলতেন, 'আর পারছি না গো। আমি কি শুধু এই কাজটা করার জন্যই ডাক্তারি পড়েছিলাম?' সেই সময় কুমারী মেয়ে আর তার আত্মীয়-স্বজনদের চোখ-মুখ দেখে করুণা হত কুন্তীর। লোকলজ্জার ভয়ে তাঁরা সিঁটিয়ে থাকত। তখন কুন্তী স্বপ্নেও ভাবেনি, ওকেও একদিন অ্যাবরসন বেড়ে উঠতে হবে।

রোজ ডিনার করার সময় চপলাদির সঙ্গে দেখা হত কুন্তীর। খাওয়ার ফাঁকে নার্সিংহোম নিয়ে কথা উঠলে দু'জনেই ক্ষোভ উগড়ে দিত। কখন ও কখনও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের আলোচনাও হত। চপলাদির স্বামী হরপ্রসাদ শতপথী র‍্যাভেনশ কলেজের প্রোফেসর। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তখন চপলাদি কোনও সম্পর্ক রাখতেন না। দু'জনের সেপারেশন পর্ব চলছিল। ভদ্রলোকের ছবি কুন্তী একদিন দেখেছিল কলিঙ্গ সংবাদে। উনি কী যেন একটা পুরস্কার পেয়েছিলেন কাব্যগ্রন্থ লিখে। কাগজে খবরটা পড়ে সেদিন চপলাদি...স্বামী সম্পর্কে সেই একবারই ওর সামনে কটূক্তি করে ফেলেছিলেন, 'ইম্পোটেন্ট বাস্টার্ড।' শুনে চমকে উঠেছিল কুন্তী। ওঁদের দাম্পত্য জীবনে সংঘাতের কারণটা সেদিনই ও বুঝতে পেরেছিল।

নার্সিংহোম থেকে কুন্তী যেদিন বেরিয়ে আসে, সেদিনই শেষ দেখা ওঁদের মধ্যে। না, ওকে অজ্ঞান করার দরকার হয়নি সেদিন চপলাদির। সাকশন দিয়েই উনি টেনে বের করেছিলেন অনুপমের পাপ। বের করার সময় মারাত্মক যন্ত্রণাবোধ করেছিল কুন্তী। মনে হয়েছিল, চপলাদি ওর নাড়ি ছিড়ে নিচ্ছেন। যোনির ভেতরটা ওয়াশ করে একটা পেন কিলার ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন চপলাদি। তার পর গ্লাভস খুলে বলেছিলেন, 'ঘণ্টা তিনেক শুয়ে থাকতে হবে তোকে। তার পর কী করবে, সেটা ঠিক কোরো।'

সেই দৃশ্যটা বহুদিন পর্যন্ত ওর চোখের সামনে ভাসত। রক্ত-মাংসের কুণ্ডলীটা প্লাস্টিকের বালতিতে ছুড়ে ফেলেছিন চপলাদি। বিড় বিড় করে কী বলেছিলেন, সেটা

শুনতে পায়নি কুন্তী। কিন্তু, সেই সময় ওর চোখমুখে যে ঘৃণার ছাপটা দেখেছিল, তা বহুদিন ও ভুলতে পারেনি। তখন কি কুন্তী জানত, ওই রক্তমাংসের ডেলার কাছে একদিন ওকে ক্ষমা চাইতে হবে? ভ্রূণলোকে না এলে ও অনেক কিছুই জানতে পারত না। ইহলোকে যা কিছু ঘটে... জেনে বা না-জেনে মানুষ যা কিছু করে, তার রেশ টানতে হয় পরলোকে এসে। ইহলোকেই এটা যদি মানুষ জানত, তা হলে অন্যায় কোনও কাজই করত না। ভ্রূণলোকে ওরা সবাই এ ব্যাপারে একমত।

এখানে আসার পর থেকে কুন্তীর অনেক সই জুটে গিয়েছে। অনুরাধা, পারুল, মাধবীলতা, বকুল, সুপ্রিয়া...এমন অনেকে। প্রত্যেকেই ইহলোকে কোনও না কোনওভাবে ভ্রূণহত্যার সঙ্গে জড়িত। মাঝে মাঝেই ওরা সবাই মিলে গল্প করতে বসে। আগের জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প করে। সুযোগ পেলে কখনও কখনও একসঙ্গে ওরা ভ্রূণ খুঁজতে বেরোয়। ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কুন্তী জানতে পেরেছে, ভ্রূণরাও নাকি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বড়ো হয়। কথাটা যদি সত্যি হয়, তা হলে কুন্তীর সেই ভ্রূণের বয়স এখন চার বছর। এখন শিশু সন্তান, এই ভ্রূণলোকেরই কোনও প্রান্তে নিশ্চয়ই সে হেঁটে-চলে বেরাচ্ছে!

'কী ভাবচিস লো সই? সেই তখন থেকে দেখচি, চুপচাপ বসে আচিস।'

প্রশ্নটা শুনে কুন্তী চমকে সামনের দিকে তাকাল। দেখল, অনুরাধা খুব সেজেগুজে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গলায় নানা রঙের ফুল দিয়ে গাঁথা একটা মালা। চুলে বড় একটা পারিজাত ফুল। সমবয়সি এই মেয়েটা খুব সাজতে ভালোবাসে। একেক সময় সেটা পাগলামির পর্যায়ে চলে যায়। চট করে চপলাদির কথা মাথা থেকে সরিয়ে কুন্তী বলল, 'এখন বেরুচ্ছ নাকি? তা হলে একটু দাঁড়াও। আমি তৈরি হয়ে নিই।'

'না গো বেরুব নাকো। তোমার সঙ্গে গপ্প করার জন্য এলুম।'

কথাটা শুনে কুন্তী ফের বসে পড়ল। অনুরাধা নিজে যেচে এসে সই পাতিয়েছিল ওর সঙ্গে। বাংলা টিভি সিরিয়ালে নাকি অ্যাক্টিং করত। কুন্তী টিভিতে ওকে দেখেনি...প্রথম দিন একথা শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল অনুরাধা। বার তিনেক জিজ্ঞেস করেছিল, 'সত্যি আমায় দেকোনি? টিভিতে না দেকে থাকো তো, নিশ্চয় রাস্তায় হোর্ডিংয়ে দেখেচ?'

তিনবারই উত্তরটা একই রকম 'না' শুনে অনুরাধা একটি দমকে গিয়েছিল। আসলে বাংলা সিরিয়াল দেখার কখনও সুযোগ হয়নি কুন্তীর। ভুবনেশ্বর, কটক তার পর ওই শিসপাহাড়ি... এতদিন এই ছিল ওর জগৎ। কলেজ, হোস্টেল আর হাসপাতালে এত ব্যস্ত থেকেছে, টিভিতে খবর ছাড়া আর কিছু দেখার ইচ্ছে ওর হয়নি। কয়েকদিন মেশামেশির পর অনুরাধাকে ভালো লেগে গিয়েছিল কুন্তীর। মেয়েটা খুব সহজ সরল। স্ফটিকের একটা টুল এগিয়ে দিয়ে কুন্তী বলল, 'বোসো। তোমার সাজগোজ দেখে আমি ভাবলাম, আজ হয়তো অহল্যা মায়ের লেকচার শুনতে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছ। যাবে নাকি? শুনলাম, মাত্র একদিনের জন্যই উনি ভ্রূণলোকে এসেছেন। বকুল, পারুল, আর মাধবীলতাও যেতে চাইছে।'

অনুরাধা বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'ধুর, ও সব লেকচার শুনে হবেটা কী? অহল্যা মা-টা কে, তাই তো আমি জানিনে। কে বলো তো?'

অহল্যা মা সম্পর্কে কুন্তীও তেমন কিছু জানত না। রামায়ণ পড়ার সময় মা ওকে একবার বলেছিল, স্বামীর শাপে অহল্যা নাকি পাথর হয়ে পড়ে ছিলেন। মিথিলায় যাওয়ার পথে রামচন্দ্র সেই পাথরে পা ছোঁয়ান। আর তার পরই অহল্যা নাকি বেঁচে ওঠেন। এখানে মাধবীলতার মুখে অহল্যা মায়ের পুরো আখ্যানটা কুন্তী শুনেছে। অনুরাধাকে তাই ও বলল, 'অহল্যা ছিলেন ব্রহ্মার মানস কন্যা। অপরূপ সুন্দরী। তার মতো সুন্দরী সেই সময় পৃথিবীতে আর কেউ ছিলেন না।'

অনুরাধা ফুট কাটল, 'আমার থেকেও সুন্দরী ছিল নাকি?'

সে তুমি ওঁর কাছে গেলেই দেখতে পাবে। আগে বাকি আখ্যানটা শোনো, তার পর কথা বোলো। তা, এই অহল্যা মাকে ব্রহ্মা একবার গৌতম মুনির কাছে রেখে হিমশৈলে তপস্যা করতে চলে যান। এই কারণে তাঁকে গচ্ছিত রেখে যান, যাতে কোনও পুরুষ স্পর্শ করতে না পারেন। দীর্ঘদিন অহল্যা মা ছিলেন গৌতম মুনির আশ্রমে। একেবারে কুমারী অবস্থায়। গৌতম মুনি এমন সংযমী ছিলেন যে, তিনি ফিরেও তাকাতেন না অহল্যা মায়েক দিকে। সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা একটা সময় অহল্যা মাকে তুলে দিলেন গৌতম মুনির হাতে। ওঁদের এক সন্তানও হল...শতানন্দ। এদিকে, দেবরাজ ইন্দ্র বহুদিন ধরেই অহল্যা মায়ের রূপে মোহিত। উনি আশায় আশায় ছিলেন, ব্রহ্মা একদিন ওঁর হাতেই রূপসী অহল্যাকে তুলে দেবেন। কিন্তু গৌতম মুনির সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যাওয়ার পর ইন্দ্র আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না।'

'তোমার অহল্যা মাকে রেপ করলেন, তাই না?'

'তুমি কী করে জানলে?'

'একেবারে বাংলা বইয়ের স্ক্রিপ্ট। এরকমই হওয়ার কথা। একজন ভিলেন দরকার। না হলে নাটক জমবে কেন? যাক গে, সেই তুমি বলো লেকচারের অহল্যাকে ইন্দ্র কীভাবে রেপ করলেন?'

লেকচারের অহল্যা কথাটা শুনেই কুন্তীর হাসি পেয়ে গেল। অনুরাধা মেয়েটা আচ্ছা রসিক তো! হাসি চেপে ও বলল, 'এ নিয়ে অনেক মত আছে। কেউ বলেন, এক রাতে ইন্দ্র কামভাব চেপে রাখতে না পেরে গৌতম মুনির আশ্রমে গিয়ে হাজির হন। বাইরে থেকি উনি মোরগের গলায় ডেকে ওঠেন। মোরগের ডাক শুনে গৌতম মুনি জেগে উঠে ভাবলেন, ভোর হয়ে গিয়েছে। তাই শয্যাত্যাগ করে নদীতে স্নান করতে চলে যান। আর তারই ফাঁকে গৌতম মুনির রূপ ধরে অহল্যার বেডরুমে ঢুকে পড়েন ইন্দ্র। তাঁকে রেপ করেন।'

'ইন্দ্রটা আচ্ছা চালাক তো! গৌতম মুনি পরে বুঝতে পারেননি?'

'হ্যাঁ পেরেছিলেন। কেউ বলেন, রেপ্‌ড হওয়ার পর অহল্যা মা ইন্দ্রকে পালিয়ে যেতে বলেছিলেন। আর পালাতে গিয়ে ইন্দ্র ধরা পড়েন। অন্য মতে, গৌতম মুনিকে হঠাৎ ফিরতে দেখে ইন্দ্র...মার্জার মানে বিড়ালের রূপ নিয়ে আশ্রম থেকে বেরিয়ে যান।

তা দেখে গৌতম মুনি অহল্যা মায়ের কাছে জানতে চান, কেউ এসেছিল কি না। অহল্যা মা সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে বলেন, 'মার্জ্জার ছিল, চলে গিয়েছে।' যাতে মৎ-জার আর মার্জ্জার দুটো অর্থই বোঝায়। গৌতম মুনি কিন্তু মিথ্যেটা ধরে ফেলেছিলেন। তখনই উনি শাপ দেন, অহল্যা মাকে পাথর হয়ে পড়ে থাকতে হবে।'

'মুনির এ কী র'ম বিচার হল সই? যে লোকটা দুষ্কর্ম করল, সেই ইন্দ্রকে উনি কোনও শাপ দিলেন না কেন? আমি হলে তো শাপ দিতুম, যাতে ইন্দ্রর পেনিস খসে পড়ে।'

পেনিস শব্দটা শুনে কুন্তী হেসে বলল, 'ঠিক ও রকম না হলেও, গৌতম মুনি কিন্তু ওর কাছাকাছি একটা শাপ দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের দেহে সহস্র যোনির চিহ্ন ফুটে উঠবে। ক্রুদ্ধ হয়ে মুনি আরও শাপ দিয়েছিলেন, পৃথিবীতে এই যে ধর্ষণ শুরু হল, তা আর কোনওদিনই বন্ধ হবে না।'

'ওয়াও। তার মানে তুমি বলতে চাইচ, পৃথিবীর প্রথম রেপিস্ট হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। আর প্রথম রেপ ভিক্টিম আমাদের এই অহল্যা মা।'

'না সই, এখানেও কহানিতে একটু টুইস্ট আছে। কেউ কেউ বলেন, ইন্দ্র যখন ইন্টারকোর্স করেছিলেন, তখন অহল্যা মা তাঁকে চিনতে পারেন। তবুও উনি বাধা দেননি। তার মানে, মনের কোণে কোথাও ইন্দ্রর সঙ্গে সেক্স করার একটা ইচ্ছে তাঁর লুকিয়ে ছিল। এটা বুঝতে পেরে গৌতম মুনিও আরও খেপে যান। তার বউকে শাপ দেন পৃথিবীতে তুমি একাই আর রূপসী থাকবে না। অতঃপর তোমার মতো অসংখ্য রূপসী জন্মাবে এই পৃথিবীতে।'

'ভালো কাজই করেছিলেন। মনে হয়, আমার জন্ম হয়েছে সেই কারণেই।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল অনুরাধা। তার পর বলল, 'আমার মনে হয়, তোমার অহল্যা মা ইন্টারকোর্সের সময় প্রথম দিকে বুঝতে পারেননিকো। কিন্তু সেক্সচুয়াল হ্যাবিট বলে একটা কথা আছে। তার একটু ওদিক হলে তুমি ধরা পড়ে যাবে। সেক্স করার সময় অহল্যা হয়তো পরে বুঝতে পেরেছিলেন, ইন্দ্র আর যে-ই হোন, গৌতম মুনি নন। ওই, সময় তো উঠে পড়া যায় না। দেবরাজ বলে কতা! তাই আর বাধা দেননিকো। কী হয়েছিল, সেটা আমি বুঝতে পারচি সই। কেননা, আমার জীবনেও এ'রম ঘটনা ঘটেচে।'

পরিচয় হওয়ার পর থেকে অনুরাধা কখনও বলেনি, ভ্রূণহত্যার মতো পাপ করেছিল কেন? আজ নিজেই বলতে চাইছে দেখে কুন্তী জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকেও কি কেউ রেপ করেছিল?'

'ঠিক রেপ বলা যাবে কি না, আমি সিওর নইকো। সেদিন আমিও বুঝতে পারিনিকো। সবে অ্যাক্টিং ওয়ার্ল্ডে ঢুকেছি। টালিগঞ্জের সিনেমা পাড়ায় গিয়ে স্ট্রাগল করছি। কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেই বুঝে গ্যাচি, বেশি সতীত্ব দেখাতে গেলে পার্ট পাওয়া যাবে না। একজন ক্যামেরম্যান ছেল আমার গডফাদার। রোজ তার কাছে গিয়ে হত্যে দিতুম। দু'চারটে ছোটোখাটো পার্ট করার জন্য লোকে আমায় চিনতে শুরু করেছেল।

অ্যাক্টিংটা হল গে নেশা, বুঝলে। একবার ধরলে ছাড়া যায় নাকো। ক্যামেরাম্যানটা ছেল হুলো বেড়ালের মতো। সুযোগ পেলেই আমার বুকে হাত দিত। চুপ খাওয়ার চেষ্টা করত।'

'সে কী, তুমি বাধা দিতে না?'

'না, আমি বুঝে গেচিলুম, বাধা দিতে গেলে কোনওদিন পার্ট পাব না। একদিন ওই ক্যামেরাম্যানই এক ডিরেক্টরের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিল। সেই ডিরেক্টর কথা দিল, একটি সিরিয়ালে লিড রোল দেবে। তবে গল্পটা শোনার জন্য মিনসের সঙ্গে আমাকে টাকির এক গেস্ট হাউসে যেতে হবে। শুনে রাজি হয়ে গেলুম। প্রথম দিনই গল্প শোনানো শেষ। রাতে ডিরেক্টরের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। মদ খেয়ে এসে সে জোর করে আমায় বিচানায় শোয়াল। গোড়ার দিকে বাধা দিয়েছিলুম। কিন্তু খানিক পর হঠাৎ মনে হল, বাহ শরীর থেকে এমন সুখকও পাওয়া যায়?'

শুনতে শুনতে কুন্তীর নিজের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। ওর অবশ্য একেবারে অন্য রকম মনে হয়েছিল। অনুপম যখন শরীর নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিল, তখন মনে হচ্ছিল, অসংখ্য সাপ কিলবিল করছে ওর বুকে, ওর তলপিটের নীচে। ওর তখন বমি উঠে এসেছিল অনুপমের মুখে মদের ঝাঁঝালো গন্ধে। অথচ অনুরাধা বলছে, রেপড্ হওয়ার সময় ওর বেশ ভালো লেগেছিল। ঢোঁক গিলে কুন্তী জিজ্ঞেস করল, 'ঘটনাটা কি ওই একদিনই ঘটেছিল?'

'তোমার মাতা খারাপ? দু'দিনের জন্য আমায় নিয়ে গেসল, মিনসে টানা সাতদিন টাকিতে রয়ে গেল। দিনে তিন থেকে চারবার ওসব হত। কলকাতায় ফিরে সত্যি সত্যিই সিরিয়ালের লিড রোলটা আমি পেয়ে গেলুম। শুটিং শুরু হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে টের পেলুম, পেট বাধিয়ে বসেছি। তখনই নার্সিংহোমে ছুটতে হল। প্রেগনেন্সি টার্মিনিশেনের জন্য আমাকে একানে আসতে হবে? মিনসেটার জন্য তিন তিনবার আমাকে পেট খসাতে হয়ছে। যার জন্য আমি গর্ভপাত করলুম। সে কিন্তু দিব্যি আছে। কথাগুলো বলেই উদাস চোখে কুন্তীও তাকাল বনবীথির দিকে। তখনই ওর চোখে পড়ল, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দু'তিনেটে বাচ্চা ছেলে ওদের কথা শুনছে। কতই বা বয়স হবে? তিন থেকে চার বছর। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। একেবারে দেবশিশুর মতো দেখতে। জমি থেকে কী একটা কুড়িয়ে ওদের একজন ছুড়ে মারল এদিকে। তারপর সবাই মিলে দৌড়ে পালাল। পরক্ষণেই 'উফ্' বলে একটা আওয়াজ শুনল কুন্তী। মুখ ফিরিয়ে ও দেখল, অনুরাধা কপালে হাত দিয়ে শুয়ে পড়েছে। ওদের সামনে একখণ্ড হিরে পড়ে রয়েছে।

২০

মায়াসাগর এক অদ্ভুত জলাশয়। প্রথমবার মায়ের সঙ্গে গিয়ে পাণ্ডু অবাক হয়ে গিয়েছিল। জলের রং গাঢ় সবুজ। তাতে কোনও ঢেউ নেই। জল স্থির হয়ে আছে

কয়েক যোজন। মা সেদিন বলেছিল, মায়াসাগর নাকি তৈরি করেন ময়দানব। মায়াবী সাগর, হঠাৎ হঠাৎ জলের রং নাকি বদলায়। মায়াসাগরের এদিকে মায়ালোক, অন্যদিকে দৈত্যলোক। সেখানে দৈত্য-দানবরা পরিবার নিয়ে থাকেন। এদিক থেকে কেউ দৈত্যলোকে যেতে পারে না। কিন্তু, ওদিক থেকে ইচ্ছা করলে যে কেউ আসতে পারে। মা আরও বলেছিল, মায়াসাগরে নাকি বিকট দর্শন সব প্রাণী থাকে। তারা মাঝে মাঝে দেখা দেয়। তবে, কারও ক্ষতি করে না। হুশ করে কারা হঠাৎ ভেসে ওঠে। আবার অদৃশ্যও হয়ে যায়। সমুদ্র মন্থনের আগে নাকি ওই সব প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। ময়দানব তাদের খুঁজে এনে মায়াসাগরে আশ্রয় দিয়েছেন। যাতে সেই প্রজাতি অবলুপ্ত না হয়ে যায়।

মায়াসাগরের বেলাভূমি দিয়ে হাঁটতে পাণ্ডুর খুব ভালো লাগে। শান্ত পরিবেশ। সময় পেলেই ও মায়ের অনুমতি নিয়ে বেলাভূমিতে চলে আসে। কোনও কোনও সময় লোকজন দেখতে পায়। কোনও সময় একেবারে নির্জন থাকে সমুদ্রতট। হাঁটতে হাঁটতে তখন পাণ্ডু নানা কথা ভাবে। মায়ালোকে পাঠানোর সময় জরৎকারু মুনি ওকে বলেছিলেন, সময় হলে উনিই ডেকে নেবেন। তারই অপেক্ষায় রয়েছে পাণ্ডু। পাতালে অবশ্য দিনরাত্তিরের কোনও হিসেব নেই। মায়াসাগরে জোয়ার-ভাঁটা বলে কিছু নেই। ধূসর কাচের মতো আলো সবসময়, কমে-বাড়ে না। ঘুমোতে যাওয়ার সময় প্রথম প্রথম পাণ্ডুর খুব অসুবিধে হত। সেটা বুঝতে পেরে মা সুগন্ধি গাছের দুটো পাতা দিয়ে চশমার মতো কী একটা করে দিয়েছে। রাতে শোয়ার সময় সেই চশমাটা পরলেই ওর চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে।

মায়াসাগরে বেড়াতে এসে আজ কুন্তীর কথা খুব মনে পড়ছে পাণ্ডুর। কুন্তী পাশে থাকলে দু'জনে হাত ধরাধরি করে বহুদূর হেঁটে যেত। একবার শিসপাহাড়িতে হাসপাতালের অনেকের সঙ্গে ওরা পিকনিকে গিয়েছিল। রান্না শেষ হতে তখনও অনেকটা সময় বাকি। কুন্তী হঠাৎ বলেছিল, 'চলুন, খানিকটা হেঁটে আসি।' হাঁটতে হাঁটতে ওরা মারাংবুরুর থান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সাজগোজ করে কখনওই কুন্তী হাসপাতালে যেত না। কিন্তু, সেদিন ওর পরনে ছিল গোলাপি রঙের সালোয়ার কামিজ। খুব সুন্দর লাগছিল ওকে দেখতে। বারবার ওর দিকে চোখ চলে যাচ্ছিল পাণ্ডুর। টুকটাক কথাবার্তার মাঝে কুন্তী হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, 'আপনার মতো একজন ডাক্তার কেন শিসপাহাড়ির মতো জায়গায় পড়ে আছেন, ভাবতেই আমার অবাক লাগে।'

পাণ্ডু ঠাট্টা করেছিল, 'আমাকে নিয়ে তা হলে তুমি খুব ভাবো।'

লজ্জা পেয়ে কুন্তী নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, 'কেন, আপনাকে নিয়ে ভাবাটা কি অন্যায়? সিস্টার ফুলমণির মুখে শুনেছি, মেডিক্যাল পরীক্ষায় আপনি নাকি ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছিলেন। ইচ্ছে করলেই বড়ো কোনও হাসপাতালে চাকরি নিতে পারতেন। তা সত্ত্বেও, শিসপাহাড়িতে এলেন কেন?'

আসল কারণটা বলার মতো সম্পর্ক কুন্তীর সঙ্গে তখনও হয়নি। পাণ্ডু তাই বলতেও

চায়নি। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ও বলেছিল, 'শিসপাহাড়িতে নিজের ইচ্ছেয় কেউ আসে না কুন্তী। শিসদেবতা তাকে টেনে আনেন। তোমাকেও এনেছেন। নিশ্চয়ই পরে বুঝতে পারবে।'

সংলাপগুলো মনে পড়ায় পাণ্ডু খুব বিষণ্ণবোধ করল। কুন্তী এখন কোন লোকে রয়েছে, কে জানে? ওর সঙ্গে কি আর কখনও দেখা হবে? ভাবতে ভাবতে কাছেই একটা স্ফটিক খণ্ড দেখে পাণ্ডু তার উপর বসে পড়ল। আর তখনই দেখতে পেল, মায়াসাগরের জলের উপর জোনাকির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে কী যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। বর্ষার সময় শিসপাহাড়ি রেঞ্জের জঙ্গলেও প্রচুর জোনাকি ওর চোখে পড়ত। অন্ধকারে উজ্জ্বল সাদা আলোর বিন্দু ঝিকমিক করত। কিন্তু, মায়াসাগরের জোনাকিগুলির রং গোলাপি। সংখ্যায় অনেক, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে। জলের ঠিক উপরে নানারকম আকার নিচ্ছে। আল্পনার কল্কার মতো। কখনও ডান দিক থেকে বাঁদিকে সরে যাচ্ছে। কখনও নীচ থেকে উপরে উঠছে। যেন মনের আনন্দে সবাই নাচছে। দেখে পাণ্ডুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'বাহ'।

জোনাকিগুলো কি বুঝতে পেরেছে, কেউ ওদের তারিফ করল? হতে পারে। কেননা, ক্রমশ ওরা বেলাভূমির দিকে আসতে শুরু করল। সংখ্যায় কয়েক হাজার তো হবেই। পাণ্ডুর মাথার উপরে কয়েকবার চক্কর দিয়ে জোনাকিগুলো ফিরে যাচ্ছে। হঠাৎই দলছুট হয়ে একটা নীচে পড়ে গেল। তখনই পাণ্ডু দেখল, জোনাকি নয়। আসলে ওগুলো টুনটুনির মতো ছোট্ট পাখি। বেলাভূমিতে পড়ে গিয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে। পাখির গা দিয়ে বিন্দু বিন্দু গোলাপি আলো ছিটকে বেরচ্ছে। পাণ্ডু দ্রুত পাখিটাকে তুলে নিল। শিসপাহাড়িতে চাকরি নেওয়ার পর অনেক ধরনের পাখি ওকে চিনিয়েছেন সিস্টার ফুলমণি। কিন্তু, এমন আশ্চর্য পাখি পাণ্ডু আগে কখনও দেখেনি। কারও কাছে শোনেওনি। পাখি খাঁচায় বন্দি করে রাখা একদম পছন্দ করতেন না সিস্টার ফুলমণি। কেউ ধরলে, সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দিতে বলতেন। সেই কথাটা মনে হওয়ায়, মাথায় হাত বুলিয়ে একবার আদর করেই পাণ্ডু পাখিটাকে ছেড়ে দিল।

কিন্তু আশ্চর্য, পাখিটা সামান্য উড়ে গিয়ে পাণ্ডুর হাতে এসে বসল। ঘুরে ঘুরে ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। পাণ্ডু ফের তাকে উড়িয়ে দিল। খানিকটা উড়ে গিয়ে আবার পাখিটা এসে বসল ওর কাঁধে। আচ্ছা মজার তো! বার দুয়েক এ রকম করে হঠাৎ পরিষ্কার মানুষের গলায় পাখিটা বলল, 'তুমি এত বেরসিক কেন পাণ্ডু? এত সুন্দর একটা পরিবেশে... বসে বসে অতীতের কথা ভাবছ?'

চমকে পাণ্ডু উঠে দাঁড়াল। মানুষের গলায় পাখি কথা বলছে! মায়াবী পাখি নাকি? মা অবশ্য একবার সাবধান করেছিল, 'মায়াসাগরে অনেক মায়াবী পাখির দেখা পাওয়া যায়। তঁদের ফাঁদে পা দিস না।' মায়ের কথাটা মনে পড়ায় পাণ্ডু সাবধান হয়ে গেল। উত্তরের অপেক্ষায় গোলাপি পাখিটা ওর মুখের সামনে ডানা ঝাপটাচ্ছে। নিজেকে সামলে পাণ্ডু বলল, 'কে তুমি? আমার নাম জানলে কী করে?'

ফের কাঁধে এসে বসল পাখিটা। তারপর মিষ্টি গলায় বলল, 'অত উত্তর দিতে পারব

না বন্ধু। মন খারাপ করে বসে থেকো না। আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে আমি আশ্চর্য একটা জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে কারও মনে কোনও দুঃখ নেই, অভিমান বা আক্ষেপ নেই। সেখানে কেউ কারও ভুল ধরে না। মারামারি, হানাহানির কথা কেউ ভাবতেও পারে না। সেখানে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।'

পাণ্ডু বলল, 'এমন জায়গা আছে নাকি? কোথায় সেটা?'

'মায়াসাগরের ঠিক ওপারে। আমাদের দেশে।'

'কী করে জানলে আমি মন খারাপ করে বসে আছি?'

'আমরা সব জানি। এতক্ষণ বসে তুমি কার কথা ভাবছিলে, তাও জানি। মায়াসাগরের উপর আমরা যখন উড়ছিলাম, তখন তোমাকে দেখে দিদিরা আমাকে বলল, ওড্ডু তুই যা। ছেলেটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ও পারে নিয়ে চল। সবাই মিলে ওর দুঃখ আমরা ভুলিয়ে দেব।'

'কী নাম বললে তোমার? ওড্ডু? এমন নাম কারও হয় নাকি?'

'তোমার নাম যদি পাণ্ডু হতে পারে, তা হলে আমার নাম ওড্ডু হবে না কেন?'

যুক্তিটা শুনে পাণ্ডু খেই হারিয়ে ফেলল। বাহ রে, ওড্ডু তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে! ছোট্ট এই পাখিটা ওর কোনও ক্ষতি করতে পারে, এমনটা পাণ্ডুর মনে হল না। মায়ের সাবধানবাণী ভুলে গিয়ে, ও জিজ্ঞেস করল, 'ওড্ডু, আমি কার কথা ভাবছিলাম, বলতে পারবে?'

'কার কথা আবার? কুন্তী। আর কিছু জানতে চেয়ো না বন্ধু। এখন চলো আমাদের দেশে। দিদিরা সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার সঙ্গে গেলে কুন্তীর কথা তোমার আর মনেও পড়বে না।'

'তা হলে তো তোমার সঙ্গে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। তোমাকে আমি চিনি না। তোমার দিদিদেরও জানি না। সব থেকে বড়ো কথা, কুন্তীকে আমি ভুলতে চাই না ওড্ডু।'

'বাজে কথা বোলো না। সুচন্দ্রাকে তুমি ভুলে যাওনি? আমরা তো এও জানি, সুচন্দ্রার উপর রাগ করে তুমি শিসপাহাড়ির মতো জায়গায় চলে গিয়েছিলে। সত্যি কি না বলো?'

কথাটা শুনে পাণ্ডু ভয়ানক চমকে উঠল। ওর সঙ্গে সুচন্দ্রা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সেটা জানতে পারার পরই পাণ্ডু দূরে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই কথা আর কেউ জানে না। ওড্ডু জানল কী করে! অনেকদিন আগেই ঠিক করে রেখেছিল, সুচন্দ্রার কথা আর মনে আনবে না। শিসপাহাড়িতে যেদিন ও প্রথম কুন্তীকে দেখে, সেদিন থেকেই ওর জীবনে সুচন্দ্রা অধ্যায় শেষ। ফের ওর কথা মনে করিয়ে দিল গোলাপি পাখি। প্রসঙ্গটা বাড়তে দেওয়া আর উচিত নয় ভেবে পাণ্ডু বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। সুচন্দ্রার উপর অভিমান করেই আমি শিসপাহাড়িতে গিয়েছিলাম। তবে, তুমি যদি মনে করো, এ সব কথা বলে আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে, তা কিন্তু হবে না।'

'যেমন তোমার ইচ্ছে।' বলেই কাঁধ থেকে উড়ে মুখের সামনে এসে ওড্ডু বলল, 'সুচন্দ্রার সঙ্গে কিন্তু শিগগির তোমার দেখা হবে। তখন দেখব, তুমি কী করো। কুন্তী,

না সুচন্দ্রা...কাকে তুমি বেছে নাও। যাক গে, তোমার সঙ্গে কথা বলে বেশ মজা লাগল। আমি এখন চলি।'

সুচন্দ্রার সঙ্গে শিগগির দেখা হবে মানে? সে তো এখন লন্ডনে! পাণ্ডু বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও ওড্ডু, আমার সঙ্গে হেঁয়ালি করে তুমি চলে যাবে, তা হয় না। আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও। তার পর তুমি যাবে।'

ওড্ডু বলল, 'বেশ কী জানতে চাও, বলো। তবে, তিনটের বেশি প্রশ্ন নয়। আমারও তার বেশি উত্তর দেওয়ার নিয়ম নেই। ময়দানবের দেশে ওটাই নিয়ম। শুনে রাখো, উত্তর জানা থাকলেও, আমি তোমাকে নাও জানাতে পারি। যতটুকু বলার, তোমায় ততটুকুই বলব।'

'কুন্তী এখন কোথায়, তুমি জানো?'

'জানি, ভ্রূণলোকে। তবে, খুব শিগগির ওখান থেকে ও ছাড়া পেয়ে যাবে। ওর খবর তুমি পাবে, তোমার মায়ের কাছ থেকে। এর বেশি আর কিছু আমি বলব না। এবার বলো, তোমার দু'নম্বর প্রশ্নটা কী?'

'তুমি বললে, সুচন্দ্রার সঙ্গে আমার দেখা হবে। সেটা কী করে সম্ভব?'

'জানি, কিন্তু বলা ঠিক হবে না। তবে জেনো রাখো, ও-ই তোমার কাছে আসবে। ঠিক এই জায়গাটাতেই তোমার সঙ্গে ওর দেখা হবে। এবার তোমার শেষ প্রশ্নটা করো।'

পাণ্ডু একটু মুশকিলে পড়ল। আসলে কুন্তী আর সুচন্দ্রা সম্পর্কে জানা হয়ে গিয়েছে। আর কীই বা জানার থাকতে পারে? ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'মায়াসাগরের ও পারে তোমাদের দেশটা কেমন গো?'

'খুব সুন্দর। আমার সঙ্গে গেলেই তুমি সেটা টের পেতে। আর ফিরতেই চাইতে না। আমাদের দেশের সবাই দানব। আমরা হলাম দনুর বংশধর। যুদ্ধে দেবতাদের কাছে হেরে যাওয়ার পর মা চণ্ডীর নির্দেশে আমাদের পূর্বপুরুষরা পাতালে চলে আসেন। তবে দানব বলতে তোমরা যা বোঝো, আদতে আমরা কিন্তু তা নই। তোমাদের পুরাণে দানব-দৈত্য-অসুরদের সবাই বিকট দর্শন, শক্তিশালী আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির যুদ্ধবাজ। আর দেবতারা নাকি সবাই খুব ভালো। আসলে কিন্তু তা নয়। দানবরাও সুদর্শন, ধার্মিক এবং বীর। দেবতাদের মতো আমাদেরও অষ্টসিদ্ধি ক্ষমতা আছে। ইচ্ছে করলে, আমরা যখন-তখন যে কোনও রূপ ধারণ করতে পারি। মানুষদের ভাষায় যে কোনও কিছুর ক্লোন হতে পারি। দাঁড়াও, তোমায় দেখাচ্ছি। এই দেখো, এক পলকে আমি কেমন কুন্তী হয়ে যাচ্ছি।'

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই পাণ্ডু দেখল, ওর সামনে কুন্তী দাঁড়িয়ে। পরনে গোলাপি রঙের শাড়ি। মাথায় ফুলে ঢাকা খুব সুন্দর খোঁপা। গলায় বিচিত্র বর্ণের ফুলের মালা। ওর শরীর থেকে গোলাপি ফুলকি বেরিয়ে আসছে। কুন্তীরূপী ওড্ডু হাসতে হাসতে বলল, 'কী, এ বার বিশ্বাস হলে তো? আমাদের দেশ সম্পর্কে যদি তুমি আরও কিছু শুনতে চাও, তা হলে বলি। আমাদের দেশে জরা নেই। ব্যাধি নেই, মৃত্যু আছে,

তবে সেটা আসে সুদর্শন চক্র যদি কখনও খণ্ডন করে। দৈত্যলোকে পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই। পাপ সম্পর্কে কোনও অনুশাসনই নেই। কেননা, আমরা...দানবরা বিশ্বাস করি, পাপ বলে কিছু নেই। ওটা স্রেফ তোমাদের দেবতাদের ভণ্ডামি। তোমাদের ভয় দেখিয়ে বশে রাখার চেষ্টামাত্র। পাছে তোমরা...মানুষেরা কোনওদিন শক্তিশালী হয়ে ওদের স্বর্গরাজ্য কেড়ে নাও, সেই আশঙ্কায় মুনি-ঋষিদের মাধ্যমে পাপবোধের একটা ভীতি ওরা তোমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

'কী বলছ তুমি ওড্রু!'

'ঠিকই বলছি। দেবতাদের কাছে কি কখনও তোমরা জনতে চেয়েছ, পাপের শাস্তি ওরা কেন দেবে? কে ওদের এমন অধিকার দিল? ওরা পাপ করে না? আমি তো এমন অনেক উদাহরণ তোমায় দিতে পারি, যাতে প্রমাণ হয়, ওরাও পাপ করে, এই যে তুমি, তোমার মা সাবিত্রী, তোমার প্রেমিকা কুন্তী, তোমার বন্ধু সুরো এখানে পাপ-পুণ্যের হিসেব নিকেশ করছ, বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছ...এটা কিন্তু অর্থহীন। কই, দানবদের ঘাড়ে তো ওরা পাপের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারেনি কখনও? পারেনি, তার কারণ দেবতাদের আমরা কখনও মানিনি। আমার কথাগুলো মন দিয়ে ভেবো পাণ্ডু, কেমন? কোনও দরকার হলে আমায় স্মরণ কোরো। তখন চলে আসব। আজ চলি।'

কথাগুলি শেষ করেই ফের পাখির রূপ নিল ওড্রু। তার পর ডান ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল মায়াসাগরের উপর দিয়ে। অবাক হয়ে পাণ্ডু সেদিকে তাকিয়ে রইল।

২১

বাড়ির কাছাকাছি একটা দিঘি আছে। সেখানে স্নান করতে এসেছে কুন্তী। দিঘিটা ওকে চিনিয়ে দিয়েছিল অনুরাধা। রাস্তা থেকে একটু ভিতরে। চারদিকে গাছগাছড়া দিয়ে ঢাকা। প্রথম দিন ওরা স্নান করে খুব তৃপ্তি পেয়েছিল। ঘাটের সর্বোচ্চ সিঁড়ি অবধি টলটলে জল। সিঁড়িতে বসে পুরো শরীর জলে ডুবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকা যায়। শিসপাহাড়িতে ওকে স্নান করতে হত বাথরুমের শাওয়ারে। গরম কালে ট্যাঙ্কে প্রায়ই পর্যাপ্ত জল থাকত না। অর্ধেকদিনই ভালো করে চুল ভিজিয়ে ওর স্নান করা হত না। ভ্রূণলোকে সেই আক্ষেপটা পুরোপুরি মিটিয়ে নিচ্ছে কুন্তী। আগে ইচ্ছে হলে ও কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসত। তবে, ও জলে নামত খুব সাবাধানে। সাঁতার জানে না বলে সবসময় ও ভয় পেত, যদি ডুবে যায়, তা হলে কী হবে?

কিন্তু, বকুল হাসতে হাসতে একবার ওকে বলেছিল, 'আপনার এত ভয় কেন কুন্তীদি? আমাদের কি আর জলে ডোবার ভয় আছে? ভুলে যান কেন, আমরা এখন এসবের ঊর্ধ্বে?'

শোনার পর থেকে কুন্তীর ভয় কেটে গিয়েছে। সত্যিই, ওর তো এখন স্থূল শরীরটাই নেই! ভয় কীসের? ও এখন একা একাই আসে। আজ ঘুম থেকে ওঠার পর ওর কিছু

ভালো লাগছিল না। শিসপাহাড়ির কথা খুব মনে পড়ছিল। পাণ্ডুর কথা, সিস্টার ফুলমণি আর রুমালির কথা। কী ব্যস্ততার মধ্যেই না দিনগুলো কেটে যেত। ভ্রূণলোকে ওর সময়ই কাটতে চাইছে না। ভ্রূণলোকটা কত বড়ো, এখনও কুন্তীর আন্দাজ হয়নি। কথায় কথায় কে যেন বলেছিল, এক লক্ষ যোজন। সেটা কত কিলোমিটার হবে, কুন্তী বুঝতে পারেনি। ভ্রূণলোকের মতো নাকি আরও একত্রিশটা লোক আছে। এটা একটা পরিক্রমা। বত্রিশতম লোকে পৌঁছলে মোক্ষলাভ হয়ে যায়। কুন্তী এও শুনেছিল, সব মানুষের সব লোকে থাকার দরকার হয় না। তার কর্মফলের উপর সেটা নির্ভর করে। যার যত পুণ্য বেশি, তাকে তত কম লোক পরিক্রমা করতে হয়।

কেউ কোনও অন্যায় ও পাপ করলে মা বলত, 'দেখিস, এই জন্মেই ওকে শাস্তি পেতে হবে। ভগবান কোনও না কোনও দিক দিয়ে শাস্তিটা দিয়ে দেবে।' বাবাকে ঠকিয়ে একবার লাখ তিনেক টাকা মেরে দিয়েছিল এক ঠিকাদার। আদালতে গিয়েও বাবা সেই টাকা উদ্ধার করতে পারেননি। সেই বছরই ঠিকাদারের একমাত্র ছেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে বাস দুর্ঘটনায় চোখে চোট পেল। সেই ঠিকাদার শেষে বাবার কাছে এসে কান্নাকাটি করেছিল, 'ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটার চোখ ভালো করে দিন। আপনার পাওনা টাকা আমি ফিরিয়ে দেব।' টাকা পাওয়ার আগেই অবশ্য বাবা ছেলেটার চোখ অপারেশন করে দিয়েছিলেন। মা বলেছিল, 'দেখেছিস কুন্তী, তোকে বলতাম না...ভগবান আছেন। শাস্তিটা তিনি অন্যভাবে দেন।'

মায়ের কথাই যদি সত্যি হয়, তা হলে ভ্রূণহত্যার দায়ে ইহলোকে ওর শাস্তি হল না কেন? কেন ওকে আসতে হল ভ্রূণলোকে? এই যে অনুপম ওর এত বড়ো ক্ষতিটা করেছিল, সে কি শাস্তি পেয়েছে? দিঘিতে স্নান করতে এসে... ঘাটে বসে পুরোনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে কুন্তীর মনে আজও এই ভাবনাটা উদয় হল। ভ্রূণহত্যার দায়ে এখানে ওকে নিত্যি সাজা পেতে হচ্ছে। আর যার জন্য ওর কুমারীত্ব চলে গেল, সেই অনুপম কিন্তু দিব্যি আছে! ভগবানের এ কী বিচার? ভ্রূণলোকে ওই মুহূর্তে যারা আছে, তাদের মধ্যে অনেকেই ওর মতো... অনিচ্ছাসত্ত্বেও গর্ভবতী হয়েছে। কুন্তী জানে, বেশিরভাগ মেয়ের মনে প্রশ্ন, শাস্তিটা শুধু ওদেরই ভোগ করতে হবে কেন? ওরা সবাই মিলে ঠিক করে রেখেছে, এ বার যেদিন মা অহল্যা লেকচার দিতে আসবেন, সেদিন প্রশ্নটা সমস্বরে তুলবে। কথাটা ভাবতে ভাবতে নিশ্চিন্তে স্নান শেষ করে কুন্তী বাড়ি ফিরে এল।

ভ্রূণলোকে শাস্তি বলতে বাচ্চাগুলোর উৎপাত। সত্যিই আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সব একটা মূর্তিমান শয়তান। কুন্তী নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না। মাঝে একদিন হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। টের পেয়েছিল, বুকের উপর বসে কে যেন ওর গলায় চাপ দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখে, তিন চার বছরের একটা বাচ্চা। দু'হাতে ওর গলাটা টিপে ধরেছে। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এক ধাক্কায় বাচ্চাটাকে ছিটকে ফেলে দিয়েছিল কুন্তী। ওর চোখে পড়েছিল দশ-বারোটা বাচ্চা এসে হাজির হয়েছে একসঙ্গে। কেউ দরজায় পাহারা দিচ্ছে। কেউ জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলছে। ও জেগে ওঠার পর দুদ্দাড় করে ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে গিয়েছিল।

দিঘি থেকে ফেরার পর আজও দেখল, ঘরের ভিতর সব জিনিস লণ্ডভণ্ড। দেখে কুন্তীর কান্না পেয়ে গেল। একটু পরে বাইরে গোলমালের আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসে ও দেখে, একটা বাচ্চা ছেলের হাত শক্ত করে ধরে আছে বকুল। ছেলেটা ছুটে পালাতে চাইছে। কিন্তু, বকুল টানতে টানতে ওকে নিয়ে আসছে। মাধবীর মুখে কুন্তী শুনেছে, বকুল নাকি এক সময় ফুটবল খেলত। প্রায় পাঁচ ফুট সাত-আট ইঞ্চির মতো লম্বা, ওর শরীরটাও বেশ মজবুত। একটু পুরুষালি গড়ন। বয়সে ওদের থেকে চার-পাঁচ বছরের ছোটোই হবে। গায়ের জোরে বাচ্চাটা বকুলের সঙ্গে পারবে কেন?

চোখাচোখি হতেই বকুল বলল, 'মাধবীদির বাড়িতে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, এই ছোঁড়া দৌড়ে পালাচ্ছে আপনার বাড়ি থেকে। ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনও দুষ্কর্ম করে গ্যাছে। সেই কারণেই ধরে আপনার কাছে নিয়ে এলাম।'

এই সেই বাচ্চাটাই নাকি, যে সেদিন ওর বুকের উপর চেপে বসেছিল? কুন্তী ভালো করে তাকাতেই চিনতে পারল। হাঁ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। উঠানে নেমে এসে কুন্তী বলল, 'এই, সেদিন তুই আমার গলা টিপে ধরেছিলি কেন রে? আচ্ছা বদমাশ ছেলে তো?'

বকুল বলল, 'আপনার গলা টিপে ধরেছিল কেন?'

'সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করো।'

ওইটুকু বাচ্চা, কী তেজ! পা জমিতে ঠুকে বলল, 'বলব না।'

বকুল কান মুলে দিয়ে বলল, 'বলবি না মানে? কুন্তীদি তোর কী ক্ষতি করেছে, আগে বল। না হলে তোকে কাপড় কাচার মতো উলটে আছড়াব।'

বাচ্চাটার চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছে। তবুও জিদ ধরে আছে। বকুলের হাত কামড়ে দেওয়ার চেষ্টা করল ও। দেখে কুন্তী বলল, 'ওকে ছেড়ে দাও বকুল।'

'এই বাচ্চাগুলোর উৎপাত আর সহ্য হচ্ছে না কুন্তীদি। সেদিন মাধবীদির বাড়িতে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। আমরা ছিলাম না, কাল আমার বিছানায় পটি করে দিয়েছে। এত বাচ্চা এল কোথা থেকে বলুন তো? আপনি রাস্তায় বেরুলে ওদের দেখতে পাবেন না। কিন্তু, ঘরে ঢুকে গেলে ওদের সবাইকে রাস্তায় দেখতে পাবেন। অদ্ভুত ব্যাপার, মাঠের ধারে সেদিন রামধনু উঠেছিল। এই বাচ্চাগুলোকে দেখি, সেখানে উঠে খেলা করছে। তখন যেন একেবারে দেবশিশু। এদের দেখে মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগে কুন্তীদি। অনেক দিন ধরে তক্কে তক্কে ছিলাম। আজ হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি।'

কুন্তী হেসে বলল, 'ভালো করেছ। একটাকে অন্তত শিক্ষা দেওয়া গেল। ওকে জিজ্ঞেস করো তো, আমার ঘরে খুব টাটকা ক্ষীর আছে। ও খাবে কি না?'

বাচ্চাটা মুখে কিছু বলল না। যেন এমন শান্তশিষ্ট ছেলে আর হয় না। বকুলের হাত ধরে ও ঘরের ভিতর উঠে এল। চুপচাপ এক বাটি ক্ষীর খেয়ে... আচমকা কুন্তীর গালে একটু আলতো চুমু খেয়ে বাচ্চাটা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। দেখে ওদের দু'জনেরই বেশ মজা লাগল। কুন্তী বলল, এদের জব্দ করার একটা উপায় জানা গেল। যত বেশি বদমাইশি করবে, তত বেশি আদর করতে হবে।'

বকুল বলল, 'তাই তো দেখলাম। ধাই বুড়িমা কিন্তু আমাদের অন্য কথা বলেছিলেন।'

'ধাই বুড়িমা কে গো?

'আছেন একজন। আপনি এখনও দেখেননি? একেবারে থুত্থুড়ে বুড়ি। আগের জন্মে নাকি গর্ভপাতের টোটকা ওষুধ বিক্রি করে বেড়াতেন। সেই পাপে এখানেই পড়ে আছেন। ধাই বুড়ির অনেক ক্ষমতা। উনি নাকি যে কোনও লোকে যেতে পারেন। ইচ্ছে করলে আপনাকেও নিয়ে যেতে পারেন। শুনেছি, ভ্রূণলোকপাল বলে যিনি এখানে আছেন, ধাই বুড়িমা নাকি তাঁর চর।'

বকুল মেয়েটাও খুব সহজ সরল। খেলাধুলো করলে বোধ হয় এ রকমই হয়। ওর সঙ্গে কথা বললে খানিকটা সময় কেটে যাবে। কুন্তী তাই বলল, 'আমার এখানে একটু বোসো না বোন। শুনেছি, তুমি নাকি দেশের হয়ে খেলেছ। কত গর্বের কথা।'

দাওয়ায় এসে বসল বকুল। তার পর উদাস গলায় বলল, 'গর্ব না ছাই। দেশের হয়ে খেলতে চেয়েই তো আমার চরম সর্বনাশটা হল কুন্তীদি। ও কথা আর তুলবেন না। বলতে আমার লজ্জা হয়।'

ভ্রূণলোকে আসার পর থেকে নানা জায়গায় বকুলের সঙ্গে কুন্তীর দেখা হয়েছে। ও আগে পারতপক্ষে কথাই বলত না। কিন্তু, আজ গল্প করতে বসে যেন ওর মুখের আগল খুল গেল। গাঁয়ের মেয়ে, কলকাতায় খেলতে গিয়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল সরিতা বলে একটা মেয়ের। ওড়িয়া মেয়ে, কটকের। ওদের বন্ধুত্ব পরে নাকি ভালোবাসায় গিয়ে দাঁড়ায়। দু'জনে মেসে একই ঘরে থাকত। এই পর্যন্ত বলে বকুল মুখ নিচু করে কী যেন ভাবল। তার পর বলল, 'আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড় দিদি। বাকি কথা কী করে যে আপনাকে বলব, ভেবে পাচ্ছি না।'

কুন্তী বলল, 'লজ্জা কোরো না বকুল। একটা বয়সের পর আর ছোটো-বড়ো ভেদাভেদ থাক না।'

'তা হলে শুনুন। আমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কও ছিল। সরিতা আমায় বলত, তুই আমার বর। কথা দে, কোনওদিন কোনও মেয়ে বা পুরুষের দিকে তুই তাকাবি না?'

শুনতে শুনতে ভুবনেশ্বরে মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে এরকম দুটো মেয়ের কথা মনে পড়ল কুন্তীর। কানাঘুষো শুনত, ওরা দু'জন নাকি লেসবিয়ান। কুন্তী তখন জানত না মেয়েরা মেয়েদের শরীর থেকে কীভাবে সুখ পেতে পারে। হোস্টেলের সেই মেয়ে দুটোর নাম এখন আর ওর মনে নেই। একটা মেয়ে সম্বলপুরের, অন্যজন তেলুগু... অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারেঙ্গেল বলে একটা জায়গার। তেলুগু মেয়েটা একটু কাঠকাঠ টাইপের ছিল। বাইরে থেকে অবশ্য বোঝা যেত না, ওরা সমকামী। এতদিন পরে বকুল প্রসঙ্গটা তোলায় কুন্তীর খুব কৌতূহল হল জানার, মেয়েদের নিজেদের মধ্যে সেক্সের অভিজ্ঞতাটা ঠিক কেমন হয়। বকুলকে ও জিজ্ঞেস করল, 'সরিতাকে তুমি কথা দিয়েছিলে?'

হ্যাঁ, আমার কোনও উপায় ছিল না। দেখতে আমি কোনওদিনই ভালো ছিলাম না। ফুটবল খেলতে গিয়ে চেহারাটা আরও রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল। বাবার এমন ক্ষমতাও ছিল না যে, আমার বিয়ে দেবে। তার থেকে ওই ভালো। রোজ রাতে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হত।'

'তোমাদের কখনও মনে হয়নি, পাপ করছ?'

'এটা আপনি কী বললেন দিদি। পাপ মনে করব কেন? কোন শাস্তরে লেখা আছে, মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে সেক্স করতে পারবে না? হ্যাঁ, জীবনে আমি একবারই পাপ করেছিলাম ভ্রূণহত্যা করে। যার জন্য এখানে এসে পড়েছি।'

'কী করে তুমি প্রেগনেন্ট হলে বকুল?'

'ওই যে বললাম। ইন্ডিয়ান টিমে আমাদের কোচ ছিল সর্দার সিং বলে একজন। পারভার্ট বাস্টার্ড। তিরিশজন মেয়ের মধ্যে ক্যাম্পে কোচের নজর শুধু আমার উপরই পড়েছিল। ছুতোনাতায় যখন তখন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরত। ঘন ঘন ঘরে ডেকে পাঠাত। গা-হাত-পা টেপাত। টিমে থাকার জন্য আমি সবকিছু করার জন্য তৈরি ছিলাম। নিজেই দরজায় ছিটকিনি দিয়ে একদিন সর্দারের সঙ্গে শুয়ে পড়লাম। হংকংয়ে টুর্নামেন্ট খেলে ফিরে আসা পর্যন্ত রোজই আমায় শুতে হত। হয়তো অন্য মেয়েদের কাছে সরিতা কিছু শুনেছিল। ও আমাকে সন্দেহ করতে লাগল। তার পর একদিন... মেসের বাথরুমে হড়হড় করে বমি করে ফেললাম। আর একদিন প্র্যাকটিসের সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। ডাক্তার বলল, আমি প্রেগনেন্ট, আট সপ্তাহের।'

কথাগুলো বলেই বকুল চুপ করে গেল। ওর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। দেখে কুন্তীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। কুমারী অবস্থায় গর্ভধারণ! এই পরিস্থিতিটা যে একটা মেয়ের কাছে কতটা ভীতিকর, তা কুন্তী জানে। ওর ক্ষেত্রে জানাজানি হয়নি, কারণ চপলাদি ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বকুলের ক্ষেত্রে কী হয়েছিল তা জানার জন্য ও জিজ্ঞেস করল, 'খবরটা জানার পর সরিতার কী রিঅ্যাকশন হল?'

চোখ মুছে বকুল বলল, 'বেচারি খুব আঘাত পেয়েছিল। আমারও মনে হতে লাগল, ওকে বিট্রে করেছি। অ্যাবরসন কোথায় করা যায়, জানতাম না। মেসে খুব কান্নাকাটি করতাম। শেষে সরিতাই আমাকে নিয়ে গেল কটকে ওর চেনা এক নার্সিংহোমে। আমার জন্য সরিতা সেই সময় নিজের পকেট থেকে হাজার কুড়ি টাকা খরচ করেছিল।'

কটকের নার্সিংহোমের কথা শুনে কুন্তী জিজ্ঞেস করল, ওই নার্সিংহোমটার নাম কি ছিল গো, নবজীবন?'

'হ্যাঁ দিদি। কিন্তু, আপনি জানলেন কী করে?'

'ওই নার্সিংহোমে আমি চাকরি করতাম যে। যাক গে, তারপর কী হল বলো।'

'সবসময় আমার মনে হত, সরিতা ঘেন্নার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে। মেসে থাকাটা নিরাপদ বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু, মেস ছাড়ার আগেই এক রাতে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে চারতলার ছাদে নিয়ে গিয়ে সরিতা ...ঠেলে নীচে ফেলে দিল। পরে সবাই মিলে রটিয়ে দিল, প্রেগনেন্ট হওয়ার লজ্জায় আমি নাকি আত্মহত্যা করেছি। পুলিশ আর আমার বাবা-মাকেও মেসের সব মেয়ে একই কথা বলেছিল। কথাটা বিশ্বাস করানোর জন্য পুলিশকে নার্সিংহোমের বিল দেখিয়েছিল সরিতা। তাও ওকে কেউ সন্দেহ করেনি। আমার প্রশ্ন, সরিতার কেন শাস্তি হবে না বলুন তো?' প্রশ্নটা করেই বকুল চুপ করে গেল।

সাড়া দেওয়ার ভঙ্গিতে কুন্তী বলল, 'এই প্রশ্নটা এখন সবার মনেই আসছে বকুল। একটু আগে দিঘির ঘাটে বসে আমিও এই এক কথা ভাবছিলাম। ভ্রূণলোকে আসার পর থেকে... পাপ-পুণ্য নিয়ে আমার ধারণা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে ভাই। আমার তো মনে হচ্ছে, এই ভাবনাগুলো মানুষের দুর্বলতা। পাপ বলে সত্যিই যদি কিছু থাকে, তা হলে সেটা সবার ক্ষেত্রে এক রকম হবে না কেন, বলো তো? একজন কসাই...যে রোজ জীবহত্যা করছে, তার মনে কোনও পাপবোধ হচ্ছে না। অথচ আর একজন মশা মারলেও মনে করে, সে অধর্ম্ম করছে। কথাগুলো ভাবলেই আমার রাগ হয়। ভ্রূণলোকপালের কাছে গিয়ে জানতে ইচ্ছে করে, আমি তো অ্যাদ্দিন আর্ত মানুষের সেবা করছিলাম। সেটা কি যথেষ্ট পুণ্যের নয়? কেন আমাকে নিয়ে এলেন?'

'সবাই মিলে একদিন লোকপালের কাছে যাবেন কুন্তীদি? চলুন না, একদিন গিয়ে প্রতিবাদ করি। লোকপালকে কোথায় পাওয়া যাবে, ধাই বুড়িমা তা জানে। আমাদের নিয়ে যেতে না চাইলে, ওকে চ্যাংদোলা করে আমি নিয়ে যাব। আরে, কী আশ্চর্য, বলতে না বলতেই বুড়ি এসে হাজির! ওই দেখুন, ধাই বুড়িমা লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে আসছেন!'

বকুলের কথামতো কুন্তী রাস্তার দিকে তাকাল। ধাই বুড়িমার মুখের দিকে চোখ যেতেই ও চমকে উঠল। মুখটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। কার মতো, একটু ভাবতেই কুন্তীর মনে পড়ে গেল। চপলাদি... হ্যাঁ চপলাদির মতোই দেখতে। বয়েস হলে এ রকমই দেখতে লাগবে চপলাদিকে!

২২

জীবনে অনেকবারই শোকের ঘটনা ঘটেছে ফুলমণির। কিন্তু, তার তীব্রতা কখনও এমন অনুভব করেননি তিনি। ডাঃ পাণ্ডু আর কুন্তী দিদিমণির দুর্ঘটনা মারাত্মক নাড়া দিয়েছে তাঁকে।

লংম্যান সাহেব যেদিন সুইসাইড করেন, সেদিন ফুলমণি ছিলেন পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে। খবরটা শুনতে পান দিন তিনের পর মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে। ফিরে এসে মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে ওঁর একটা কথাই মনে হয়েছিল, এ বার কী হবে? মাথার উপর থেকে একটা বটগাছ সরে গেল। ফুলমণি বুঝতে পেরেছিলেন, খুব খারাপ দিন আসছে। লংম্যান সাহেবকে যাঁরা পছন্দ করতেন না, তাঁরা এ বার ওঁর উপর শোধ তুলবেন, কিন্তু, পরে তেমন কিছু হয়নি। আরও আশ্চর্যের, মাস দুয়েক পর মেদিনীপুরের এক উকিল এসে জানিয়েছিলেন, লংম্যান সাহেব ওঁর নামে একটা উইল করে গিয়েছেন। স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি তিনি দান করে গিয়েছেন ফুলমণি হেমব্রেমের নামে। টাকার পরিমাণ কম নয়, প্রায় পাঁচ লাখ। তা ছাড়া, গাঁয়েও দু'বিঘা জমি। উইল হাতে নেওয়ার পর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুর্ভাবনা তাই অনেক কমে গিয়েছিল ফুলমণির।

এর পর বাপের মৃত্যু, এক মাসের মধ্যে মায়েরও। বাপের মৃত্যু ফুলমণির জীবনে কোনও ঢেউ তোলেনি। বাপকে ফুলমণি দেখতে পেতেন গাঁয়ের ফসল তোলার সময়। বছরের বাকি দিনগুলোতে বাপ চলে যেত পুবের দেশে। জনমজুরি খাটতে; কাশরোগ

হয়েছিল। হাসপাতালের টিবি ওয়ার্ডে বাপ কখন মারা গিয়েছিল, কেউ টের পায়নি। তুলনায় মা অনেক সেবাযত্ন পেয়েছিল। মাকে সাপে কেটেছিল। হাসপাতালের বেডে ফুলমণির কোলেই বলতে গেলে শেষ নিঃশ্বাসটা ফেলে। সেদিন মায়ের শোকে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন ফুলমণি। এটা জেনেও যে, চিরদিন কেউ বেঁচে থাকেন না।

মায়ের অপমৃত্যু হয়েছিল। শুক্তিমতী নদীতে মায়ের দেহটা ভাসিয়ে দেওয়ার সময় অনেকক্ষণ তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। বিকেল বেলায় সূর্য তখন ডুবে গিয়েছে। আকাশে ঘষা কাচের মতো আলো। সেই সময় নদীতে ভরা জোয়ার। জলের তোড়ে মায়ের ডেডবডিটা উত্তরদিকে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু, নদীর পারে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ফুলমণি স্পষ্ট দেখেছিলেন, ভাসতে ভাসতে ডেডবডিটা এ পার থেকে ওপারের দিকে চলে যাচ্ছে। মাঝ নদীতে একটা ডিঙি নৌকো দাঁড়িয়ে। তাতে দাঁড়িয়ে আছে যমদূতের মতো দেখতে ভয়ানক চেহারার দুটো লোক। মায়ের ডেডবডিটা তারা আঁকশি দিয়ে তুলে নিল নৌকোয়! দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছিলেন ফুলমণি। কিন্তু, ওঁর কথা সেদিন কেউ বিশ্বাস করেননি।

ফুলমণির জীবনে আর একটা বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে বছর দুয়েক আগে। মেয়ের মৃত্যুর খবরটা শুনে প্রথমে তিনি বিশ্বাস করতে চাননি। মাত্র তেইশ বছর বয়সে কেউ মারা যেতে পারে? অযোধ্যা পাহাড়ে এক স্কুল টিচারের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন ফুলমণি। শ্বশুরবাড়ি থেকে হাসপাতালের ফোনে খবর এসেছিল, বিটি আর নেই। বাচ্চা বিয়োনোর সময় মারা গিয়েছে। পোয়াতি অবস্থায় বিটিকে নিজের কাছে এনে রাখার কথা ভেবেছিলেন ফুলমণি। কিন্তু জামাই পাঠাতে চায়নি। অযোধ্যা পাহাড়ে পৌঁছনোর পর ফুলমণি শুনতে পান, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মেয়েকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে। শোকের বদলে ক্রোধ অনুভব করেছিলেন ফুলমণি। থানায় গিয়ে অভিযোগও করেন। সেই কেস এখনও চলছে পুরুলিয়ার কোর্টে।

কাল চাঁপার সুইসাইডের ঘটনাও বিচলিত করেছে ফুলমণিকে। সক্কালবেলায় মেয়েটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দুপুরে জোসেফ এসে খবর দিল, মরণখাদে ওর ডেডবডিটা পাওয়া গিয়েছে! মেয়েটা কী কারণে সুইসাইড করল, অনেক ভেবেও ফুলমণি বুঝে উঠতে পারেননি। দু'দিন আগে মরণঝাঁপের কাছ থেকেই ওর বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তার মানে, আগে থেকেই মেয়েটা ঠিক করে রেখেছিল, আত্মহত্যা করবে। ওখানে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায়...করতে পারেনি। পেটের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরেই কি মেয়েটা স্বেচ্ছায় প্রাণটা দিল? না, অন্য কোনও কারণ আছে...প্রণয়ঘটিত কিছু। আদিবাসী বস্তির অনেককে চাঁপা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ফুলমণি। কেউ ওর সম্পর্কে ভালো কথা বলেনি। প্রায় সবাই বলেছে, 'উ লষ্ট মেয়ার কথা শুধায়ো না ফুলমণি।'

চাঁপার কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। ডাঃ পাণ্ডু আর কুন্তী দিদিমণির কথা শোনার পর মন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। খবরটা শোনার পর তিনি মোবাইল থেকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেন সুপার সাহেবকে। তারপর পুলিশের এস আইয়ের সঙ্গে

নিজেই চলে যান শিসপাহাড়ি জংশনে। রেল পুলিশের ছোট্ট মেডিক্যাল সেন্টারে দুটো নিথর শরীর পাশাপাশি দেখে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন ফুলমণি। গলা অবধি সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা দুটো শরীর। কোথাও কোনও চোটের চিহ্ন নেই। যেন দু'জনে ঘুমিয়ে রয়েছেন। অনেক পরে রেল পুলিশের অফিসার বললেন, 'ডাক্তার বলছেন, দু'জনেই কোমায় রয়েছেন। এখানে ভেন্টিলেশনে রাখার সুযোগ নেই। বডি দুটো আমরা কার হাতে তুলে দেব, বুঝতে পারছিলাম না। ভালোই হল, আপনি এসেছেন। যত তাড়াতাড়ি পারেন, শিসপাহাড়ির হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এঁদের ট্রিটমেন্ট শুরু করুন। এখনও বাঁচার ফাইভ পার্সেন্ট চান্স আছে।'

ফুলমণি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এঁদের এই অবস্থা হল কী করে?'

'উঁচু কোনও জায়গা থেকে পড়ে যাওয়ার জন্য। অন্তত কুড়ি-পঁচিশ ফুট উঁচু কোনও জায়গা থেকে এঁরা পড়ে গিয়েছিলেন। এখানে সেইরকম জায়গা একটাই আছে। সেটা হল রেল ট্রাকের উপর ফুটব্রিজ। ওখান থেকে কি করে এরা পড়ে গেলেন, সেটাই বুঝতে পারছি না আমরা। যেখানে এঁদের বডি পাওয়া গিয়েছে, সেখানে কোনও প্ল্যাটফর্ম নেই। ফুটব্রিজটাও অতদূর পর্যন্ত যায়নি। আমাদের খুব মিস্টিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, হাসপাতালে কি, এঁদের কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল? হয়তো খুন করার চেষ্টা করেছিল।'

ফুলমণি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'না, না। অসম্ভব, হতেই পারে না। ওঁদের সবাই খুব ভালোবাসতেন।' গলায় ঝাঁঝের আঁচ পেয়ে রেল পুলিশের অফিসার একটু দমে যান। তার পর বলেছিলেন, 'কথাটা অন্যভাবে নেবেন না সিস্টার। আমি একটা সম্ভাবনার কথা বলছিলাম। আত্মীয়স্বজনের জন্য আমরা কিন্তু ওয়েট করতে পারব না। চব্বিশ ঘন্টা অলরেডি কেটে গিয়েছে।'

সই-সাবুদের পাট শেষ করে... একটা অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে জংশন থেকে সন্ধে সাতটার মধ্যেই দু'জনের বডি শিসপাহাড়িতে নিয়ে এসেছেন ফুলমণি, হাসপাতালের এনআইসিইউ ...মানে নিউরো ইন্টেসিভ কেয়ার ইউনিটে পাশাপাশি দুটো বেডে রাখার ব্যবস্থা করেছেন ওঁদের। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সব রকম লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম চালু হয়ে গিয়েছে। মেডিক্যাল সায়েন্স এখন এত উন্নত হয়েছে যে, আজকাল কোমা বা ট্রমায় থাকা পেসেন্টদের অনেকদিন রেখে দেওয়া যায়। ইতিমধ্যেই দুঃসংবাদটা মুখে মুখে ছড়িয়েছে। সারা হাসপাতালের লোকজন জড়ো হয়েছে এনআইসিইউ ব্লকের সামনে। সিঁড়িতে বসে কাঁদছেল ফুলমণি। সব থেকে ভেঙে পড়েছে রুমালি। দূর থেকে ফুলমণি শুনলেন, রুমালি কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'বাবাঠাকুরের কাছে আমি কী মুখ নিয়ে দাঁড়াব দিদি।' ওকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছে জোসেফ।

পেশেন্টরাও অনেকে বেড ছেড়ে উঠে এসে কপাল চাপড়াচ্ছে। ভগবান কি নেই? দুটো ভালো মানুষকে সাত তাড়াতাড়ি কেন উনি নিয়ে যেতে চাইছেন? হাসপাতালে কান্না নতুন কিছু নয়। প্রায়ই শোনা যায়। মর্গ থেকে কারও লাশ বেরনোর সময় নিকটজনেরা কান্নাকাটি করেন। কিন্তু, এই রকম পরিস্থিতি হাসপাতালে কখনও হয়নি। সবাই কাঁদছে এমন দু'জনের জন্য, যাঁর কেউ তাদের আত্মীয় নন।

ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছেন সুপার সাহেব। তাঁকে কাছে আসতে দেখে ফুলমণি উঠে দাঁড়ালেন। সামনে এসে সুপার সাহেব বললেন, 'সিস্টার, আপনার সঙ্গে তো এই দু'জনেব খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। আপনি কি এঁদের কোনও রিলেটিভের কথা জানেন? ইমিডিয়েট তাদের কাউকে খবর দিতে হবে।'

ফুলমণি বললেন, 'ডাঃ পাণ্ডুর মুখে কোনওদিন ওর কোনও রিলেটিভের কথা শুনিনি। স্যার, হাসপাতালের রেকর্ডে কিছু নেই?'

'ডাক্তার পাণ্ডুর ফাইলে ওঁর এক মামার ঠিকানা লেখা আছে। তাঁর কোনও ফোন নাম্বার নেই। তিনি থাকেন কলকাতার গল্‌ফ গ্রিন অঞ্চলে। রাতের ট্রেনেই একজনকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, যাতে কালকের মধ্যে উনি চলে আসতে পারেন।'

'ডাঃ পাণ্ডুর কোয়ার্টারে গেলে হয় না? টেলিফোন ডায়েরি থেকে যদি ফোন নাম্বার পাওয়া যায়।'

'ঠিক বলেছেন। একবার খুঁজে দেখলে হয়। ডাক্তার কুন্তীকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ওঁর বাড়ির অ্যাড্রেস পেয়েছি রুমালির কাছ থেকে। ওর বাবা ডাঃ নীলমাধব মহাপাত্রর বড়ি ভুবনেশ্বরের ইউনিক পার্ক টু-তে। আমার এক স্টুডেন্ট থাকে ওই অঞ্চলে। আমি তাকে খোঁজ নিতে বলেছিলাম। সে জানাল, ডাঃ মহাপাত্র নাকি বেঁচে নেই। তাঁর ডেডবডিও নাকি আনক্লেমড অবস্থায় পড়ে আছে। ডাক্তার কুন্তীর এক পিসি নাকি থাকেন ভুবনেশ্বরে। কিন্তু ঠিক কোথায় থাকেন, কেউ জানেন না। কী করা যায় বলুন তো'?

কুন্তী দিদিমণির বাবা মারা গিয়েছেন শুনে সিস্টার ফুলমণি চমকে উঠলেন। তবে যে শিসপাহাড়ির জংশনে যাওয়ার সময় ডাঃ পাণ্ডু বলে গেলেন, কুন্তী দিদিমণির বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। ওরা কি তা হলে মিথ্যে কথা বলেছিলেন? নাকি রেল পুলিশের অফিসার যা অনুমান করেছিলেন, সেটাই সত্যি। কেউ মিথ্যে কথা বলে ওঁদের ডেকে নিয়ে গিয়ে খুনের চেষ্টা করেছেন। তাই বা কী করে হয়? ওঁদের দু'জনের সঙ্গে এমন কারও শত্রুতা ছিল না, যা খুন পর্যন্ত গড়াতে পারে। যত নষ্টের গোড়া শম্ভু ড্রাইভার। হারমজাদা উধাও হয়ে গিয়েছে। ওর খোঁজ পেলে হয়তো হদিশ পাওয়া যেতে পারে, ডাক্তার পাণ্ডু আর দিদিমণির কি হয়েছিল।

'তা হলে চলুন সিস্টার, একবার ডাক্তার পাণ্ডুর কোয়ার্টারে ঢুঁ মারা যাক।'

গত কয়েক ঘণ্টার ঘটনাবলিতে এমন অবসন্ন যে, শরীর ওঠাতেই পারছেন না ফুলমণি। শরীর তখনই ভারী হয়ে যায়, যখন কোনও অপদেবতা ভর করে। ছোটোবেলা থেকে একথা শুনে আসছেন ফুলমণি। দুটো মৃতপ্রায় শরীর নিয়ে ভর সন্ধেবেলায় লাশপুরের পাশ দিয়ে আজ শিসপাহাড়িতে ফিরেছেন। অপদেবতা ভর করতেই পারে। কথাটা ভাবতেই ভয় ভয় করতে লাগল ফুলমণির। মনে মনে মারাংবুরুকে স্মরণ করলেন তিনি। ছোটোবেলায় মা মারাংবুরুর যে মন্তরটা শিখিয়ে দিয়েছিল। সেটা জপতে জপতে ফুলমণি কোনওরকমে ডাঃ পাণ্ডুর কোয়ার্টারে গিয়ে

পৌঁছলেন। দিনে অন্তত একবার আসতেনই তিনি এই কোয়ার্টারে। কখনও রোগীদের নিয়ে কথা বলার জন্য। কখনও এসে ঘরদোর গুছিয়ে দিতেন। অথবা বাড়িতে কোনও বিশেষ রান্না করলে, তা নিয়ে আসতেন।

বেডরুমে পা দিতেই বুকের ভেতর থেকে কান্না উথলে উঠল ফুলমণির। নিজের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। ডাঃ পাণ্ডুকে তিনি ছেলের মতোই ভালোবাসতেন। এমন তরতজা একটা মানুষ এখন মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছে এনআইসিইউতে। ঘরের মৃদু আলোয় চারপাশে চোখ বুলিয়ে ফুলমণি দেখলেন, আসবাবপত্র সেই একই রকম অবস্থায় আছে। ব্যাচেলর মানুষ, শখ শৌখিনতাও ছিল না ডাঃ পাণ্ডুর। টেবিলের উপর ডাক্তারির জার্নাল, বই, ল্যাপটপ, ফাইল ডিভানের উপর রোজকার মতো মশারিটা এখনও টাঙানো। কতদিন তিনি বকুনি দিয়েছেন ডাঃ পাণ্ডুকে, মশারি খুলে ভাঁজ করে না-রাখার জন্য। বকুনি শুনে ডাঃ পাণ্ডু হাসতেন। এখনও জানলার ধারে পাতা রয়েছে চামড়ায় মোড়া একটা ইজিচেয়ার। ওখানেই বসেই শিসপাহাড়ি রেঞ্জের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন ডাঃ পাণ্ডু। শিসপাহাড়ি নিয়ে কত কৌতূহল মানুষটার। কত প্রশ্ন করতেন শিসপাহাড়ির মিথ নিয়ে!

হাসপাতালের সুপার সাহেবের সঙ্গে এসেছেন ডাঃ দশরথও। ড্রয়িংরুমে উনিও খোঁজাখুঁজি করেছেন। হঠাৎই জানলার বাইরে চোখ গেল সিস্টার ফুলমণির। জুঁই গাছের তলায় কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবছা আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বেশ লম্বা, মাথায় হ্যাট, পরনে ফুলস্লিভ শার্ট, টাই। কে এই লোকটা বাইরে থেকে ওদের উপর নজর রাখছে? আর স্পষ্ট করে দেখার জন্য এক পা এগোতেই ফুলমণি চমকে উঠলেন। এ তো লংম্যান সাহেব!! কী করুণ মুখে উনি তাকিয়ে রয়েছেন! মাঝে মাঝে কপাল চাপড়াচ্ছেন, আর কী যেন বলার চেষ্টা করছেন। মানুষ মরে যাওয়ার পরেও যদি ফের দেখা দেয়, তা হলে বুঝতে হবে সে প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেরাচ্ছে। কিন্তু, লংম্যান সাহেব প্রেতাত্মা হবেন কী করে? তা হলে কি তিনি ভুল দেখলেন?

লংম্যান সাহেব কী বলতে চাইছেন, তা শোনার জন্য জানলার আরও কাছে গেলেন ফুলমণি। কিন্তু, সেই মুহূর্তে ডাঃ দশরথ ঘরে ঢুকে সুপার সাহেবকে বলতে শুরু করলেন, 'স্যার, ডাঃ পাণ্ডুর মামার ফোন নাম্বার পাওয়া গিয়েছে। ওর সঙ্গে কথা বললাম, কিন্তু, ওঁরা নাকি এখন কাশ্মীরে।'

সুপার সাহেব আর ডাঃ দশরথ কথা বলতে বলতে ফের ড্রয়িংরুমে ঢুকে গেলেন। সেই ফাঁকে ফের জানলার দিকে তাকিয়ে ফুলমণি দেখলেন, জুঁইগাছের তলায় কেউ নেই। ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় ফুলমণি অনুভব করলেন, শরীরের উপর থেকে একটা ঠান্ডা স্রোত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। প্রেতাত্মা বলে যে কিছু আছে, তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। তাঁর বাড়িতেই পেরেত বাঁধা আছে। কিন্তু বললে হয়তো কেউ বিশ্বাসই করবেন না এতদিন পরে একটু আগে তিনি লংম্যান সাহেবকে দেখেছেন! কুন্তী দিদিমণির কোয়ার্টারে তা হলে উনি আটকে রয়েছেন!

সুপার সাহেব ও ডাঃ দশরথ কথা বলতে বলতে কোয়ার্টার ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

ওঁদের সঙ্গে পা মেলাতে গিয়ে ফুলমণি টের পেলেন, পা তুলতেই পারছেন না। এমন ভারী হয়ে গিয়েছে। কোনওরকমে বাইরে বেরিয়ে এলেন ফুলমণি। তখনই শুনতে পেলেন ডাঃ দশরথ চাপা স্বরে বলছেন, 'ডাঃ পাণ্ডুদের চান্সেস অফ সার্ভাইভাল খুব কম স্যার। কতদিন আর লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবেন? দু'জনের জিই এস মানে গ্লাসগো কোমা স্কেল দেখলাম, দশ-এগারোর মধ্যে। সাত আটের মধ্যে নেমে গেলেই ক্লিনিক্যালি ডেড। আমার মনে হয় স্যার, হাসপাতালের কুলিং চেম্বারটা রেডি করে রাখা হোক। খারাপ কিছু হলে যাতে ওখানে বডি দুটো রেখে দেওয়া যায়।'

সুপার সাহেব বললেন, 'কিন্তু আমাদের কুলিং চেম্বার এখন কী অবস্থায় আছে, কেউ জানে? বছর চারেক হল, আমি এই হাসপাতালে এসেছি। আমার আমলে কুলিং চেম্বারটা খোলার কখনও দরকার হয়নি। চলুন তো গিয়ে দেখি। মনে হয়, খালিই পড়ে আছে।'

সবাই মিলে হাঁটতে হাঁটতে মর্গের ভিতর এসে ঢুকলেন। একেবারে ভিতরের দিকে সেই কুলিং চেম্বার।

মুর্দফরাশ চেম্বারের দরজা খুলতেই সবাই দেখতে পেলেন, ভেতরে একটা লাশ শোয়ানো রয়েছে। 'কার ডেডবডি এটা?' সুপার সাহেব প্রশ্নটা করতেই চমকে উঠলেন ফুলমণি। দু'পা এগিয়ে লাশের দিকে তাকিয়েই তিনি চিনতে পারলেন। পাঁচ বছর পর এখনও অবিকৃত রয়েছে দেহটা। এ তো লংম্যান সাহেব!

সাহেবের ডেডবডি তা হলে এতদিন কুলিং চেম্বারে রাখা ছিল! পাছে কোনওদিন মেমসাহেব এসে দাবি জানান, সেই কারণে। নতুন সুপার সাহেব না হয় তা জানতেন না। কিন্তু, মা কেন মিথ্যে বলেছিলেন ওকে? কেন বলেছিলেন, লংম্যান সাহেবের ডেডবডি ওঁর স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে? সাহেবকে তা হলে গোরই দেওয়া হয়নি! তাই উনি প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেরাচ্ছেন। একটু আগে দেখা দিয়ে কি সাহেব সেই কথাটাই ওঁকে বলতে চাইছিলেন? ইশ, কেন আরও আগে দেখা দেননি লংম্যান সাহেব? কথাটা ভাবতেই চোখে জল উপছে এল সিস্টার ফুলমণির। মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে ফুলমণিই ঠিক করে নিলেন, যে যা ইচ্ছে ভাবুক, লংম্যান সাহেবের মৃতদেহ তিনিই দাবি করবেন হাসপাতাল থেকে। সাহেবের দেহ যাতে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে সমাহিত হয়, তারও ব্যবস্থা করবেন। কেননা, মারা যাওয়ার আগে মা একটা সত্যি কথা বলে গিয়েছিলেন...ওঁর আসল পিতা কে!

২৩

মায়ের গলা শুনে ঘুম ভাঙল পাণ্ডুর। উঠোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। গলার স্বরটা শুনে মনে হল না, মা আপ্যায়নের সুরে কথা বলছে।

দু'চোখ থেকে সুগন্ধির পাতা সরিয়ে পাণ্ডু দেখল, ও মায়ের ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে। আজকাল শোয়ার পরই ওন্ডুর কথাগুলো ওর মাথায় ভিড় করে আসে। শুয়ে

শুয়ে অনেকটা সময় ধরে ও পাপ-পুণ্য নিয়ে ভাবে। তাই অনেক দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। কয়েকটা প্রশ্ন ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। কার অনুশাসনে ওকে এই মায়ালোকে আসতে হয়েছে? কে ওর পাপ-পুণ্যের বিচার করবে? করবেই বা কেন? সুযোগ পেলে মাকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে রয়েছে পাণ্ডুর। কিন্তু, সাহসই করতে পারছে না। মায়ালোকে দেখা হওয়ার পর থেকে পাণ্ডু লক্ষ করছে, মা হুটহাট রেগে ওঠে। অযৌক্তিক সন্দেহ করে। লোকজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে খারাপ ব্যবহার করে ফেলছে। এমনকী, তুচ্ছ কারণে ওকেও একবার মেজাজ দেখিয়েছে।

পাণ্ডুর আশঙ্কা হচ্ছে, এই মুহূর্তে যদি প্রশ্নগুলো করে, তা হলে ভ্রূ কুঁচকে মা জিজ্ঞেস করবে, 'তোর মাথায় এ সব কথা কে ঢোকাল রে? হরিপ্রিয়া নাকি? ওর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল বুঝি? তোকে বলেছি না, ওদের সঙ্গে বেশি কথা বলবি না? যত সব হিংসুটে মেয়েছেলে।' মা এই সব উলটোপালটা কথা বলবে। ফলে আসল উত্তর পাওয়া যাবে না।

বিছানায় উঠে বসে পাণ্ডু আড়মোড়া ভাঙল। সেই সময় খর পায়ে ঘরে ঢুকে...জানলা খুলে দিয়ে মা বলল, 'তোর ছোটোবেলাকার বদঅভ্যাসটা এখন গেল না।'

কথাটা খট করে কানে এসে বাজল পাণ্ডুর। আড়চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, থমথমে মুখ, ঝড়ের পূর্বাভাস বলে মনে হল। ঘুম থেকে ওঠার পর মায়ের কী এমন হল যে, মেজাজ তিতকুটে করে রেখেছে? ও নরম গলায় বলল, 'কী বদভ্যেস, মা?'

'এই...ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিড়বিড় করা। কার সঙ্গে কথা বলছিলিস রে, কুন্তী?'

মায়ের গলায় আক্রমণাত্মক সুর। চোখচোখিই হতেই পাণ্ডু মাথা নীচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। ও বুঝতে পারল না, মা কুন্তীর কথা তুলল কেন? কুন্তিকে কি মা পছন্দ করছে না? কুন্তীর মা হরিপ্রিয়া মাসিকে যে মা অপছন্দ করে, সেটা প্রথমদিন ওর মনে হয়নি। বরং সেদিন মা উলটো কথাই বলেছিল। কিন্তু, যাকে মা কোনওদিন দেখেইনি, সেই কুন্তীর উপর মা এত বিরাগভাজন হল কেন?

ছোটোবেলায় চিলেকোঠায় মা ওর জন্য একটা পড়ার ঘর করে দিয়েছিল। প্রায়ই পড়তে পড়তে টেবিলে মাথা রেখে পাণ্ডু ঘুমিয়ে পড়ত। নীচ থেকে চুপিচুপি উপরে উঠে প্রায়ই মা নজরে রাখত, ও পড়ছে কি না। ঘুমিয়ে পড়লে প্রায়ই পাণ্ডু স্বপ্ন দেখত। কখনও দেখত, পরীক্ষার হলে অনেক দেরিতে পৌঁছেছে, পেন নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে। কখনও দেখত, পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। সুরো ওর থেকে অনেক বেশি নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হয়েছে। বেশিরভাগ খারাপ খারাপ স্বপ্ন পাণ্ডু দেখত, পড়াশুনো নিয়ে। একবার এমনও দেখেছিল, সুচন্দ্রা ওর আন্সার পেপার কেড়ে নিয়ে নকল করছে। স্কুলের স্যার সেটা দেখতে পেয়ে ওকে পরীক্ষার হল থেকে বের করে দিচ্ছেন। ভয়ানক ওই স্বপ্নে মায়ের কথা ভেবে পাণ্ডুর সারা শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল। স্যারের সঙ্গে ওই তর্ক জুড়ে দিয়েছিল। সেদিনও ঘুম থেকে তুলে দেওয়ার সময় মা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কার সঙ্গে বিড় বিড় করিছিলি রে?'

সেদিন মাকে সত্যি কথাটা ও বলে দিয়েছিল। শুনে মা বলেছিল, 'খবরদার, তুই ওই মেয়েটার সঙ্গে আর কথা বলবি না। পরীক্ষা দেওয়ার সময় ওর ধারে-কাছে বসবি না। তেমন হলে আমি তোর স্যারের সঙ্গে গিয়ে কথা বলব। যাতে তোকে আলাদা কোথাও বসায়।' পরে অবশ্য স্যারের কাছে গিয়ে মা আর কমপ্লেন করেনি। কিন্তু, ওর ভালো-র জন্য মা তখন সব কিছুই করতে পারত। একটু বড়ো হওয়ার পর পাণ্ডু অবশ্য অনেক কিছুই লুকোতে শিখেছিল মায়ের কাছে থেকে। ওকে 'শিক্ষিত' করেছিল সুচন্দ্রা। মায়ের কাছে কোন কথাটা বলা উচিত, আর কোনটা নয়, সুচন্দ্রাই তখন ওকে শিখিয়ে দিত। এমন সুন্দর ভাবে শিখিয়ে দিত যে, মায়ের কাছে পাণ্ডু কোনওদিন ধরা পড়েনি।

সুচন্দ্রার কথা ভেবে লাভ নেই। মায়ের সঙ্গে এখন সমঝে কথা বলা দরকার। বিছানা ছেড়ে উঠে চুপচাপ পাণ্ডু মুখ ধুয়ে নিল। পিছন থেকে তখনই মা বলল, 'এই শোন, ঠাকুরমণি এসেছে। তোর জন্য অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে ওকে তাড়াতাড়ি বিদেয় করিস।'

প্রশ্নটা করার ইচ্ছে না থাকলেও, পাণ্ডুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কেন মা?'

'আমি প্রায়শ্চিত্তির করতে যাব। সেজন্য আমায় তৈরি হতে হবে। যা বললাম, তাই কর।' কথাগুলো বলেই হাতে ফুলের সাজি নিয়ে মা...বড়ো বড়ো পা ফেলে বাইরে চলে গেল।

বাইরে বেরতেই দাওয়ায় ঠাকুরমণিকে দেখতে পেল পাণ্ডু। পরণে সাদা সিল্কের থান। চুলগুলো একেবারে শণের মতো। মায়ালোকে আসার দিন নিজেই পরিচয় দিয়েছিলেন ঠাকুরমণি... তিনি সিস্টার ফুলমণির মা। ইচ্ছে থাকলেও পাণ্ডু সেদিন খুব বেশিক্ষণ কথা বলতে পারেনি ঠাকুরমণির সঙ্গে। মা তাড়াতাড়ি ওকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মাঝে ওঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। দাওয়ায় উঠে তাই জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন আপনি?'

'ভালো আছি বাপ। তুর সনে কথা কইতে আলাম।'

বলেই সিস্টার ফুলমণির খোঁজ নিতে শুরু করলেন ঠাকুরমণি। মেয়ের খুব প্রশংসা শুরু করলেন। ছোটোবেলা থেকেই নাকি ওঁর ফুলি খুব বুদ্ধিমতী। দশ ক্লাস পাস দিয়েছিলেন। লংম্যান সাহেব খুব স্নেহ করতেন তখন ওঁকে। আর লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, গাঁয়ের লোকেদের সহ্য হল না। ওরা পিছনে লেগে গেল। লংম্যান সাহেব বাধ্য হয়ে ফুলমণিকে তখন নার্সিং ট্রেনিংয়ে ঢুকিয়ে দিলেন। ঠাকুরমণি আক্ষেপ করতে লাগলেন, গাঁয়ের লোকে বদনাম দেওয়ায় মেয়ের জন্য মনোমতো পাত্তর জোগাড় করতে পারেননি তিনি। মেয়ের বিয়েটাও সুখের হয়নি। জামাই কোনও কাজ কাম করত না। মেয়ের পয়সায় বসে বসে শুধু গাঁজা খেত, আর হাড়িয়া গিলত। মেয়ের প্রতি মায়া যে ঠাকুরমণি এখনও কাটাতে পারেননি, প্রতি কথায় সেটা ফুটে বেরচ্ছিল।

সিস্টার ফুলমণির অতীত সম্পর্কে শম্ভুদার মুখে কিছুটা শুনেছে পাণ্ডু। তার কতখানি সত্যি, তা যাচাই করার জন্য ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তো লংম্যান সাহেবের কোয়ার্টারে কাজ করতেন, তাই না?'

'হ। মু আসপাতালের স্টাফ ছিলাম বটে। সাহেবের কোয়ার্টারে মোর ফ্লাইং ডিউটি ছিলক।' বলে তার পর হাসপাতালের গল্প করতে লাগলেন ঠাকুরমণি। ফ্লাইং ডিউটি মানে সকাল থেকে সন্ধে। গাঁয়ের বাড়ি থেকে রোজ তখন উনি যাতায়াত করতেন হাসপাতালের কোয়ার্টারে। আর রোজ রোজ মেমসাহেবের সঙ্গে লংম্যান সাহেবের ঝগড়া দেখতেন। সামান্য সামান্য কারণে দু'জনের মধ্যে তুমুল চিৎকার চেঁচামেচি। ঝগড়ার কারণ, একটা সন্তানের আশা করেছিলেন সাহেব। যা দেওয়া সম্ভব হয়নি মেমসাহেবের পক্ষে। নিজের অক্ষমতার কারণেই নাকি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন মেমসাহেব। সাহেবের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিলেন। তারপর একটা সময় রাগারাগি করে দেশে চলে যান। তখন সাহেবের সংসার দেখার দায়িত্ব এসে পড়ে ঠাকুরমণির উপর।

'গাঁ থিকে মু উর সর্ভেন্টস কোয়ার্টারে চইলে গিলাম। সাহেবটা খুব ভালো ছিলক রে। মোর সনে সুখ-দুখের কথা কইত। মেমসাহেব লাই, রেতে ঘরে একা ঘুমাইতে পারতক না। মোকে উয়ার ঘরে লিয়ে যেতক। তুকে সত্যি কথাটা কই বাপ। ফুলমণি আমার মরদের বাচ্চা লয় রে। উ লংম্যান সাহেবের মেয়ো।'

কথাটা বলেই ঠাকুরমণি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। পাণ্ডু ঠিক বুঝতে পারল না, কী কারণে উনি দেখা করতে এসেছেন? আড়চোখে ও একবার বাইরের দিকে তাকাল। মা তাড়াতাড়ি বিদেয় করতে বলেছিল ঠাকুরমণিকে। যদি এই সব কথাবার্তা মায়ের কানে যায়, তা হলে মারাত্মক চটে যবে। মা বোধ হয় আশপাশে কোথাও নেই। মনে হয়, ফুল তুলতে বেরিয়েছে। লংম্যান সাহেবের শেষ পর্যন্ত কী হল, সেটা জানার তীব্র কৌতূহল হচ্ছিল পাণ্ডুর। সেটা দমন করতে না পেরে ও জিজ্ঞেস করল, 'লংম্যান সাহেব কেন ফিরিয়ে আনলেন না মেমসাহেবকে?'

'দেশ থেইকে মেমসাহেব কী যেন চিঠিঠি পাঠাইনছিলেন। তার পর উ মানুষটার মাথা খারাপ হইয়ে গেল। ঘর থেইকে বেরতক না। আসপাতালে যেতক না। মোকে দেখলে রেগে উঠতক। শুধু মেয়ার সামনে চুপ। তার পর একদিন সক্কালে মু দেখি, কুয়োতলায় পড়ি আছেইন। অক্তে চারদিক ভেসে যেতেনছিল গ। পুলিশ আসি কইল, বন্দুক দিয়া লংম্যান সাহেব সুসাইড করিনছেন।'

'সুইসাইড করলেন কেন?'

'আসপাতাল থেইকে চাকরি গেইনছিল যে বাপ। গিজ্জার পাদরিদের সনেও উয়ার ঝগড়া হইনছিল।'

'পরে মেমসাহেব কি দেশ থেকে আর ফিরে এসেছিলেন?'

'না আসে লাই। সাহেবের ডেডবডি কবরেও যায় লাই। উর আত্মা শান্তি পায় লাই রে বাপ। অ্যাখুনও হুই কোয়ার্টারে ভটকাইনছে। মুনে হয়, প্রেতযোনি হইয়েনছে। উয়ার কথা ভাবলে মন খারাপ হইয়ে যায়। কথাটো মোর মেয়া জানে না বাপ। জানলি উর গোর দেওয়ার ব্যবস্থা করতক বটে।'

শুনে চমকে উঠল পাণ্ডু। ঠাকুরমণি ঠিকই বলেছেন। লংম্যান সাহেব তা হলে প্রেতাত্মা হয়েই ঘুরে বেরাচ্ছেন। কুন্তীর সঙ্গে শিসপাহাড়ি জংশনে আসার রাতে ও তা হলে লংম্যান সাহেবের ভূতকেই দেখেছিল কোয়ার্টারের গেটে। জীবিতকালে নিশ্চয়ই ভালোমানুষ ছিলেন। মরণের পরেও তাই কারও কোনও ক্ষতি করেননি লংম্যান। মনে মনে এই কথাগুলো ভেবে পাণ্ডু বলল, 'সিস্টার ফুলমণিকে এ সব কথা বলেননি আপনি?'

'ভুল করেইনছি বাপ। মায়ালুকে আসার পর একবার শিসপাহাড়িতে গেইনছিলাম। মেয়ার কানছে কওয়ার জন্য, তুর বাপডাকে গোর দেওয়া কর। না করলি মায়ালুকে মোকে ভটকাইনতে হবেক। কিন্তুত, মেয়া সেদিন অযোধ্যা পাহাড়ে গেইনছিল। উয়ার দেখা পাই লাই। মোর আর উপায় লাই রে বাপ। শিসপাহাড়ি যাওয়ার শক্তি লাই রে। দুখে মোর বুক ফেইটে যায় মরদডার জন্য।'

মা নিশ্চয়ই আড়াল থেকে সব কথা শুনছিল। এবার দাওয়ায় উঠে...সামনে এসে কড়া গলায় বলল, 'তুই এত আক্ষেপ করছিস কেন ঠাকুরমণি? অ্যাদ্দিন অধর্ম্ম করেছিস। এখনও করে যাচ্ছিস। পাপের ফল তো তোকে ভোগ করতেই হবে।'

শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেল ঠাকুরমণির মুখ। পাণ্ডুর দিকে তাকিয়ে তার পর তিনি কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। মা বলল, 'থাক, তোকে আর সাফাই দিতে হবে না ঠাকুরমণি। তোর কুকীর্তি তো নিজের কানেই শুনলাম। এ বার চুপ কর। হ্যা রে, ছেলের বয়সি একজনের সঙ্গে এইসব কথা আলোচনা করতে তোর বিবেকে একটুও বাঁধল না? ছিঃ ছিঃ।'

মা যখন বকাবকি করে, তখন কেউ কথা বললে প্রচণ্ড রেগে যায়। এটা মায়ের বরাবরের অভ্যেস। যার উপর রাগারাগি করছে, সে চুপ করে থাকলে একটা সময় মাও চুপ করে যায়। মায়ালোকে এসেও মা নিজেকে বদলায়নি। পাণ্ডু জানে, এখন কোনও কথা বলতে গেলে মা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে। তবুও, ঠাকুরমণির লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে ও বলে ফেলল, 'তুমি এ কী বলছ মা? উনি তো অধর্ম্ম করেননি। লংম্যান সাহেব একটা সন্তান চেয়েছিলেন, উনি স্বেচ্ছায় দিয়েছেন। এতে অধর্ম্মের কী হল।?'

মা রূঢ় গলায় বলল, 'সেটা বোঝার মতো বয়স তোর এখনও হয়নি পাণ্ডু। হিন্দু শাস্ত্রে বলে, পরপুরুষের সঙ্গে সহবাস করা পাপ। যুগে যুগে এই অনুশাসনগুলো মানুষ মেনে এসেছে বলেই সমাজটা এখনও টিকে আছে, বুঝলি? এইখানেই তো জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে মানুষের তফাত। নিজে পাপ করেছে, আর সেই পাপের কথা আবার ইনিয়ে বিনিয়ে ঠাকুরমণি তোকে বলছে। কাঁহাতক সহ্য করা যায়।'

'মা, শাস্ত্রে এমন অনেক কিছু আছে, যা এখনকার সমাজে খাপ খায় না। সমাজ অনেক বদলে গিয়েছে। আগে যা পাপ বলে মনে করা হত, এখন তা পাপ বলে ভাবাই হয় না। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। শুধু বলি, পুরাণ আর রামায়ণ-মহাভারতে এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে মহিলারা পরপুরুষের কাছ থেকে সন্তান নিয়েছেন। সমাজ তাদের মেনেও নিয়েছে। তা হলে ঠকুরমণিকে দোষ দিচ্ছ কেন মা?'

'তুই কেমন ছেলে রে পাণ্ডু? মায়ের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে, তুই এখন ঠাকুরমণির হয়ে সাফাই গাইছিস...!'

কথাটা বলে মা ঘুরে দাঁড়াল। তার পর শ্লেষের সঙ্গে বলল, 'পুরাণের ওঁরা হলেন দেব-দেবী। শাস্ত্র ওঁদের যা ইচ্ছে, তাই করার অধিকার দিয়েছে। আমাদের কিন্তু দেয়নি।'

'মানতে পারলাম না মা। দেব-দেবী...সব মানুষের মনগড়া কল্পনা। একটা কথা তোমায় বলে রাখি, দেশের আইন কিন্তু শাস্ত্রের পথে হাঁটে না। দেশের আইন অনেক সময় উলটো কথা বলে। পরপুরুষের সন্তান এখন যে কোনও মহিলাই ধারণ করতে পারেন। সারোগেট মাদার বলে একটা কথা আছে। আইন তাতে সম্মতি দিয়েছে।'

'ছাড় তোর আইনের কথা। এসব কী বলছিস, তুই পাণ্ডু! কত আশা করে তোকে আমি রামকৃষ্ণ মিশনে পড়িয়ে ছিলাম। ভালো সংস্কার পাবি, ভালোভাবে জীবনটা কাটাবি। এখন তো মনে হচ্ছে, আমার চেষ্টাটাই জলে চলে গেছে। হায় রে, আমার পোড়া কপাল।' কথাগুলো মা চিৎকার করে বলল।

বেড়ার বাইরে বেশ কিছু মহিলা হাজির হয়েছেন মায়ের কান্না শুনে। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রয়েছেন দাওয়ার দিকে। লজ্জায় পাণ্ডু পিছু হটে বলল, 'শান্ত হও মা। সামান্য কথা নিয়ে তুমি এত রাগ করছ কেন?'

'চুপ কর।' মা আরও রেগে বলল, 'মুখে মুখে কথা বলবি না। এখন তো মনে হচ্ছে, তোর মতো ছেলে পেটে ধরে আমি ভুল করেছি। তুই তো এ রকম ছিলি না পাণ্ডু। এমন বদলে গেলি কেন রে? কার খপ্পরে গিয়ে পড়লি? প্রেম করলি এমন একটা মেয়ের সঙ্গে...যার চরিত্রের ঠিক নেই। তাকে আবার তুই বিয়ে করার কথা ভাবছিস?'

আবেগে কাঁপতে কাঁপতে মা দাওয়ার উপর বসে পড়েছে। অবাক হয়ে পাণ্ডু সেদিকে তাকিয়ে রইল। কার কথা বলছে মা? কুন্তী...কুন্তীর চরিত্রের ঠিক নেই? মা কি পাগল হয়ে গেল? কী সব আজে বাজে কথা বলছে। পাণ্ডু হঠাৎ খুব বিষণ্ণবোধ করল। সরাসরিই ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কুন্তীর কথা বলছ মা?'

মা বলল, 'হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি। ওর নামটাও উচ্চারণ করতে আমার ঘেন্না হচ্ছে। তুই কি জানিস, ও এখন কোন লোকে আছে? ভ্রূণলোকে। মেয়েদের কেন ভ্রূণলোকে যেতে হয়, জানিস? ভ্রূণহত্যার মতো পাপের সাজা পাওয়ার জন্য। গর্ভপাত করানোর অপরাধে। কুমারী অবস্থায় যে মেয়ে এই পাপ করতে পারে, তাকে তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিলি। ছিঃ।'

শুনে মাথা টলে উঠল পাণ্ডুর। ও বলল, 'তুমি জানতে পারলে কী করে মা?'

'মায়ালোক যাঁর কথায় চলে, সেই লোকপালকে খোঁজ নিতে বলেছিলাম। ভ্রূণলোতে ধাই বুড়িমার কাছে উনি জানতে পেরেছেন, কুন্তী এখন ওখানেই আছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে, তুই এখানকার লোকপালের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারিস। ছাড় ও সব কথা। আমার মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে গিয়েছে। প্রায়শ্চিত্তিরের জন্য আমায় বেরতে হবে। তার আগে ঠাকুরমণিকে চলে যেতে বল।'

ঠাকুরমণি লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অপমানে সারা শরীর ওঁর কাঁপছে। যাতে উনি পড়ে না যান, সেই কারণে পাণ্ডু উঠে গিয়ে হাত দুটো ধরে ফেলল। ঠাকুরমণির সঙ্গেই ও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। মনটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। মা পাগলের মতো কথা বলছে। আর শোনা সম্ভব না। দাঁড়িয়ে থাকলে ও হয়তো মাকেই অপমানকর কিছু বলে ফেলবে। নাহ, মায়ের কাছ থেকে এক্ষুনি সরে যাওয়া দরকার। বাড়ির বাইরে গিয়ে পাণ্ডু ঠিক করে নিল, ওকে একবার মায়া সাগরের দিকে যেতে হবে।

২৪

মায়াসাগরের বেলাভূমিতে পৌঁছে পাণ্ডু চিৎকার করে ডাকল, 'ওড্ডু, তুমি কোথায়? যেখানেই থাক, শিগগির চলে এসো।'

আগের দিন বেলাভূমিতে কেউ ছিল না বললেই চলে। আজ বেশ ভিড়। ও যখন চিৎকার করে ওড্ডুকে ডাকল, তখন অনেকেই ওর দিকে কৌতূহলভরে তাকাল। কিন্তু, কেউ জিজ্ঞেস করল না, ও কাকে ডাকছে? মায়ালোকে এটাই নিয়ম। কেউ কোনও প্রশ্ন করে না। একবার নয়, তিন তিনবার বুকের শেষ শ্বাসটুকু দিয়ে পাণ্ডু ডাকল ওড্ডুকে। নিজেকে ওর পাগল পাগল বলে মনে হচ্ছে। মায়ের বাক্যবাণে অস্থির হয়ে ও আজ বেরিয়ে এসেছে। কোনওদিন ভাবতে পারেনি, মা ওর সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করবে।

মায়াসাগরের দিকে আসার সময় পাণ্ডু ঠিকই করে ফেলেছে, ওড্ডুর সঙ্গে ও আজই মায়াসাগরের ওপ্রান্তে... দৈত্যলোকে চলে যাবে। ওড্ডু বলেছিল, তোমাকে আমি আশ্চর্য একটা জায়গায় নিয়ে যাব। যেখানে কারও কোনও দুঃখ নেই, অভিমান বা আক্ষেপ নেই। সেখানে কেউ কারও ভুল ধরে না। মারামারি, হানাহানির কথা কেউ ভাবতেও পারে না। সেখানে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।' কিন্তু, কোথায় ওড্ডু? তার পাত্তাই নেই। আগের দিন ও বলে গিয়েছিল, যখন ইচ্ছে ডাকলেই, হাজির হবে। ওড্ডুর আশায় মায়াসাগরের অপর প্রান্তে যতদূর চোখ যায়, পাণ্ডু তাকিয়ে রইল। ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সেদিন মায়াসাগরে রং ছিল গোলাপি। এখন রক্তের মতো লাল। মা একবার বলেছিল বটে, মায়াসাগর রং বদলায়। অন্য সময় হলে, পাণ্ডু ভাবতে বসত, এর বৈজ্ঞানিক কারণটা কী? কিন্তু, আজ ওর মন এমন বিষাদগ্রস্ত যে, লাল-গোলাপি রং নিয়ে মাথা ঘামানোর একবিন্দু ইচ্ছে ওর হল না।

আগের দিন পাখির ঝাঁক মায়াসাগরের ঠিক উপরে খেলা করছিল। ওড্ডুকে খোঁজার জন্য তাই পাণ্ডু এ বার উপরের দিকে তাকাল। না, পাখির কোনও ঝাঁক ওর চোখে পড়ল না। আকাশ জুড়ে ভাসমান রং-বেরঙের গাছ। ডালে হীরে, চুনী, পান্নার আলো...ঝলমল করছে। ভাসতে ভাসতে গাছগুলো দৈত্যলোকের দিকে সরে যাচ্ছে। পাণ্ডুর একবার ইচ্ছে হল, মায়াসাগরের জলে ঝাঁপ দেয়। সাঁতার কাটতে কাটতে ওড্ডুর দেশে চলে যায়। কিন্তু, জলের রং দেখে ও সাহস পেল না। টকটকে লাল, যেন গিলে

খেতে আসছে। মায়ের কাছে ও শুনেছে, মায়াসাগরের জলে নামা উচিত নয়। তাতে ক্ষতি হতে পারে। তবে, মায়ের কোনও কথাই পাণ্ডু এখন আর বিশ্বাস করতে পারছে না। কেননা, খানিকক্ষণ আগে মা ওকে বোঝানের চেষ্টা করছিল, কুন্তী খুব খারাপ চরিত্রের মেয়ে!

আজ পর্যন্ত কোনওদিন মায়ের অবাধ্য হয়নি পাণ্ডু। ছোটোবেলা থেকে মা যখন যা বলেছে, ভালো না লাগলেও তা ও মেনে নিয়েছে! খুব আপশোশ হত, যখন ভাবত, মা কখনও ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা করেনি। সুরো মাঝে মাঝেই বলত, 'তোর মায়ের জন্য...তোর পার্সোনালিটি গ্রো করল না রে পাণ্ডু। পরে তুই খুব পস্তাবি। আমার বাবা-মাকে দ্যাখ, আমার কোনও ব্যাপারে নাক গলাতে আসে না। আমার ব্যাপারে আমিই সব ডিসিশন নিই। মায়ের আঁচল ছেড়ে এ বার তুই বেরিয়ে আয়।'

সুরো কথাটা বলেছিল ডাক্তারি পড়ার সময়। তবু, ওর পরামর্শটা মনে আছে। সত্যি বলতে কী, স্বাধীনভাবে বাঁচা কাকে বলে, পাণ্ডু তার স্বাদ পেয়েছে মা মারা যাওয়ার পর থেকে। শিসপাহাড়িতে কয়েকটা বছর ওর খুবই আনন্দে কেটেছে। বেলাভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে ও বিড় বিড় করে বলল, 'তুই ঠিকই বলেছিলি সুরো। সে সময়ই আমার বিদ্রোহ করা উচিত ছিল।'

ভিড় থেকে খানিকটা দূরে একটা স্ফটিক খণ্ডের উপর পাণ্ডু যখন বসতে যাচ্ছে, তখনই ও শুনতে পেল, 'কী হয়েছে রে পাণ্ডু, আমাকে আবার স্মরণ করলি কেন?'

পাশ ফিরে পাণ্ডু দেখল, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুরো। ওর সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল মুক্তি সোপানের লাইনে। একবার মনে করতেই ও উদয় হয়েছিল। সুরোকে দেখে অবাক হয়ে পাণ্ডু বলল, 'তুই!'

'আজই মায়ালোকে এসেছি। মায়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাচ্ছিলাম। তখনই তোর ডাক শুনতে পেলাম। হ্যাঁ রে, একটু আগে তুই কেন আমাকে বললি, তুই ঠিকই বলেছিলি সুরো। সে সময়ই আমার বিদ্রোহ করা উচিত ছিল। কী ঠিক বলেছিলাম রে তোকে? কেন তোর বিদ্রোহ করা উচিত ছিল? এই...তোর কী হয়েছে রে পাণ্ডু? তোকে এত আপসেট দেখাচ্ছে কেন?'

পরের প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়ে পাণ্ডু বলল, 'তুই ফিরি যাচ্ছিলি মানে? কোথায় ফিরে যাচ্ছিলি?'

'এতে অবাক হচ্ছিস কেন? আমি ইহলোকে ফিরে যাচ্ছিলাম। কত কাজ ফেলে এসেছি। সেগুলো তো সম্পূর্ণ করতে হবে। তোর মতো মায়ের আদর খেলে আমার চলবে না ভাই। ইহলোকের মায়া এখনও আমি কাটাতে পারিনি। আসার দিন মুক্তি সোপানে আমি পুলস্ত্য মুনিকে বলেই দিয়েছিলাম, পরলোকে যা শাস্তি দেওয়ার আমাকে পরে দেবেন। রিসার্চের কাজটা আগে আমায় শেষ করতে দিন।'

'উনি তাতে রাজি হয়ে গেলেন?'

'কেন হবেন না? কাজটা যে আমি সবার কল্যাণে করছি। শোন ভাই, শিসপাহাড়ে থাকার সময় এক আত্মার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। উনিই আমাকে পরলোক

আর প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে ভালোরকম আন্দাজ দিয়েছিলেন। ওঁর মুখেই শুনেছি, মানুষ মরে যাওয়ার পর তার আত্মা সঙ্গে সঙ্গে পরলোকে আসে না। সূক্ষ্ম শরীরে সে কিছুদিন অপেক্ষা করে। লক্ষ রাখে, তার পারলৌকিক কাজগুলো ঠিকঠাক হচ্ছে কি না? তারপর পরলোকে এসে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। তার ঘুম যখন ভঙে, তখন পাপ-পুণ্যের নিরিখে তাকে বিভিন্ন লোকে পাঠানো হয়।'

অদ্ভুত সব কথা বলছে সুরো। পাণ্ডুর মাথায় ঢুকছে না। ও প্রশ্ন করল, 'আত্মারা ঘুমোয় কেন?'

'ইহলোকে বাস করার সময় নানা ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে জীবাত্মা যুক্ত থাকে। তাই মারা যাওয়ার পর সে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম চায়। কোনও কিছুই তখন তার ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। এমনকী, স্বয়ং ভগবান সেই নিদ্রায় বাধা দেন না। মুশকিল হল, যেসব জীবাত্মা ইহলোকে থেকে উৎকণ্ঠা, দুঃখ, নানা যন্ত্রণার অনুভূতি নিয়ে পরলোকে আসে, ভোগের জিনিসের উপর তাদের আসক্তি থেকে যায়। সেজন্য আধো ঘুমের মধ্যেও তারা নানা স্বপ্ন দেখে। সেই আসক্তিই তাদের ইহলোকে বারবার টেনে নিয়ে যায়।'

সুরো ঠিকই বলছে। ওর কথা শুনতে শুনতে লংম্যান সাহেবের কথা মনে পড়ল পাণ্ডুর। সিস্টার ফুলমণির কাছে একবার ও শুনেছিল, হাসপাতালের লনে লংম্যান সাহেব মনের মতো করে বাংলো তৈরি করেছিলেন। খুব সুন্দর করে সেটা সাজানোও। সেই কারণেই বোধ হয় আত্মহত্যা করার পরও কোয়ার্টারের মায়া ছেড়ে যেতে পারেননি। ও বলল, 'প্রেতাত্মারা কি বুঝতে পারে, সে মরে গিয়েছে?'

'ভালো প্রশ্ন করেছিস পাণ্ডু। এ সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ অনেক কিছু লিখে গিয়েছেন। না, প্রেতাত্মারা সব সময় বুঝতে পারে না। অনেক প্রেতাত্মার জ্ঞান থাকে, অর্থাৎ তারা সচেতন হয়, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যথার্থ মরে গিয়েছে কি না। তারা আধো ঘুমের মাঝে থাকে। সেই সময় তাদের অনেক কিছু গোলমাল হয়ে যায়। বলতে পারিস, একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তারা যায়। বিদেহী অবস্থায় আত্মারা আত্মীয়স্বজন আর পরিচিতি পরিবেশের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সেই অবস্থাটা ওদের কাছে খুব বেদনাদায়ক। লোকে তখনই ওদের ভয় পায়। ইহজীবনে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও সময়ে তুই ভূতের গল্প পড়েছিস। এক আধটা হরর ফিল্মও দেখেছিস। ভূত বা আত্মাদের ভয়ংকর প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে বরাবর। সেটা ওদের ওই বিশৃঙ্খল পর্যায়ের গল্প। তুই লক্ষ করেছিস কি না জানি না, ভূতের গল্পর শুরু আর শেষ হয় কোনও পোড়ো বাড়িতে, না হয় নির্জন কোনও জায়গায়। কারণটা হচ্ছে, ওই আধোঘুমের সময় বিরক্ত করলে আত্মারা রেগে যায়।'

'তুই এখন কোন অবস্থায় আছিস সুরো?'

'ইহলোকে একদল মনুষ আছে, যাঁরা প্রবল উদ্যম, তীব্র আগ্রহ আর ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কোনও কিছু পাওয়া বা আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। কিন্তু, সেটা পাওয়ার আগেই কোনও কারণে যদি মারা যায়, তা হলে তাদের আত্মা নিয়েই পরলোকে যত সমস্যা

হয়। কাজটা সম্পূর্ণ করার তাগিদে এই আত্মারা বারবার ইহলোকে ফিরে যেতে চায়। হয়তো দ্রুত পুর্নজন্মও নিতে হয়। আমি এই আত্মাদের দলে পড়ি। শিসপাহাড়ে এই কথা জানতে পেরেছিলাম বলে, চেকপোস্টে পুলস্ত্য মুনির কাছে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময়...আমি ইহলোকে বারবার যাওয়া-আসার অনুমতি চেয়েছিলাম। উনি আমার ভিডিয়ো ক্লিপিংস খুঁটিয়ে দেখে...তাতে আপত্তি করেননি। এটাকে তুই মাল্টিপল ভিসাও বলতে পারিস।'

'আমাকে আর কতদিন এই মায়ালোকে থাকতে হবে ভাই, বলতে পারিস?'

'কেন ওঁরা তোকে মেয়াদটা বলে দেননি?'

'না উলটে, চেকপোস্টে দিয়ে বেরনোর সময় মহর্ষি জরৎকারু কিন্তু আমাকে অন্য কথা বলেছিলেন।'

'কী বলেছিলেন রে?'

'আমার ভিডিয়ো ক্লিপিংস উনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। উপায় না দেখে উনি তখন বলেন, আপাতত তুমি মায়ালোকে যাও। পরে আমি তোমায় ডেকে নেব।'

'ইয়ারকি নাকি? তোর তখন প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। এত ভালো মানুষ হলে চলে? তোর সমস্যাটা কী জানিস পাণ্ডু, তুই চিরদিন মায়ের ছেলে হয়ে রয়ে গেলি। তোর পার্সোনালিটি ডেভেলপ করল না। তোর জায়গায় আমি হলে মহর্ষি জরৎকারুকে চমকাতাম।'

'এখন কী করা যায়, বল তো?'

'সত্যি বলতে কী, মুক্তি এক্সপ্রেসে আসার সময় তোর আর কুন্তীর কথাবার্তা শুনে আমারও মনে হয়েছিল কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। তুই শুনেছিস কিনা, আমি জানি না। পুরাণের আমলে যমরাজের সঙ্গে নচিকেতার একটা চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী, এখানে জোর করে কাউকে আনা যায় না। আটকে রাখা তো অসম্ভব। আমাকে সেই পয়েন্টেই লড়তে হবে। দাঁড়া, মায়ালোকে একজন লোকপাল আছেন। তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলে আসি। তুই কোথাও যাবি না। তা হলে ভিড়ের মাঝে তোকে কিন্তু আমি খুঁজে পাব না। তেমন হলে আজই তুই আমার সঙ্গে চলে যেতে পারিস। তখন না হয় শুনে নেব, তুই কেন আমায় স্মরণ করেছিলি?' কথাগুলো বলেই সুরো আর দাঁড়াল না। অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেলাভূমিতে বসে সুরোর কথাই ভাবতে লাগল পাণ্ডু। সত্যিই বোধ হয় সেদিন ওর প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। শিসপাহাড়ি জংশনে মুক্তি এক্সপ্রেস ওঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনই ওর নিজেকে আত্মা বলে মনে হয়নি। সুরোকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হত, আত্মার ডেফিনেশন কী? হাসপাতালে ডিউটি করার সময় সুরোর দেহ থেকে ও আর একজন বায়বীয় সুরোকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল। সেটাই কি আত্মা? সেই রাতে বেড থেকে নেমে সুরো প্রথমে বেসিনের কাছে গিয়েছিল। চোখ মুখে জল দিয়েছিল। তার পর হাঁটতে হাঁটতে ওর পাশ দিয়েই করিডোরের দিকে চলে যায়। তারও পর ওর ডাকে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে ঘরঘরে গলায় সুরো কী যেন

বলেওছিল। তার মানে ওর ইন্দ্রিয় শক্তিগুলো তখনও সক্রিয় ছিল। বেসিনের আয়নায় নিজের মুখ দেখা, জলের স্পর্শ নেওয়া, চলা, বলা, চিন্তন ক্ষমতা, সচেতনতা...ওর আত্মার সঙ্গেই দেহ ছেড়ে চলে এসেছিল। তার মানে সুরো একই রকম রয়েছে। শুধু মাত্র ওর স্থূল শরীরটা এখন নেই। কথাটা মনে হওয়া মাত্র একটা আতঙ্ক এসে গ্রাস করল পাণ্ডুকে। ওর নিজের স্থূল দেহটা তা হলে এখন কোথায়?

উত্তেজনায় পাণ্ডু উঠে দাঁড়াল। শিসপাহাড়ি রেলওয়ে জংশনে ওভারব্রিজ দিয়ে ও আর কুন্তীর হাত ধরাধরি করে যখন দৌড়াচ্ছিল, তখন তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে মুক্তি এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে, পাছে ট্রেন মিস হয়ে যায়, সেই কারণে ওদের অন্য কোনও দিকে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ওরা বুঝতে পারে, পায়ের তলায় ব্রিজ নেই। কুয়াশা ভেদ করে ওর নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। প্রথম ধাক্কায় পাণ্ডু টের পেয়েছিল, ছাইয়ের গাদায় পড়েছে। গড়াতে গড়াতে ওরা সেই সময় তেরো নম্বর প্লাটফর্মের কাছে পৌঁছে যায়। পাণ্ডুর এটুকু মনে আছে, ওদের সর্বাঙ্গে ছাইমাখা ছিল। ওদের প্রেতাত্মা বলে মনে হচ্ছিল।

অবাক হয়ে ওরা উপরের দিকে তাকাতেই তখন ছাইয়ের স্তূপটা দেখতে পেয়েছিল। কয়লার ছাই, ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে ফেলে দেওয়া... ঢিবির মতো হয়ে রয়েছে। চোট নিয়ে ওরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, তখনই কিমিন্দমকে দেখতে পায়। কিমিন্দমের কথামতো ওরা ট্রেনে উঠে পড়ে। পাণ্ডু মনে করার চেষ্টা করল, সেই সময় ওদের দেহ থেকে আত্মাটা কি বেরিয়ে এসেছিল? হয়তো আত্মা ধরে নিয়েছিল, দেহ আঁকড়ে থেকে লাভ নেই। অত উঁচু থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে দেহটা মরে গিয়েছে। পাণ্ডুর এইবার মনে পড়ল, প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটার সময় নিজেকে খুব হালকা লাগছিল ওর। তার মানে... ওদের দেহ দুটো রেলওয়ে ট্র্যাকে ছাইগাদার পাশেই তখন পড়েছিল। সর্বনাশ!

অজানা আশঙ্কায় ও যখন মুহ্যমান, সেই সময় পিছন থেকে কে যেন বলল, 'পাণ্ডু তুই এখানে? কখন থেকে তোকে আমি খুঁজে বেরাচ্ছি।'

মুখ ফিরিয়ে সুচন্দ্রাকে দেখে পাণ্ডু অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে রইল। ওড্ডু সেদিন বলেছিল বটে, সুচন্দ্রার সঙ্গে খুব শিগগির ওর দেখা হবে। আট-ন'বছর আগে সুচন্দ্রার সঙ্গে ওর শেষ দেখা হয় পুরুলিয়ার সাহেববাঁধের ধারে। ও সেদিন বলেছিল, বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। ওর বাবা একজন এনআরআই পাত্র ঠিক করেছেন। বিয়ের পর ওরা লন্ডনে যাবে। সেখানে জেনোট্রান্সপ্লান্টেশন নিয়ে পড়াশুনো করবে। সুচন্দ্রা আরও বলেছিল, 'তোর মতো একটা অর্ডিনারি এমবিবিএসকে বিয়ে করে জীবনটা নষ্ট করতে চাই না। প্লিজ, আর কোনও যোগাযোগ রাখিস না।'

শুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল পাণ্ডু। ও ধরেই নিয়েছিল, সুচন্দ্রা এখন লন্ডনে। কিন্তু, ও এই মায়ালোকে এল কী করে? সেদিনের সেই সুচন্দ্রার সঙ্গে অবশ্য আজকের এই সুচন্দ্রার অনেক তফাত। ওর সামনে হাসিমুখে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে পৃথুলা। কোনও রকম অপরাধবোধ নেই ওর মধ্যে। খুব নিরাসক্ত মুখে পাণ্ডু বলল, 'খুঁজছিস কেন? আমাকে কি আর তোর কোনও প্রয়োজন আছে?'

'আমার উপর খুব রেগে রয়েছিস, তা না? আমার হাতে সময় খুব কম। এক্ষুনি আমায় চলে যেতে হবে। তার আগে বলে যাই, অনেকদিন আগে তোকে একটা মিথ্যে কথা বলেছিলাম। ইহলোক ছেড়ে আসার পর প্রথমেই মনে হল, সত্যিটা তোকে জানানো দরকার।'

'থাক সুচন্দ্রা, পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটার ইচ্ছে আমার নেই।'

'তবুও, শুনে রাখ। তাতে আমি অন্তত শান্তি পাব। লন্ডনে আমি পড়তে গিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু বিয়ে করে যাইনি। বিয়ের কথাটা তোকে আমায় বলতে বলেছিলেন তোর মা। তোকে এমন অপমান করতে বলেছিলেন, তুই যাতে আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখিস। তুই তো জানিস, কাজ হাশিল করার জন্য তোর মা কত নীচে নামতে পারেন। আমার বাবার কাছে গিয়ে উনি এমনও হুমকি দিয়েছিলেন, এই কথাগুলো আমি যদি তোকে না বলি, তা হলে সুইসাইড করবেন। আর সুইসাইড নোটে আমার নামটা লিখে যাবেন।'

মায়ের পক্ষে অবশ্য সবই সম্ভব। তবুও, অবিশ্বাস করার ভঙ্গিতে পাণ্ডু বলল, 'এই কথাটা তুই মায়ের সামনে বলতে পারবি?'

'কেন নয়? এখন তো আমার পাওয়ার কিছু নেই। শুনেছি, তোর মা এখন মায়ালোকে। আমাকে এখনই তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারিস।'

'আমি যে মায়ালোকে আছি, সেই খবরটা তোকে কে দিল?'

'মুক্তি সোপানে মহর্ষি জরৎকারু। আমার কাছে জানতে উনি চেয়েছিলেন, মা তোমার শেষ ইচ্ছেটা কী? তখন আমি তোর কথা বলেছিলাম। তোর সঙ্গে যাতে একবার দেখা হয়। শুনে উনি বললেন, খুব অল্প সময়ের জন্য তোমাকে সেখানে পাঠাতে পারি।...তুই আমাকে ভুলে গেলে কী হবে পাণ্ডু, আমি কিন্তু সবসময় তোর খবর নিয়েছি। জানতাম, তুই শিসপাহাড়িতে আছিস। তোদের হাসপাতালের ডাঃ দশরথ আমার দূর সম্পর্কের ভাই। সে-ই আমাকে নিয়মিত তোর খবর দিত। শুনেছি, কুন্তী নামে একটা মেয়ের সঙ্গে তোর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। শুনে খুব ভালো লেগেছিল। আমি কিন্তু কখনও বিয়ের কথা ভাবিনি।'

কুন্তীর কথা ওঠায় একটু অস্বস্তি হল পাণ্ডুর। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য ও জিজ্ঞেস করল, 'তোকে পরলোকে আসতে হল কেন, সুচন্দ্রা?'

'তবুও ভালো, তুই জিজ্ঞেস করলি। তা ডিটেলে বলা যাবে না রে। ডাঃ দুর্বা মিশ্রের নামটা কি কখনও তুই শুনেছিস? ওড়িশার হেল্‌থ মিনিস্টার ছিলেন। কুন্তী কি কখনও তাঁর নার্সিংহোম... নবজীবনের কথা তোকে বলেছে? ওই নার্সিংহোমে কুন্তী একটা সময় চাকরি করত।'

'হ্যাঁ বলেছে। নার্সিং হোমটার মালিক আসলে নাকি ওর ছেলে অনুপম মিশ্র।'

'যাক, বাস্টার্ডটার নাম তা হলে তুই শুনেছিস। লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর আমি ওই নবজীবনে চাকরি নিয়েছিলাম। তখন জানতাম না, অনুপম মিশ্র একটা দুশ্চরিত্র, লম্পট আর ব্ল্যাকমেলার। অনেক ভালো মেয়ের সর্বনাশ করেছে; শুনে চমকে উঠিস না যেন, সেই সব মেয়ের মধ্যে ডাঃ কুন্তী মহাপাত্রও ছিল। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনুপম

ওকে রেপ করেছিল। বেচারী কুন্তী শেষে অ্যাবরসন করিয়ে লোকলজ্জায় শিসপাহাড়িতে গিয়ে লুকোয়। দুর্বা মিশ্র ওকে ভয় দেখিয়ে ছিলেন, যদি পুলিশের কাছে যায়, তা হলে ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে খুন করাবেন। কুন্তীর কথা আমি শুনেছিলাম, নবজীবনেরই ডাক্তার চপলা শতপথীর মুখে। উনি আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলন। কুন্তী কি এসব কথা তোকে কখনও বলেছে?'

শুনে পাণ্ডু উত্তরোত্তর আশ্চর্য হচ্ছে। ভাঙা গলায় ও বলল, 'না, কুন্তী কিছু বলেনি। হয়তো বলার সুযোগ পায়নি। অনুপম তোকেও অ্যাটেম্পট করেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ। সত্যি সত্যি, একদিন মদ্যপ অবস্থায় অনুপম আমার কোয়ার্টারে হাজির হল। বাস্টার্ডটার কাছে ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি ছিল। আমি সতর্ক হওয়ার আগেই জোর করে...। পরদিন চপলাদির কাছ থেকে মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে আমি সোজা চলে গেলাম চাউলিয়াগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে। কমপ্লেন লিখিয়ে তার পর গেলাম কলিঙ্গ সংবাদ বলে কাগজের অফিসে। খুব হইচই হল ঘটনাটা নিয়ে। সেইসময় আরও কিছু মেয়ে আমাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল। সবাই রেপ ভিক্টিম। পেশেন্টদেরও অনেকে কমপ্লেন করতে লাগলেন, তাঁরা প্রতারণার শিকার হয়েছেন।'

'তারপর কী হল?'

'ডাঃ দুর্বা মিশ্রের মন্ত্রিত্ব চলে গেল। অনুপম এখন জেল হেফাজতে। ওর ট্রায়াল এখন চলছে খুব শিগগির রায় বেরিয়ে যাবে। নবজীবন নার্সিংহোমটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি পুরুলিয়ায় ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু, ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে আমাকে খুন করালেন দুর্বা মিশ্র। তাতে আমার কোনও দুঃখ নেই, শোন পাণ্ডু, আমি তোর মাকে দেখেছি, আবার দুর্বা মিশ্রের মতো মাকেও। আমার মনে হয়, মায়েরা যদি ঠিকঠাক না হয়, তা হলে সন্তানের জন্য চরম দুঃখ লেখা থাকে। এ সব শোনার পর তুই কিন্তু কুন্তীকে ত্যাগ করিস না। চপলাদি আমায় বলেছে, কুন্তীর মতো মেয়ে হয় না। ফুলের মতো নরম একটা মেয়ে। পরিস্থিতির শিকার হয়ে গিয়েছে। পারলে পরজন্মে ওকেই তুই বিয়ে করিস।'

একটু চুপ করে একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল সুচন্দ্রা। ওর চোখের কোণে জল দেখতে পেল পাণ্ডু। তার পরই সুচন্দ্রা বলল, 'এই জন্মে আমার একটা ইচ্ছে পূরণ করবি পাণ্ডু? তোকে একবার জড়িয়ে ধরতে খুব ইচ্ছে করছে। কতবার তুই চেয়েছিস, কিন্তু কখনও তোকে অ্যালাউ করিনি। আজ মন থেকে চাইছি। এই প্রথম আর শেষবার।'

কথাটা বলেই ওকে জড়িয়ে ধরল সুচন্দ্রা। এক লহমা মাত্র। তার পরই ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, 'আমার হাতে সময় খুব কম রে। এখানে থাকতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। শিগগির তোর মায়ের কাছে চল। ছোটোবেলায় উনি অনেক হেনস্থা করেছেন আমাকে। একবার অন্তত মোকাবিলা করে আসি।'

সুচন্দ্রার তাড়ায় সুরোর কথা ভুলে গেল পাণ্ডু। সুচন্দ্রাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও মায়ের বাড়িতে ফিরে এল। ঘরের ভিতর ঢুকে দেখল, কেউ নেই। দাওয়ায় বেরিয়ে

ও মাকে ডাকাডাকি করতে লাগল। পিছনের দিকে বনবীথিতে একবার খুঁজে এল। নাহ, মা কোথাও নেই! ওর হাঁকডাকে পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন সুশীলা মাইতি। বললেন, 'আপনার মা তো তপলোকে চলে গেছেন ডাক্তারবাবু। ওর প্রায়শ্চিত্তির করা হয়ে গিয়েছি। আপনাকে কিছু বলে যাননি?'

শুনে দাওয়ায় বসে পড়ল পাণ্ডু। ওর চোখে পড়ল, সুচন্দ্রার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেছে।

২৫

বকুল বলেছিল, ধাই বুড়িমার অনেক ক্ষমতা। সেটা যে কত বড়ো সত্যি, কুন্তী এখন টের পাচ্ছে। প্রথমদিন ধাই বুড়িমা যখন ওর ঘরে আসেন, তখন একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন। বাচ্চাদের মারধর করা আর আটকে রাখার অভিযোগ। সেদিন উনি বলে গিয়েছিলেন, বাচ্চাদের গায়ে হাত দিলে ভ্রূণলোকে থাকার মেয়াদ নাকি বাড়ে। মারধরের খবরটা কার থেকে পেয়েছিলেন উনি কে জানে? হয়তো বাচ্চাদেরই কেউ গিয়ে অভিযোগটা করেছিল। সত্যিই তো, তার একটু আগে ওদের একজনকে আটকে রেখে কানমলা দিয়েছিল বকুল। ধাই বুড়িমা সম্ভবত তাকেই ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। ক্ষীর খেয়ে খুশিতে একটা চুমু দিয়ে সে যে চলে গিয়েছে, ধাই বুড়িমা সেটা জানবেন কী করে? শুনে মুহূর্তে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল ধাই বুড়িমার মুখে। বলেছিলেন, 'যা, তোর প্রায়শ্চিত্তির বোধ হয় হয়ে গেল।'

কুন্তী তখন কিছুই বুঝতে পারেনি। পরের বার ধাই বুড়িমা যেদিন ওর কাছে এলেন, সেদিন ঘরে বসে কুন্তী আনমনা হয়ে ফুলের মালা গাঁথছে। দেখে, দাওয়ায় বসে ফিক করে হেসে উনি বলেছিলেন, 'কার জন্য মালা গাঁথছিস লা। তোর পাণ্ডুর জন্য?'

পাণ্ডুর নাম শুনে কুন্তী চমকে উঠেছিল। ধাই বুড়িমা জানলেন কী করে? তখন বকুলের কথা ওর মনে পড়েছিল। ধাই বুড়ি আশ্চর্য ক্ষমতা ধরেন। ফুলের মালাটা পাণ্ডুকে পরাতে পারলে সব থেকে বেশি খুশি হত কুন্তী। কিন্তু, সেটা তো সম্ভব না। তাই নিরাসক্ত গলায় ও বলেছিল, 'তাকে আর পাব কোথায়?'

'কোন লোকে আছে, শুনবি নাকি? তোর ভালোবাসার লোক কোথায় আছে, আমি কিন্তু জানি।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসেছিল কুন্তী। বলেছিল, 'আপনি জানেন?'

'কেন জানব না। পাণ্ডু এখন মায়ালোকে। ওর মায়ের কাছে। তোকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে ওর খুব অশান্তি হয়েছে লা। মায়ের সঙ্গে ওর এখন বাক্যালাপ নেই।' মুক্তি সোপানে পাণ্ডুকে শেষবার দেখেছিল কুন্তী। তারপর থেকে ওর আর কোনও খোঁজ পায়নি। তাই ধাই বুড়িমাকে ও আঁকড়ে ধরেছিল, পাণ্ডু সম্পর্কে আরও খবর জানার জন্য। কিন্তু, এটা কী বললেন ধাই বুড়িমা! মা অন্তপ্রাণ ছিল পাণ্ডু। হাসপাতালে কাজ করার ফাঁকে অথবা অবসর সময়ে কথায় কথায় মায়ের প্রসঙ্গ তুলত। সেই মায়ের সঙ্গে

মনোমালিন্য! তাও আবার ওকে নিয়ে? কুন্তী জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমাকে নিয়ে অশান্তি হল কেন? ওর মা কি আমায় চেনেন?'

'তুই অ্যাতো বোকাসোকা কেন লা? তোকে দেখেনি তো কী হয়েছে? তোর সম্পর্কে কি খবর জোগাড় করতে পারে না? শোন পোড়ারমুখি, আমার কাছ থেকে পাণ্ডুর মা জানতে পেরেছে, তুই ভ্রূণলোকে আছিস। ভ্রূণলোকে মেয়েরা কেন আসে, ওর মা জানে। সেই কারণেই তোর সম্পর্কে খারাপ ধারণা হয়েছে। কী, অ্যাখন তোর মাথায় ঢুকেছে?'

শুনে কুন্তীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। ভ্রূণলোকে আসার কারণ তো একটাই। ভ্রূণহত্যার অপরাধ। এই কথাটা জানার পর পাণ্ডু কী ধরনের শক পেতে পারে, সেটা চিন্তা করেই ওর সব বোধবুদ্ধি গুলিয়ে গিয়েছিল। পাণ্ডু কি আর ওকে বিশ্বাস করবে? ইশ, কেন আগে সব কথা খুলে বলল না ও পাণ্ডুকে? বলার সময়ই বা পেল কখন? শিসপাহাড়ি জংশনে আসার আগে অবধি দু'জনের কেউ মনের কথা খুলে বলেনি। সেদিন ওয়েটিং রুমে ওদের মধ্যে যা হয়েছিল, সেটা তাৎক্ষণিক উত্তেজনায়। ওই সময় নিজের গ্লানিময় অতীত সম্পর্কে ওর পক্ষে পাণ্ডুকে বলা সম্ভব ছিল না। শিসপাহাড়িতে ও অবশ্য ওই একটা কারণেই নিজেকে গুটিয়ে রাখত। সবসময় ওর ভয় হত, অ্যাবরসনের কথা জানতে পারলে, পাণ্ডু হয়তো মুখ ফিরিয়ে নেবে। খুব কম ছেলেই পারে, লোকাচারের উর্ধ্বে উঠে একটা ধর্ষিতা মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে।

কুন্তীর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল। সেটা লক্ষ করে লাঠিতে ভর দিয়ে ধাই বুড়িমা উঠে পড়েছিলেন। তার পর বলেছিলেন, 'দুঃখ পেয়ে আর কী করবি লা। তুই শুধু পিরীতের লোকের কথা ভাবছিস। কিন্তু, তার সঙ্গে যার রক্তের সম্পর্ক...তোর মা হরিপ্রিয়া...তার কথা ভাব তো? সেও এখন মায়ালোকে। শুনলাম, পাণ্ডুর মা তাকেও গাল দিয়ে এসেছে।'

চোখের জল মুছে কুন্তী জিজ্ঞেস করেছিল, 'মাকে উনি চিনতে পারলেন কী করে?'

'চিনিয়ে দেওয়া লোকের কি অভাব আছে লা? মায়ালোকে থেকে তোর মা এবার তপলোকে চলে যাবে। তোর মায়ায় যেতে পারছিল না। সেই বন্ধনটা কেটে গ্যাছে তোর খবরটা শোনার পর। কী বলেছে জানিস, কেন এই মেয়েকে আমি পেটে ধরেছিলাম? তোর উপর ঘেন্না ধরে গ্যাছে।'

কথাগুলো বলে এক পা হেঁটে, ঘুরে দাঁড়িয়ে ধাই বুড়িমা বলেছিলেন, 'চোখের জল ফেলে আর কী করবি লা। তোরও ভ্রূণলোক থেকে যাওয়ার সময় এসে গেল। আর হ্যাঁ, মাকে শেষবারের মতো দেখার ইচ্ছে যদি হয়, তা হলে একবার আমার কাছে আসিস।'

কাঁদতে কাঁদতে কুন্তী জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার কাছে আমি যাব কী করে?'

'যে দিঘিতে তুই স্নান করতে যাস, তার দক্ষিণ দিকে পর পর দশটা দিঘি আছে। শেষ দিঘিটার গায়েই আমার সাদা মাটির বাড়ি। দেখবি বিরাট একটা সাদা গাছ আছে, তার ঠিক পাশে। দিঘি গোনার সময় ভুল করিস না যেন। ভুল করলে ফের তোকে প্রথম

দিঘি থেকে শুরু করতে হবে। তোদের অনুরাধা একবার আমায় খুঁজতে গিয়েছিল। কী হয়েছিল জানিস? তিন তিনবার ওকে ফিরে আসতে হয়েছিল প্রথম দিঘিতে। তাই তোকে সাবধান করে দিয়ে গেলাম। চলি রে।'

ধাই বুড়িমার কথাগুলো শোনার পর মনে খুব আঘাত পেয়েছে কুন্তী। ভুবনেশ্বর বা শিসপাহাড়িতে কোনও সময় বিপদে পড়লে অথবা মন খারাপ হলে প্রভু জগন্নাথকে ও স্মরণ করত। আশ্চর্য, ভ্রূণলোকে আসার পর থেকে তাঁর কথা কুন্তীর একবারও মনে পড়েনি। ধাই বুড়িমা চলে যাওয়ার পর থেকে ও সারাক্ষণ কাঁদছে। আর হাতজোড় করে প্রভু জগন্নাথের স্তব উচ্চারণ করছে। রং দারুব্রহ্মা মূর্তিং প্রণবতনুবরং...সর্ববেদান্ত কল্পবৃক্ষ ভবজলতরণী...সর্বতখানুখম...যোগীনাংহংসতত্ত্ববং হরিহর নমিত...শ্রীপতি বৈষ্ণবানাং...শৈবানাং ভৈরবাস্যাং পশুপতি পরমং...শাক্ততত্ত্বে শবিতং চ...। আর কেউ জানুক বা না জানুক, অন্তত প্রভু জগন্নাথ তো জানেন, কটকে যা ঘটেছিল, তা ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তিনি যে অন্তর্যামী।

কিন্তু সেকথা মা আর পাণ্ডুকে ও বিশ্বাস করাব কীভাবে? ভুবনেশ্বরে মা বলত, 'এ জন্মে যা কিছু ভালো হয়, তা আগের জন্মের সুকৃতির জন্য। আর খারাপ যা হয়, তা আগের জন্মের কুকর্মের কারণে।' সেই কথাটা যদি সত্যি হয়, তা হলে আগের জন্মে নিশ্চয়ই কুন্তী কোনও খারাপ কাজ করেছিল। না হলে নার্সিংহোমে অত মেয়ে থাকতে... ওকেই বা কেন ধর্ষিতা হতে হয়েছিল? কিন্তু, আগের জন্মে কি ও একটাও ভালো কাজ করেনি? কে ওর এই প্রশ্নের উত্তর দেবে? কে তার হিসেব নিকেশ রাখে?

বকুল, অনুরাধা, মাধবীলতারাও সব জেনে গিয়েছে। ওরা এসে মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দেয়। বকুল বোঝায়, 'আগের জন্মের কথা ভেবে আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন কুন্তীদি? আপনি তো আর পাণ্ডুবাবুর সঙ্গে ঘর সংসার করতে যাচ্ছেন না। ওরা কী ভাবলেন, তা নিয়ে আর মন খারাপ করে লাভ কি?'

মাধবীলতা মেয়েটা খুব ধিরস্থির প্রকৃতির। ও বুঝিয়েছে, 'স্থূল শরীরটা তুমি ইহলোকে ফেলে এসেছ কুন্তী। পিছন দিকে আর তাকিয়ো না। পাণ্ডুর সঙ্গে যদি তোমার আদৌও কোনওদিন দেখা হয়, তো সেটা হবে পরের জন্মে। ভ্রূণলোকে তুমি কুন্তীর মন আর সুক্ষ্ম শরীরটাকে নিয়ে এসেছ। তোমার উচিত, এখন মনকে প্রভু জগন্নাথের কাছে সঁপে দেওয়া। উনিই পথ দেখাবেন, কীভাবে তুমি ফের মনুষ্যজন্মে ফিরে যাবে।'

অনুরাধা সোজাসাপটা কথা বলতে অভ্যস্ত। ও বলেছে, 'এই তো দিব্যি আচিস। কী দরকার ফের নরকের মধ্যে ফিরে যাওয়ার? আমি বাবা, সব টান ছিঁড়ে ফেলেচি। ধাই বুড়িমা আমায় বলে দিয়েচেন, তুই হলি রাড় পাপী। যদ্দিন ইচ্ছে তুই ভ্রূণলোকে থাক। তোকে কেউ যেতে বলবে না।'

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর কুন্তী ঠিক করেছে, ও একবার ধাই বুড়িমার বাড়িতে যাবে। গিয়ে পাণ্ডু আর মায়ের সম্পর্কে আরও খবর জেনে আসবে। সমস্যাটা হচ্ছে, ভ্রূণলোকের রাস্তায় ও কখনও একা বেরয়নি। যখনই ওর ভ্রূণ খুঁজতে বেরিয়েছে, তখন সঙ্গ দিয়েছে অনুরাধা-বকুলরা। কিন্তু, ওদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে ধাই বুড়িমার বাড়িতে

যেতে চায় না কুন্তী। কতটা রাস্তা হাঁটতে হবে, সে সম্পর্কে কোনও আন্দাজ নেই। তার উপর রয়েছে, দিঘি গুনে গুনে যাওয়ার হ্যাপা। দাওয়ায় বসে ও যখন এ সব চিন্তা করছে, সেই সময় দেখল বেড়ার ফাঁকে একটা মুখ উঁকি মারছে। সেদিন ক্ষীর খেয়ে যাওয়া সেই বাচ্চাটার মুখ। ওকে দেখেই কুন্তী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। হাত নেড়ে ওকে বাড়ির ভিতর আসতে বলল। এই বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়েই ও দাই বুড়িমার বাড়িতে যাবে। সবসময় রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। নিশ্চয়ই বুড়িমার বাড়ি চেনে।

এক বাটি ক্ষীর খাইয়ে বাচ্চাটাকে পটিয়ে ফেলল কুন্তী। তার পর জিজ্ঞেস করল, 'হাঁ রে, ধাই বুড়িমার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যেতে পারবি?'

ঘাড় নেড়ে বাচ্চাটা বলল, হাঁ। কিন্তু সে অনেক দূর। তুই যেতে পারবি?'

'কেন পারব না? দশটা দিঘি পেরিয়ে বুড়ির বাড়িতে যেতে হয়, তাই না?

আমরা ওই রাস্তা দিয়ে যাই না। দিঘির জলে জাদুকর আছে। মন্তর দিয়ে সে সব ভুলিয়ে দেয়। তোকে আমি অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব। হাঁটতেও হবে না। তুই কি এখনই যেতে পারবি?'

'চল তা হলে। কিন্তু যাবি কীভাবে?'

'মাঠ থেকে একটা মোষ নিয়ে নেব। তার পিঠে চেপে দিব্যি চলে যাব।'

'তোর নাম কী রে?'

'কটকি। ইহলোকের কটক বলে একটা জায়গা থেকে আমি ভ্রূণলোকে এসেছি বলে, ধাই বুড়িমা আমার নাম দিয়েছেন, কটকি।'

'ধাই বুড়িমার বাড়িতে তুই আগে কখনও গেছিস?'

'আমরা তো ওর কাছেই থাকি। চল, আর দেরি করিস না। কেউ এসে পড়বে।'

খানিকটা হেঁটে একটা বিশাল প্রান্তরে পৌঁছে কুন্তী দেখল, প্রচুর মোষ চড়ে বেড়চ্ছে। মোষেদের গায়ের রং ধবধবে সাদা। অনেক বাচ্চা ওদের সঙ্গে খেলা করছে। একটা মোষের পিঠে লাফিয়ে উঠল কটকি। তারপর টেনে তুলল কুন্তীকে। কটকির সঙ্গে গল্প করতে করতে ধাই বুড়িমার বাড়ির দিকে এগোতে লাগল কুন্তী। অভ্যেস নেই, প্রতি মুহূর্তে ওর ভয় হচ্ছিল মোষের পিঠ থেকে পড়ে যাবে। ওকে পড় পড় দেখে বাচ্চাটার মুখে সে কী হাসি। তখন কুন্তীর মনে হচ্ছিল, ওই হাসির মতো সুন্দর আর কিছু নেই। কটকে গর্ভপাত না করে ও যদি বাচ্চার জন্ম দিত, তা হলে সেই বাচ্চাটা ঠিক এত বড়ো হত। তাকে নিয়েই শিসপাহাড়িতে জীবনটা হয়তো ও কাটিয়ে দিতে পারত। চপলাদি কিন্তু একবার বলেছিল, 'ভেবে দ্যাখো। গর্ভপাত করালে জীবনে হয়তো আর কোনওদিন মা...নাও হতে পারো। এ রকম অনেক কেস আমি দেখেছি।' কিন্তু, দুটো কারণে কুন্তী সেইসময় গর্ভধারণ করতে চায়নি। এক, লোকনিন্দার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকার মতো মনের জোর পায়নি। দুই, ও চায়নি, অনুপমের মতো একটা নোংরা মানুষের পাপের চিহ্ন সারা জীবন বয়ে বেরাতে। সন্তানটা যদি পাণ্ডুর হত, তা হলে হয়তো ও দ্বিধা করত না।

মোষের পিঠে বসে থাকতে থাকতে একটা সময় কুন্তীর পিঠ ব্যথা করতে লাগল।

কিন্তু, কটকির মধ্যে কোনও বিকার নেই। গলগল করে কথা বলছে। শয়তানির চিহ্নমাত্র নেই ওর মধ্যে। গল্প করার সময় কটকি ভেঙাতে লাগল অনুরাধা আর বকুলকে। দেখে খুব হাসি পাচ্ছিল কুন্তীর। তবে, ওইটুকু বাচ্চার মুখে তুই-তুকারি শুনতে ওর ভালো লাগছিল না। কটকি বলল, ভ্রূণলোকে বাচ্চারা সবাই সবাইয়ের মাকে চেনে। ওদের হাতেই সব ক্ষমতা। তবে ধাই বুড়িমাকে ওরা সবাই খুব মানে। ভ্রূণলোকে নানা গল্প করার ফাঁকে একটা সময় দূর থেকে সাদা বাড়ি দেখিয়ে কটকি বলল, 'ওই যে ধাই বুড়িমার বাড়ি। তুই এ বার হেঁটে যা। তোর সঙ্গে যদি আমায় দেখতে পায়, তা হলে ধাই বুড়িমা পরে খুব বকবে।'

মোষের পিঠ থেকে নেমে বাকি রাস্তা কুন্তী হেঁটে এসেছে। ওকে দেখামাত্রই ধাই বুড়িমার মুখ হাসিতে ভরে উঠল, 'হরিপ্রিয়াকে দেখতে এয়েছিস নাকি লা? আয়, একটু জিরিয়ে নে। তাপ্পর তোকে দেখাচ্ছি।' কোত্থেকে মিষ্টি পানীয় এনে দিল ধাই বুড়িমা, স্ফটিকের একটা টুল এগিয়ে দিল বসার জন্য। পানীয়ে চুমুক দিয়ে কুন্তী বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বুড়িমা?'

'কী কথা রে?'

'কটকের ডাঃ চপলা শতপথী কি আপনার কেউ হন? আপনি চেনেন তাঁকে?'

চিনব না কেন লা? ও হচ্ছে আমার নাতির ঘরে পুতি। তুই তাকে চিনিস নাকি?

'ভালো করে চিনি। কটকে একই নার্সিংহোমে আমরা চাকরি করতাম। আমাকে খুব ভালোবাসতেন। প্রথম যেদিন আপনাকে দেখি, সেদিনই চপলাদির কথা আমার মনে এসেছিল। ঠিক আপনার মতো দেখতে।'

'চপলা কিন্তু এখন আর কটকে নেই। তুই ভ্রূণলোকে চলে আসার পর ও শিসপাহাড়ির হাসপাতালে চাকরি নিয়েছে। বরের সঙ্গে ওর ঝগড়া মিটে গ্যাছে। চাকরি ছেড়ে গিয়ে ওর বরও এখন শিসপাহাড়িতে। দেখবি নাকি, ওরা দু'জন কেমন সুখে আছে? দ্যাখ তা হলে।'

বাড়ির ভিতরে কুন্তীকে নিয়ে এলেন ধাই বুড়িমা। ভেতরটা একেবারে মন্দিরের মতো। ফুলের সুন্দর গন্ধে ম ম করছে। একপাশে ফুট তিনেকের উঁচু একটা বেদি। তার উপর স্ফটিক খণ্ড ঝকঝক করছে। বেদির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে ধাই বুড়ি কী যেন বলতে লাগলেন। হাত দিয়ে নানা ভঙ্গি করলেন। স্ফটিক খণ্ডের দিকে তাকিয়ে কুন্তী অবাক হয়ে গেল। একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরে, ওই তো শিসপাহাড়ির হাসপাতাল! ওই তো হাসপাতাল থেকে গির্জায় যাওয়ার পথে বনবীথি। বিকেলের দিকে হাতে হাত রেখে রাস্তা ধরে হাঁটতে বেরিয়েছেন চপলাদি আর ওর বর। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে। চপলাদির ওড়নাটা উড়ছে। হাসিমুখে কি চপলাদি কী যেন বলছেন ওঁর বরকে। কুন্তীর মনে পড়ল, এই চপলাদিই একদিন ওর সামনে বর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ইম্পোটেন্ট কস্টার্ড।'

ছবিটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতেই ধাই বুড়িমা বললেন, 'দাঁড়া, দেখি, তোর মা হরিপ্রিয়াকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে। আজই তার তপলোকে চলে যাওয়ার কথা ছিল।'

কথাগুলো বলেই ফের চোখ বুজে বিড় বিড় করে কী যেন বলতে শুরু করলেন ধাই বুড়িমা। ফের স্ফটিকের উপর একটা ছবি ফুটে বেরোতে লাগল। অবাক হয়ে কুন্তী দেখল, ওর মা একটা টার্মিনালের সামনে দাঁড়িয়ে। আশেপাশে আরও অনেক লোকের ভিড়। এটা তা হলে মায়ালোক থেকে তপলোকে যাওয়ার টার্মিনাল। মা কথা বলছে মধ্যবয়সি একটা লোকের সঙ্গে। লোকটাকে আগে কখনও দেখেছে বলে কুন্তী মনে করতে পারল না। কে ওই লোকটা?

জিজ্ঞেস করতেই ধাই বুড়িমা বললেন, 'এই মানুষটার নাম বীরেশ্বর ব্যানার্জি। তোর মায়ের সঙ্গে একটু আগেই আলাপ হয়েছে না। তুই একে কোনওদিন শিসপাহাড়িতে দেখিসনি। শিসপাহাড়ির বিডিও ছিল। তুই চাকরি নেওয়ার অনেক বছর আগেই মানুষটা বদলি হয়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। তোদের সিস্টার ফুলমণির সঙ্গে এর ভালোবাসা ছিল। ফুলমণির জন্য এই মানুষটা সারা জীবন নিজের বউকে কষ্ট দিয়েছে। সেই পাপে এখন ওকে তপলোকে যেতে হচ্ছে।'

সত্যি, কত কী-ই না অজানা থেকে যায়! হাসপাতালের অবসর সময়ে কতদিন সিস্টার ফুলমণি কত ধরনের গল্প করেছেন। মাদার টেরিজার কথা বলতে গিয়ে একবার বানার্জি সাহেবের গলায় মালা দেওয়ার কথা বলেছিলেন বটে ফুলমণি। কিন্তু, তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল, সে কথাটা কখনও উনি বলেননি। পাণ্ডুও কি জানত? মনে হয় না। জানলে, কোনও না কোনও সময় ওকে বলে দিত। ফুলমণি যে খুব রোমান্টিক ধরনের, সেটা আন্দাজ করা যেত। পাণ্ডুকে প্রেমের বাঁধনে বেঁধে ফেলার জন্য ওকে অদ্ভুত ধরনের প্রস্তাব দিতেন ফুলমণি। তার মধ্যে থাকত, তুকতাকের মতো কুসংস্কারও। শুনে কুন্তী কখনও কখনও আঁতকে উঠত। মনে হত, শিক্ষিত সমাজে এ সব চলে নাকি? ফুলমণির উৎসাহে বারবার ও জল ঢেলে দিয়েছে।

স্ফটিকের গা থেকে টার্মিনালের ছবিটা মুছে গিয়েছে। ধাই বুড়িমা এ বার বললেন, 'কী রে, পাণ্ডুকে একবার দেখতে চাইলি না তো? ভালোবাসার মানুষটা কোথায় আছে, দেখবি না?'

মুখ ফুটে এই কথাটা বলতে পারছিল না কুন্তী। ও ঘাড় নাড়তেই ধাই বুড়িমা ফের মন্ত্র পড়া শুরু করলেন। ধীরে ধীরে স্ফটিকের পর্দায় পাণ্ডুর ছবিটা ভেসে উঠল। কুন্তী দেখল, বিরাট এক জলাশয়ের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাণ্ডু। ওকে জড়িয়ে ধরে কী যেন বলছে একটা মেয়ে। দৃশ্যটা দেখে বুকে একটা মারাত্মক ধাক্কা খেল কুন্তী। ছবিটাই বলে দিচ্ছে, দু'জনের সম্পর্কটা কত গভীরে! তা হলে কি পাণ্ডুর জীবনে আরও একজন মেয়ে আছে? বিস্ফারিত চোখে কুন্তী স্ফটিকের পর্দায় তাকিয়ে রইল। কে এই মেয়েটা? এর কথা তো কোনও দিন পাণ্ডু ওকে বলেনি! ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

ঠিক সেই সময় ধাই বুড়িমা বলল, 'এই মেয়েটার নাম কি জানিস? সুচন্দ্রা। পাণ্ডুর সঙ্গে এর অনেকদিনের সম্পর্ক...।'

বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। আর কিছু শোনার ইচ্ছেই হল না কুন্তীর। সব পুরুষই তা হলে অনুপমের মতো। ও বলে উঠল, 'থাক বুড়িমা। আমি আর শুনতে চাই না।'

কথাগুলো বলেই কুন্তী উঠে পড়ল। সাদা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ও হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। জীবনে এমন আঘাত আর কখনও পায়নি। যাকে ভালোবেসে সর্বস্ব দিতে চেয়েছিল, সে-ই এমন বিশ্বাস নষ্ট করে দিল?

সেদিন অনুরাধা বলেছিল, 'ব্যাটাছেলেরা ভালোবাসতে জানে না রে সই। তোর শরীর থেকে মধু নেওয়া হয়ে গেলেই দেকবি, আর চিন্তে পারবে না। ত্যাখন অন্য মধুভাণ্ড খুঁজতে বেরুবে।' অনুরাধার শিক্ষাদীক্ষা, রুচি আর ভাষাচয়ন সম্পর্কে কুন্তীর ধারণা খুব ভালো নয়। তা সত্ত্বেও ও বলেছিল, 'না রে সই, আমার পাণ্ডু অমন ধারা মানুষ না।' এখন মনে হচ্ছে, অনুরাধা ঠিকই বলেছিল। ইশ, সেদিন রেলের ওয়েটিং রুমে পাণ্ডুর হাতে নিজেকে তুলে দেওয়ার আগে ওর একবার ভাবা উচিত ছিল।

কাঁদতে কাঁদতে কুন্তী গিয়ে দাঁড়াল প্রকাণ্ড সাদা গাছটার নীচে। ওর চোখের জল যখন শুকিয়ে গেল, তখনই ও শুনতে পেল, 'তৈরি হও মা কুন্তী। তোমাকে এখনই ইহলোকে ফিরে যেতে হবে। কিমিন্দম ভুল করে তোমায় ভ্রূণলোকে নিয়ে এসেছিল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দ্যাখো। গাছের মধ্যে তুমি একটা দরজা দেখতে পাবে। সেই দরজাই তোমাকে ফের মুক্তি সোপানে নিয়ে যাবে।'

পিছনে তাকিয়ে কুন্তী একটা দরজা দেখতে পেল। গলাটাও ও চিনতে পারল...মহর্ষি ক্রতু। দরজার দিকে তাকিয়ে কুন্তী দৃঢ়ভাবে বলল, 'না মহর্ষি, আমি কোথাও যাব না। আমি ভ্রূণলোকেই থেকে যাব। কী হবে আমার শিসপাহাড়িতে ফিরে গিয়ে?'

২৬

জানুয়ারি মাসে কখনও বৃষ্টি হয় না। শিসপাহাড়িতে। অন্তত তাঁর জীবদ্দশায় কখনও সিস্টার ফুলমণি দেখেননি। কিন্তু, গত দু'দিন ধরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শিসপাহাড়ের দিকটায় এমন কালো মেঘ যে, গাছপালা দেখাই যাচ্ছে না। চারদিক কেমন যেন গুম মেরে রয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে লম্বা লম্বা গাছগুলো হাওয়ায় সবসময় নড়ে। শিরশিরানির আওয়াজ পাওয়া যায়। সেই গাছগুলোও যেন ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ছোটোবেলায় মায়ের কাছে ফুলমণি একবার শুনেছিলেন, ঠান্ডার সময় যদি বৃষ্টি হয়, তা হলে বুঝতে হবে শিসদ্যাবতা কোনও কারণে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তাঁর অভিশাপ নেমে আসবে আদিবাসী বস্তিতে। এমন অলৌকিক কিছু ঘটবে, যা আগে কখনও ঘটেনি।

জোসেফ ছোঁড়া এখন দিনে দু'বার করে কোয়ার্টারে আসে। ওর মুখেই ফুলমণি শুনেছেন, আদিবাসী বস্তিতে নানা রকম গুজব রটেছে বুধিরাম আর ওর বউকে নিয়ে। ওদের জন্যই নাকি শিসপাহাড়িতে এই দুর্যোগ। পাহাড়ে মারাংবুরুর থানে নিয়ে গিয়ে মৃত বুধিরামকে নাকি বাঁচিয়ে এনেছিল ওর বউ। তখন সবাই ধন্য ধন্য করেছিল। কিন্তু, সেই যে ওরা ঘরের আগল দিয়েছে, তার পর থেকে নাকি আর খোলেনি। কেউ ওদের আর দেখতেও পায়নি। একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে গিয়েছে শিসপাহাড়িতে। জোসেফের মতো ডাকাবুকো ছেলেও এখন সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। বেচারি এমন ভয়

পেয়েছে যে, রাতের দিকে ওর দোকানের ফল রাখতে আর লাশঘরের দিকে আসছেই না। অথচ ফলগুলো যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য আগে ও হাসপাতালে... লাশঘরের ঠান্ডায় রেখে যেত।

হাসপাতালের ঠিক গেটের বাইরে কেরস্তানদের কবরখানায় লংম্যান সাহেবকে কয়েকদিন আগে শুইয়ে দিয়েছেন সিস্টার ফুলমণি। গির্জার পাদ্রীদের ডেকে এনে যাবতীয় ক্রিয়াচার করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। খরচে কার্পণ্য করেননি। কবরের উপর আপাতত একটা ফলকও তিনি লাগিয়ে দিয়েছেন। রোজ ডিউটিতে যাওয়ার আগে সেই সমাধিতে তিনি ফুল দিতে যান। এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে লংম্যান সাহেবের আত্মার শান্তি কামনা করেন। ফুলমণি ঠিক করেছেন, যতদিন বাঁচবেন, ততদিনে রোজ সাহেবের কবরে ফুল দিয়ে আসবেন। আজও তিনি একগোছা ফুল নিয়ে বেরিয়েছেন।

কবরখানার গেটের কাছে পৌঁছে তিনি দেখলেন, ডাকঘরের পিওন দীনেশ হেমব্রেম সাইকেলে তাঁর দিকেই আসছে। দীনু দূর সম্পর্কের আত্মীয়। গাঁয়ের ঘরবাড়ি আর জমিজমার দায়িত্ব ওর হাতেই দিয়ে এসেছেন ফুলমণি। ওকে দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। সাইকেল থেমে নেমে সামনে দাঁড়িয়ে দীনু বলল, 'তুর একটা টেলিগ্রাম এসেইনছে ফুলি।'

কোত্থেকে আবার টেলিগ্রাম এল? ফুলের গোছা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে ফুলমণি বললেন, 'কুথা থেকে আলঅ। দেখেনছিস নাকি?'

'মনে হইনছে পুরুলিয়া থিকে। তুর উকিলবাবু পাঠাইনছে।'

শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের খুনের মামলা পুরুলিয়া কোর্টে বছর দুয়েক ধরে চলছে। উকিলবাবুর টেলিগ্রাম বোধ হয় সেই সম্পর্কেই। হয়তো ফের শুনানির ডেট পড়েছে। কিন্তু, উনি ফোন করলেই তো পারতেন। নাম্বারটাও জানেন। উকিলবাবু টেলিগ্রাম করতে গেলেন কেন, ফুলমণি বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'পড় ক্যানে, কী লিখেইনছে।'

টেলিগ্রামটা চোখের সামনে নিয়ে পড়তে শুরু করল দীনু। যার সারমর্ম, আগামীকাল মামলার রায় বেরবে। সম্ভবত কড়া শাস্তি হবে মেয়ের মরদ আর শ্বশুর শাশুড়ির। উকিলবাবুর অনুরোধ, কাল বেলা দশটার মধ্যে পুরুলিয়ার কোর্টে হাজির হতেই হবে। টেলিগ্রামের বয়ান শুনে একটু মুষড়ে পড়লেন ফুলমণি। কাল বেলা দশটার মধ্যে যদি হাজির হতে হয়, তা হলে আজ বিকেলের মধ্যেই তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হবে। পুরুলিয়া জায়গাটা কী কাছাকাছি নাকি? বাস-ট্রেন, তার পর ফের বাস। তবেই না কাল ভোরের মধ্যে তিনি পৌঁছতে পারবেন? কিন্তু, এই মুহূর্তে শিসপাহাড়ি থেকে তিনি বেরবেন কী করে?

কুন্তী দিদিমণি আর পাণ্ডু ডাগতারবাবুকে ফেলে রেখে এই মুহূর্তে তাঁর পুরুলিয়া যাওয়া সম্ভবই না। ওঁদের নিয়ে হাসপাতালের সবাই খুব উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম দিয়ে এখনও ওঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন দু'জনকেই। ফুলমণি জেদ ধরেছেন, ওঁদের সুস্থ করে তুলবেনই। সুপার সাহেবকে অনুরোধ করে কলকাতার

বেলভিউ নার্সিংহোম থেকে একজন ডাক্তারকে শিসপাহাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন ফুলমণি। তিনি আইসিইউ এক্সপার্ট। তাঁকে নিয়ে আসার পুরো খরচ দিয়েছেন ফুলমণি। লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম পুরো সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সেই ডাক্তার। আর তা মনিটর করছেন হসপাতালের সদ্য যোগ দেওয়া ডাক্তার চপলা শতপথী। মারাংবুরুর আশ্চর্য কৃপা, চপলা দিদিমণি নাকি ভালো করে চেনেন কুন্তী দিদিমণিকে। সেই কারণে বাড়তি সময় দিচ্ছেন নিউরো ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। মারাংবুরুর থানে ফুলমণি মানতও করে রেখেছেন, কুন্তী দিদিমণি আর ডাক্তার পাণ্ডু সুস্থ হয়ে উঠলে দশটা কালো হরিণ অর্থাৎ কী না দশটা শুয়োর... আর দশটা মুরগি দিয়ে পুজো দেবেন।

কখন কী হয়...এই অবস্থায় পুরুলিয়ায় যাওয়া কি সম্ভব? যতই পেটের মেয়ের খুনের মামলা হোক না কেন? দুই ডাক্তারের মরণ-বাঁচনের থেকে সেটা নিশ্চয়ই বড়ো হতে পারে না। ফুলমণি মুহূর্তে ঠিক করে নিলেন, তিনি উকিলবাবুকে জানিয়ে দেবেন, কাল যেতে পারছেন না। উকিলবাবুর ফোন নাম্বারটা হাসপাতালের ড্রয়ারে রয়েছে। দুপুরের দিকে ফোন করে দিলেই চলবে। তাই কথা না বাড়িয়ে, টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে ফুলমণি বললেন, 'গাঁয়ের খপর কী...চাষ ঠিকঠাক হইনছে ইবার?'

'হইনছে গ। কিন্তুক, বৃষ্টি আলে সব্বোনাশ হয়ি যাবে। জানগুরু কইনছিল, গাঁয়ে শিসদ্যাবতার পুজো করতি হবেক। হাসপাতালে তুর কাছে মুরুব্বিরা যাবেক ট্যাকা পয়সা লিতে।'

গাঁয়ের কোনও পরব ও পুজো আচ্চা হলে মুরুব্বিরা ওঁরা কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আসেন, সেটা নতুন কিছু নয়। ফুলমণি কখনও তাদের ফিরিয়ে দেন না। লংম্যান সাহেবের সৌজন্যে তাঁর প্রচুর টাকা রয়েছে ব্যাংকে। কী হবে সেসব ফেলে রেখে? মুরুব্বিদের পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলে আর সময় নষ্ট করলেন না ফুলমণি। দীনু চলে যাওয়ার পর দ্রুতপায়ে হেঁটে তিনি কবরখানায় ঢুকলেন। বেলা দশটা বাজে। কিন্তু, মেঘের কারণে মনে হচ্ছে, যেন সন্ধে নেমে এসেছে। আগে শিসপাহাড়িতে গোরা কেরেস্তনরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। এখন তাঁদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। গির্জায় এখন শুধু দু'তিনজন পাদ্রী আছেন, যাঁরা গোরা। তাই বলে কেরেস্তানদের সংখ্যা কমেনি। আদিবাসীদের বেশিরভাগই কেরেস্তান।

পাঁচিল-ঘেরা কবরস্থানটা এখন অবশ্য দেখাশুনো করেন গির্জার পাদ্রীরা। সেই কারণে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সমাধির উপর ছোটো বড়ো কত সৌধ! ছোটোবেলায় কবরখানায় ঢুকতে ভয় পেতেন ফুলমণি। কিন্তু হাসপাতালের চাকরি সেই ভয় কাটিয়ে দিয়েছে। কবরখানায় পা দিয়েই আজ ফুলমণি অনুভব করলেন, মারাত্মক ঠান্ডা লাগছে। আচমকা ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। শালটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিলেন তিনি। মুশকিল হবে, যদি এখনই বৃষ্টি শুরু হয়। কবরখানায় কোনও শেড নেই, যার তলায় তিনি দাঁড়াতে পারবেন। বৃষ্টি শুরু হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া গতি নেই। লংম্যান সাহেবের সমাধিতে গিয়ে ফুল রেখে ফুলমণি চোখ বুজে প্রার্থনা করতে লাগলেন, ভগবান যেন সাহেবকে শান্তিতে ঘুমোতে দেন।

ঠিক তখনই কান্নার ক্ষীণ একটা আওয়াজ তিনি শুনলেন খুব কাছ থেকে। কবরখানায় ঢোকার সময় কাউকে দেখেননি ফুলমণি। কোত্থেকে শব্দটা আসছে বোঝার জন্য তিনি চোখ খুলে এদিক ওদিক তাকালেন। অনেক সময় দূরে কোথাও বেড়াল কাঁদলে বাচ্চা ছেলের কান্না বলে ভুল হয়। সে রকমই কিছু হবে, ভেবে তার পরই যা দেখলেন, তাতে তিনি চমকে উঠলেন। দেখলেন, পাঁচিলের উপর পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে বুধিরাম। কপাল চাপড়াচ্ছে, বুক থাপড়ে কাঁদছে। ওর পরনে হাসপাতালের হালকা নীল পোশাক। মুখটা অস্বাভাবিক সাদা। মনে হচ্ছে ওর মুখে কেউ সাদা রং করে দিয়েছে। আরও একটা জিনিস দেখে ফুলমণি খুব অবাক হয়ে গেলেন, বাতাসের ঝাপটায় বুধিরামের শরীরটা কেমন যেন একে বেঁকে যাচ্ছে।

মরদের পেরেতকে রোজই তিনি প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু, গত তিন-দিনের মধ্যে দু'বার চোখের সামনে অন্য দু'জনের প্রেতাত্মা দেখলেন ফুলমণি। আগেরবার তিনি দেখেছিলেন লংম্যান সাহেবকে। আজ দেখলেন, বুধিরামকে। এ কীসের লক্ষণ, তিনি বুঝতে পারলেন না। সেদিন লংম্যান সাহেবকে দেখে শরীরটা ভারী হয়ে গিয়েছিল। আজ কিন্তু সে রকম বোধ হল না। কয়েক সেকেন্ড ধরে পরিষ্কার তিনি দেখতে পেলেন বুধিরামকে। তারপর সে শূন্যে মিলিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে ফুলমণি নিশ্চিত হয়ে গেলেন, বুধিরাম আর বেঁচে নেই। তার মানে, মারাংবুরুর নাম করে পদ্মমণি সবাইকে অ্যাদ্দিন মিথ্যে কথা বলছিল।

মনে মনে এই প্রশ্নটা নাড়াচাড়া করতে করতে ফুলমণি ফিরে এলেন হাসপাতালে অন্যদিন আউটডোরে একবার মুখ দেখিয়ে তার পর নিউরো ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ঢোকেন তিনি। আজ মনটা এমন বিক্ষিপ্ত যে, তিনি সোজা এসে ঢুকলেন এনআইসিইউ-তে। কুন্তী দিদিমণির বেডের সামনে বসে রয়েছেন চপলা দিদিমণি। চোখাচোখি হতেই মুখে হাসি ফুটিয়ে চপলা দিদিমণি বললেন, 'ফুলমণি, একটা সুখবর আছে। মনে হচ্ছে, আমাদের ট্রিটমেন্টে কুন্তী রেসপন্ড করছে।'

বুধিরামের কথা মাথা থেকে হারিয়ে গেল। জয় হোক মারাংবুরুর। মনে মনে এ কথাটা স্মরণ করে ফুলমণি এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কী কইরে তু বুঝতে পারলি?'

'পায়ের কাছে এসো, তা হলে তুমি বুঝতে পারবে।'

কথাটা বলেই কুন্তী দিদিমণির পায়ের কাছে গিয়ে, চাদরটা সরিয়ে দিলেন চপলা দিদিমণি। তার পর ট্রে থেকে একটা কাঁচি তুলে নিয়ে পায়ের তলায় টোকা মারতে মারতে বললেন, 'এই দেখো, পা-টা কেমন সাড়া দিচ্ছে। তার মানে কুন্তীর সেন্স ফিরে আসছে। আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তা হলে আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কুন্তী চোখ মেলে তাকাবে।'

পদমর্যাদা ভুলে চপলা দিদিমণিকে জড়িয়ে ধরলেন ফুলমণি। আনন্দের আতিশয্যে বললেন, 'তুর কথা যেন সত্যি হয় দিদিমণি। হাসপাতালের সবাইনকে মো মিষ্টি খাওয়াইনব বটে।'

চপলা দিদিমণি বললেন, 'দাঁড়াও, এখনই লাফালাফির কিছু হয়নি। চব্বিশটা ঘন্টা

এখন ওয়েট করতে হবে। রেসপেটেরি সিস্টেমটার দিকে নজর রাখতে হবে...।'

'সুপার সাহেবকে তু খপর দিয়েনছিস?'

এখনও দিইনি। আগে দেখে নিই, হাতে সাড় আসছে কি না, তার পর দেব। শোনো ফুলমণি, মিনিট দশেকের জন্য আমি কোয়ার্টারে যাব। ব্রেকফাস্ট সেরেই ফিরে আসব। তুমি কিন্তু কোথাও যেয়ো না।'

'তুকে কোয়াটারে যেতে হবেক না দিদিমণি। রুমালিকে আমি ফোন কইরে দিনছি। ব্রেকফাস্ট উ দিয়ে যাবেক। তু ইখানে বস বটে, তুর সনে গল্প করি।'

দিনতিনেক আগে হাসপাতালে জয়েন করেছেন চপলা দিদিমণি। আপাতত রয়েছেন কুন্তী দিদিমণির কোয়ার্টারের গেস্ট রুমে। ওকে দেখাশুনো করার জন্য সুপার সাহেব রুমালিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রান্নাবান্নার কাজটা সে-ই করে দেয়। নানা ব্যস্ততায় ফুলমণি জমিয়ে আড্ডা মারতে পারেননি চপলা দিদিমণির সঙ্গে। সুপার সাহেবের মুখে তিনি শুনেছেন, চাকরি নেওয়ার আগে দিদিমণি নাকি শর্ত দিয়েছিলেন, মেটারনাল টর্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি-র কাজটা তিনি করবেন না। শিসপাহাড়ির হাসপাতালে এমনিতেই অবশ্য এমটিপি নিষিদ্ধ। এই হাসপাতালে যিনি তৈরি করেছিলেন, তিনি আয়ারল্যান্ডের এক পাদ্রী। তাঁর নাকি স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, হাসপাতালে এমটিপি করানো যাবে না। এখানে এমন জনশ্রুতিও আছে, গর্ভপাত করলে শিসদ্যাবতা খুবই রুষ্ট হবেন। যে করাতে চাইবে, তার পরিবার নাকি ধ্বংস হয়ে যাবে। আসল কারণটা অবশ্য বড়ো হয়ে জানতে পেরেছেন ফুলমণি। পাদ্রীরা চাইতেন, আদিবাসীরা সংখ্যায় যত দ্রুত বাড়ে, ততই মঙ্গল। কোনও কারণে যেন কমে না যায়।

রুমালিকে ফোন করে দিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন ফুলমণি। আপাতত মনটা হালকা। রুমালি পরোটা আর আলুর তরকারি নিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে ঘরে পাতা টক দইয়ের ঘোল। কতদিন কুন্তী দিদিমণি আর পাণ্ডু ডাগতারবাবুর সঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট সেরেছেন ফুলমণি! কত সুখ দুঃখের গল্প করেছেন। এই হাসপাতালে ডাক্তারের সংখ্যা তো কম নয়। মনের মিল অনেকের সঙ্গেই হয়নি। আদিবাসী বলে অনেকেই তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কিন্তু, ওই দু'জন ছিলেন এক্কেবারে আলাদা। মনে হচ্ছে, চপলা দিদিমণিরও মনটা খুব ভালো। মন খুলে কথা বলা যাবে।

বাইরে কড় কড় করে বাজ পড়ার শব্দ হল। জানলা দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখতে পেলেন ফুলমণি। উথাল পাথাল হাওয়ায় জানালা দুটো দড়াম দড়াম করে ধাক্কা মারছে। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় আলো জ্বালিয়ে দিলেন দিদিমণি। সিলিং থেকে ঝোলানো আলোটা পেন্ডুলামের মতো দুলছে। জানলা বন্ধ করে উলটো দিকের চেয়ারে এসে বসলেন চপলা দিদিমণি। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সকালে জোসেফ বলছিল, কোন এক জানগুরু নাকি বস্তিতে বলেছেন, বৃষ্টি শুরু হলে তিনদিনের আগে থামবে না। পাহাড় থেকে তোড়ে জল নেমে আসবে। নাকি বস্তি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ফুলমণির বিশ্বাস হয়নি। পাহাড়ে অনেক ঝরনা আছে, এটা ঠিক, কিন্তু, তার জলস্রোত উলটোদিকে দিয়ে বয়। গিয়ে মেশে শুক্তিমতি নদীতে। পাহাড় ডিঙিয়ে সেই জলস্রোত এ দিকে আসবে কী করে?

সামনাসামনি বসার কারণেই ফুলমণি লক্ষ করলেন, চপলা দিদিমণির সিঁথিতে সিঁদুর নেই। দিদিমণি যে বিবাহিতা, সেটা ফুলমণি জানেন। কেননা, জয়েন করার দিন দিদিমণি ওঁর মরদকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। দু'দিন শিসপাহাড়িতে থেকে ওঁর মরদ নাকি কটকে ফিরে গিয়েছেন। সিঁদুর না পরলে অপদেবতা ভর করতে পারে। কথাটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন ফুলমণি। একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। দিদিমণি নাও পছন্দ করতে পারেন। তাই খুব সাধারণ একটা প্রশ্নই করলেন তিনি, 'শিসপাহাড়ি জায়গাটা কেমন লাগছে দিদিমণি?

চপলা দিদিমণি বললেন,'খুব ভালো। কটকে আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলাম, জানো। এখানে এসে মনে হচ্ছে, অন্য কোনও জগতে এসেছি। এত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ! আমার বর তো বলে গেলেন...কটকে সব গুটিয়ে নিয়ে এখানে চলে আসবেন। বাকি জীবনটা এখানেই কাটাবেন।'

'তুর বাচ্চা-কাচ্চা লাই?'

'না ফুলমণি। ডাক্তার হওয়ার পর এত এমটিপি করেছি যে, সেই পাপে ভগবান আমায় কোনও সন্তান দেননি। আমার বরেরও সমস্যা আছে। বিয়ের আঠারো বছর পেরিয়ে গিয়েছে, আর সম্ভব নয়। ভাবছি, এ বার দত্তক নেব? কিন্তু, মানুষ করবে কে?'

'আসপাতালে তুর সনে কার কার আলাপ হইনছে?'

'সে রকম ঘনিষ্ঠতা কারও সঙ্গে হয়নি। যা কিছু গল্প করেছি— সবই রুমালির সঙ্গে। মেয়েটা মোটামুটি একটা আন্দাজ দিয়েছে শিসপাহাড়ি সম্পর্কে। ও তোমার খুব প্রশংসা করছিল ফুলমণি। বলছিল, কুন্তীকে নাকি তুমি খুব ভালোবাস। আচ্ছা, রুমালি বলছিল, শিসপাহাড়িতে নাকি প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায়? সত্যি?'

কথাটা রুমালির বলা হয়ে গিয়েছে তা হলে? চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেন না ফুলমণি। বললেন, 'সত্যি। তুই বিশ্বাস করবি কি না জানি লাই রে, একটু আগে মো কবরখানায় পেরেত দেখে এসেইনছি।'

বাইরে ফের বাজ পড়ল মারাত্মক শব্দ করে। চমকে উঠে চপলা দিদিমণি বললেন, 'যাঃ, তুমি ভয় দেখানোর জন্য বলছ। প্রেতাত্মা বলে কিছু আছে নাকি? এই বিজ্ঞানের যুগে কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা? এ সব বুজরুকি।'

'পেরেতে তু বিশ্বাস করিস লা রে দিদিমণি?'

'আমাকে দেখাতে পারবে? না দেখা পর্যন্ত আমি কিন্তু বিশ্বাস করব না।'

চপলা দিদিমণির কথাটা শেষ হতে না হতেই বাইরে আলোর ঝলকানি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বাজ পড়ার শব্দে এনআইসিইউ-র পুরো বিল্ডিংটা কেঁপে উঠল। করিডোরের আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। ঘরের তেরছা আলোয় হঠাৎ ফুলমণি দেখলেন, করিডোর দিয়ে কুন্তী দিদিমণি হেঁটে আসছেন! ওঁকে ঘিরে রয়েছে হালকা নীল কুয়াশা। পরনে সেই একই নীল রঙের শাড়ি, যা পরে রাতে উনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন শিসপাহাড়ি রেলওয়ে জংশনে। হাঁটতে হাঁটতে ঘরের ভিতর ঢুকে এলেন কুন্তী দিদিমণি। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। দেখে উত্তেজনায়

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ফুলমণি। ইশারা করে চপলা দিদিমণিকেও দেখালেন। মুখে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন, যেন শব্দ না করেন।

ঘরের ভিতর যে আর কেউ আছেন, সেটা কুন্তী দিদিমণির আচরণে বোঝা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে নিজের বেডের কাছে গিয়ে ঝুঁকে উনি কী যেন দেখলেন। তখনই পাশের বেডে পাণ্ডু ডাগদারবাবুকে তাঁর চোখে পড়ল। ঘুরে গিয়ে কুন্তী দিদিমণি পাশের বেডের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ডাগদারবাবুর বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন। বাইরে ফের সশব্দে বাজ পড়ল। চমকে উঠে আর কালবিলম্ব না করে কুন্তী দিদিমণি এবার নিজের বেডের দিকে ফিরে এলেন। তার পর টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। ফিসফিস করে ফুলমণি তখনই বললেন, 'তু দ্যাখ ক্যানে চপলা দিদিমণি। ইবার বিশ্বাস লয়?'

২৭

এই অল্প সময়ের মধ্যে কত কী হয়ে গিয়েছে শিসপাহাড়িতে। রুমালি, সিস্টার ফুলমণি, চপলাদির মুখে যত শুনছে, ততই অবাক হচ্ছে কুন্তী। এনআইসিইউ থেকে ও নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এসেছে। এখানেই ওর ট্রিটমেন্ট চলছে। তেমন কিছু নয়, ওষুধ পথ্যসহ সপ্তাহ দুয়েক ওকে বিশ্রাম নিতে হবে। শরীরটা খুব দুর্বল। একটু হাঁটাচলা করলেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে। যত্ন করার জন্য ওর বিছানার পাশে সবসময় কেউ না কেউ রয়েছে। কারও সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, তবুও কত আপন! কুন্তী সব থেকে অবাক হয়ে গিয়েছে চপলাদিকে দেখে। চোখ খুলে প্রথম যখন দেখে, তখন ওর কথা বলার মতো শক্তি নেই। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল ওর। চপলাদি তখন বলেছিলেন, 'কেঁদো না বোন। আমি আছি, তুমি শিগগির ভালো হয়ে উঠবে।'

ভ্রূণলোকে ধাই বুড়িমার বাড়িতে...স্ফটিক খণ্ডে চপলাদিকে দেখতে পেয়েছিলেন কুন্তী। শিসপাহাড়ির রাস্তায় বরের সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছেন। সেদিনই জানতে পারে, বরের সঙ্গে ওঁর ঝামেলা মিটে গিয়েছে। কী করে মিটল, সেই গল্প এখনও শোনা হয়নি। জানা হয়নি, কী করেই বা উনি নবজীবন নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে এলেন? দুর্বা মিশ্র সহজে ছেড়ে দেওয়ার মতো মহিলা নন। নিশ্চয়ই চপলাদি ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তার পর কী হল, সেটা জানার ও খুব কৌতূহল হচ্ছে কুন্তীর।

বাপ্পা যে আর নেই, সেই কথাটা কুন্তী জানতে পারে রুমালির কাছ থেকে। কিন্তু, খবরটা প্রথম দেওয়ার সময় ও অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলেছিল। পরে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। বাপ্পার আত্মার সঙ্গে যে ওর দেখা হয়েছিল, সেটা রুমালি জানবে কী করে? রুমালির মুখেই কুন্তী জেনেছে, হাসপাতাল থেকে বাপ্পার ডেডবডি নিয়ে গিয়েছিল বড়ো পিসি। পারলৌকিক কাজ করেছে পিসতুতো ভাই। কী দুর্ভাগ্য ওর, বাপ্পার শেষ কাজটা করার সুযোগ ও পেল না। বাপ্পার আত্মা নিশ্চয়ই শান্তি পায়নি। কেননা, উনি একেবারেই পছন্দ করতেন না পিসতুতো ভাইটিকে। কুন্তীর অসুস্থ হওয়ার খবর শুনে শিসপাহাড়িতে এসে পিউসি কাল ওকে

দেখে গিয়েছেন। কুন্তী তাঁকে বলেও দিয়েছে, 'ভুবনেশ্বরের ফ্ল্যাটটা ছাড়া বাকি যা সম্পত্তি আছে, আপনি তা নিয়ে নিতে পারেন। আমি চোখ বুজে সই করে দেব।'

শুনে খুব খুশি হয়ে ফিরে গিয়েছেন পিউসি। উনি একবারও জিজ্ঞেস করেননি, অতঃপর ওর কী হবে? সিস্টার ফুলমণি একবার আলতোভাবে ওর বিয়ের কথা তুলেছিলেন। কিন্তু, পিউসি তখন কায়দা করে উত্তর দেন, 'কুন্তী যদি কাউকে পছন্দ করে থাকে, তা হলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'

কিন্তু, ওর পছন্দের লোকটা যে এখনও কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে! রোজ দু'বেলা তার খোঁজ নিচ্ছে কুন্তী। রোজই শুনছে, আগের দিনের থেকে সামান্য উন্নতি হয়েছে। ডাক্তারদের সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কথা। কুন্তী বিছনায় শুয়ে তাই ছটফট করছে পাণ্ডুর জন্য। রেলওয়ে জংশনে সেদিনকার ঘটনার জন্য এখন নিজেকেই দায়ী করে কুন্তী। ও যদি না ডাকত, তা হলে পাণ্ডুর জীবন সংশয় হত না। সত্যিই, পাণ্ডুর কাছে ও মুখ দেখাবে কী করে, কুন্তী ভেবে পাচ্ছে না। চোখে চোখ রেখে কথাই বা বলবে কী করে? ধাই বুড়িমার কথা অনুযায়ী, ওর ভ্রূণলোকে যাওয়ার কথা পাণ্ডু জেনে গিয়েছে। সত্যিটা জানার পর পাণ্ডু কি আর ওকে গ্রহণ করবে? এ নিয়ে কুন্তী মাঝে একদিন অনেকক্ষণ কথা বলেছে চপলাদির সঙ্গে। উনি বললেন, 'আমি তো আছি। তেমন হলে আমি বুঝিয়ে বলব, তোমার কোনও দোষ ছিল না।'

ওয়ে থাকতে থাকতে ভ্রূণলোকের নানা কথাও মনে পড়ছে কুন্তীর। মহর্ষি ক্রতু থেকে শুরু করে অনুরাধা, মাধবীলতা, বকুল, আর বাচ্চা ছেলেগুলোর কথাও। শেষ দিন সাদা গাছতলার সামনে দাঁড়িয়ে মহর্ষি ক্রতু ওকে বলেছিলেন, 'শাস্তিভোগ করার পর ভ্রূণলোকে থাকার অধিকার কারও নেই। ইহলোকে তোমার মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি মা। ভুল করে তোমাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। বাকি জীবন তোমাকে ইহলোকেই কাটাতে হবে। আশীর্বাদ করছি, বাকি জীবন তুমি যেমন ভাবে কাটাতে চাইবে, তেমনই কাটবে।' এমনই সব মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ওকে ফেরত পাঠিয়েছিল মহর্ষি ক্রতু। কুন্তী মনেপ্রাণে চায়, বাকি জীবনটা ও পাণ্ডুর স্ত্রী হয়ে কাটাবে। সেটা সম্ভব হওয়ার কোনও লক্ষণই তো ও দেখতে পাচ্ছে না।

ভ্রূণলোকে ওর সইদের কাউকে কুন্তী বলে আসতে পারেনি। বকুলের জন্য ওর এখন সব থেকে বেশি দুঃখ হয়। অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েটাকে ও খুব ভালোবেসে ফেলেছিল। বেচারি, এই পৃথিবী থেকে কলঙ্ক নিয়েই বেড়াচ্ছে। হয়তো ফের কোনও সমকামী মেয়েকে বন্ধু করে নিয়েছে। কুন্তীর খুব ইচ্ছে, সরিতার শাস্তির জন্য উদ্যোগ নেয়। কিন্তু, সেটা ও সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত সম্ভব নয়। ভ্রূণলোকের কথা এখানে অবশ্য কাউকে বলেনি কুন্তী। লজ্জার কথা, এ কী কাউকে বলা যায়!

'কালকের খবরের কাগজটা কি চোখ বুলিয়েছ কুন্তী?'

চপলাদির গলা শুনে জানলার দিক থেকে কুন্তী মুখ ফেরাল। হাতে ধরে রাখা একটা খবরের কাগজ। এগিয়ে দিয়ে বিছানার একধারে বসলেন চপলাদি। হাসপাতলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছেন। তার আগে একবার দেখা করতে এসেছেন। খবরের কাগজ নিয়ে খুব একটা আগ্রহ নেই কুন্তীর। ভুবনেশ্বর থেকে ওড়িয়া ভাষার

কাগজ শিসপাহাড়িতে পৌঁছয় বিকেলের দিকে। তখন পড়ার সময় কোথায় কুন্তীর? হাসপাতালে থেকে রাতে ক্লান্ত হয়ে ফিরত। খবরের কাগজে চোখ বোলাতে তখন আর ইচ্ছে করত না। চপলাদি আসার পর থেকে হকার ফের কাগজ দিয়ে যাচ্ছে ওর কোয়ার্টারে। কুন্তী লক্ষ করেছে, সকালে ডিউটিতে যাওয়ার আগে একদিনের পুরোনো কাগজ খুব খুঁটিয়ে পড়েন চপলাদি। কালকের কাগজে কী এমন খবর বেরিয়েছে, যা চপলাদি ওকে পড়তে বলছেন?

কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে কুন্তী দেখল, প্রথম পাতায় বড় করে হেডলাইন, 'নবজীবন কেলেংকারির খলনায়কের জেল।' খবরটায় দ্রুত চোখ বোলাতে লাগল কুন্তী। ধর্ষণের অপরাধে অনুপম মিশ্রের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। কটকের নবজীবন নার্সিংহোমের এক মহিলা ডাক্তারের অভিযোগে অনুপম মিশ্রকে গ্রেফতার করেছিল চাউলিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। পরে নার্সিংহোমের আরও দু'জন নার্স একই অভিযোগ জানান। গত ছয়মাস ধরে সেই কেসের শুনানি চলছিল। কটকের ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারপতি পিনাকী ভট্টাচার্য গতকাল তার রায় দিয়েছেন। উল্লেখ্য, অনুপম মিশ্র ওড়িশার প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ দুর্বা মিশ্রের পুত্র। এরপর কবে, কীভাবে ধর্ষণ হয়েছিল তার বিবরণ রয়েছে। শরীরটা ঘিন ঘিন করে ওঠায়, পুরো খবরটা না পড়েই কুন্তী মুখ তুলে চপলাদির দিকে তাকাল।

কটকে এত কিছু হয়ে গিয়েছে, ও তার কিছুই জানত না! কে এই মেয়েটি? ধর্ষণের মামলায় নির্যাতিতার নাম কাগজে দেওয়া নিয়ম নেই। সেই কারণে চপলাদির কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জেনে নিল কুন্তী। মেয়েটির নাম সুচন্দ্রা। ভ্রূণলোকে ধাই বুড়িমা সুচন্দ্রা বলে একটা মেয়ের কথা বলেছিলেন। পুরুলিয়ায় সুচন্দ্রা খুন হয়েছে শুনে কুন্তী মেলাতে বসল। এ কি সেই সুচন্দ্রা? পাণ্ডুর সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল! চপলাদির সঙ্গে কথাবার্তায় ওর মনে হল, হ্যাঁ সেই মেয়েই। সঙ্গে সঙ্গে বুক হালকা হয়ে গেল কুন্তীর। মেয়েটার প্রতি ওর শ্রদ্ধা জাগল। সত্যিই খুব সাহসী মেয়ে। কলঙ্কের ভয়ে যে কাজটা ও করতে পারেনি, সুচন্দ্রা সেটা করেছে। এমনকী, জীবনের পরোয়াও করেনি। অনুপমের মতো একটা জানোয়ারকে শেষ পর্যন্ত জেলে পাঠিয়েছে। কিন্তু, যে প্রশ্নটা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সেটাই কুন্তী করে বসল, 'দুর্বা মিশ্রের কী হবে চপলাদি?'

'বাঁচবে না। পার্টির লিডাররা ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু, যে সুপারি কিলার দিয়ে ও সুচন্দ্রাকে খুন করিয়েছিল, সে পুলিশের কাছে সব বলে দিয়েছে। কাগজে আস্তে আস্তে সব বেরুচ্ছে। ইন ফ্যাক্ট, কলকাতার এক রিপোর্টার মউপ্রিয়া কাল আমাকে ফোন করেছিল। দুর্বা মিশ্রের বিরুদ্ধে কিছু তথ্য চায়। আমি ঠিক করেছি, নার্সিংহোমে যত দুর্নীতি হত, সব বলে দেব।'

'কিন্তু, ওরা আপনাকেও তা হলে মেরে ফেলবে।'

'অত সহজ নয় কুন্তী। পাপ কখনও বাপকে ছাড়ে না, বুঝলে? অন্যায় করলে এই জন্মেই মানুষকে শাস্তি পেতে হয়। এই ইহলোকেই ভগবান কোনও না কোনওভাবে সেই শাস্তিটা তাকে দেন। দেখবে, দুর্বা শিগগির অ্যারেস্টেড হবে। বিরোধী দলের লোকজন সব উঠেপড়ে লেগেছে ওর বিরুদ্ধে। ওকে জেলের ঘানি টানাতেই হবে।'

'কলকাতা থেকে আপনার সেই রিপোর্টার কবে আসবেন চপলাদি?'

'আসার কথা তো সকালে। কিন্তু যা বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে না আবার কোথাও আটকে যায়। হয়তো হাসপাতালে এসে এখন বসেও থাকতে পারে। কেন, তুমি কিছু বলতে চাও নাকি?'

'আমার জন্য নয় চপলাদি। আমার এক সই বকুল কলকাতায় খুন হয়েছিল। যে খুন করেছিল, তার নাম আমি জানি। কীভাবে খুন করেছিল,তাও আমি শুনেছি। কলকাতার রিপোর্টারকে আমি রিকোয়েস্ট করব, যাতে সেই ব্যাপারটা নিয়ে লেখালিখি করে। অন্তত, আসল কালপ্রিট যেন সাজা পায়।'

'ঠিক আছে। মউপ্রিয়া এলে ওকে তোমার কাছে নিয়ে আসব। এখন আসি। রুমালিকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কেমন?'

রুমালি নয়, খানিকক্ষণ পর হাজির হলেন সিস্টার ফুলমণি। জানলা দিয়ে কন্তী দেখতে পেল, সাইকেলটা খুঁটিতে ভর দিয়ে রেখে উনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন। পরনে লাল-হলুদ ডোরা কাটা সুতির শাড়ি। খোপায় কৃষ্ণচূড়া ফুল। সাধারণত এই সাজে ওঁকে দেখা যায় না। হাসপাতাল চত্বরে নার্সদের গাউন পরেই উনি চালফেরা করেন। কোনও পরব-টরব হলে তখন শাড়ি। কাল বিকেল থেকে সিস্টার ফুলমণির দেখা নেই। এমনটা হয় না। রোজ বারতিনেক দেখা করতে আসেনই। ঘরে ঢুকে মুখে হাসি ফুটিয়ে ফুলমণি বললেন, 'কাল সনঝাবেলায় গাঁয়ে গেইনছিলাম। শিসদ্যাবতার পুজা হইনছিল।'

ওহ্, সেই কারণেই নতুন সাজসজ্জা। কুন্তী জিজ্ঞেস করল, 'রাতে আর ফেরেননি বুঝি?'

'না। উখান থেইকে বস্তিতে গিলাম। কী ঝামেলি গ। রেতে মোকে পুলিশ ডাইকতে হলক।'

'কী হয়েছিল বস্তিতে?'

'পদ্মমণিকে উরা ডাইন বানাইনছে। আগুন উকে পুড়াইনতে গিয়েছিলক।'

গণ্ডগোলোর কারণ বিশদ শুনে কুন্তীর মাথা গুলিয়ে গেল। গত কাল বস্তির মুখিয়া নাকি পুরুলিয়া থেকে ডেকে এনেছিল এক জানগুরুকে। এক হাজার টাকা আর একটা খাসি দেবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সেই জানগুরু নাকি বলেছে, পদ্মমণির উপর অপদ্যাবতা ভর করছে। ঘরে একটা মৃতদেহ আগলে ও বসে আছে। বুধিরামের দেহটা শুক্তিমতী নদীতে ভাসিয়ে দিতে হবে। না হলে প্রেতাত্মা হয়ে শিসপাহাড়িতে ও ঘুরে বেড়াবে। তখন বস্তির খুব ক্ষতি করে দেবে। ডাইন পদ্মমণি যদি কথা না শোনে, তা হলে নাকি ঘরে আগুন লাগানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ভণ্ড জানগুরুদের উপর ফুলমণির কোনও আস্থা নেই। তিনি জানেন, ওরা যে সব বিধান দেয়, তার পিছনে গ্রাম্য রাজনীতি অথবা কারও ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে। জানগুরুর বিধান শুনে সিস্টার ফুলমণি কাল সন্ধেবলায় বুধিরামের বাড়িতে গিয়েছিলেন। পদ্মমণি নাকি তখন স্বীকার করেছে, নিজেকে বাঁচানোর জন্য... বুধিরামের বেঁচে ফেরার কথাটা ও ইচ্ছে করে রটিয়েছে। একা পেয়ে মুখিয়ার ছেলে নাকি ওকে ভোগ করতি

চেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলমণির কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, পদ্মমণির উপর মুখিয়ার এত রাগ কেন?

বস্তিতে গণ্ডগোল হতে পারে, এই আশঙ্কায় গাঁয়ে ফিরে ফোনে পুলিশকে খবর দিয়ে রেখেছিলেন ফুলমণি। ভাবতে পারেননি, রাতে বস্তির লোকেরা বুধিরামের বাড়িতে সত্যিই আগুন লাগিয়ে দেবে। ভাগ্যিস, গাঁয়ের কয়েকজনকে নজর রাখতে বলেছিলেন। সেই কারণে পদ্মমণি প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। পুলিশ গিয়ে ঠিক সময়ে জানগুরু আর মুখিয়ার ছেলেকে গ্রেফতার করে...থানায় নিয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে বুধিরামের লাশ দ্বিতীয়বার পোস্ট মোর্টেমের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই পর্যন্ত শুনে কুন্তী জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে পদ্মমণি এখন কোথায় সিস্টার?'

'উকে মোর বাড়িতে লিয়ে এসেইনছি। মোর পেটের মেয়াটাকে বাঁচইনতে পারি লাই দিদিমণি। উর গায়ে আগুন লাগাইনছিল শউর-শাউড়ি। পেটের মেয়াকে তো আর ফিরে পাবক লাই। উয়ার দুঃখ আজ ভুইলে গিলাম রে। মনে হইনছে, মোর মেয়াটা য্যান ফিরা এল মোর ঘরে।' কথাটা বলার সময় সিস্টার ফুলমণির চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল।

ঠিক সেই সময় দরজার কাছ থেকে রুমালি ডাকল, 'ফুলমণি মাসি, একবার এদিকে এসো।'

দরজার দিকে তাকিয়ে কুন্তী একটু অবাকই হল। এ কী এত বিবর্ণ লাগছে কেন রুমালির মুখ? সকালে যখন ব্রেকফাস্ট খাইয়ে গেল, তখনও ওকে খুব হাসিখুশি লাগছিল। জোসেফকে নিয়ে হাসিঠাট্টাও করে গেল। এর মধ্যে এমন কী হল যে, রুমালি এমন বদলে গেল? নিশ্চয়ই কোনও দুঃসংবাদ দিতে এসেছে। বস্তির লোকেরা কি তা হলে ফুলিমণির বাড়িতে চাড়াও হয়েছি? পদ্মমণিকে নিয়ে যেতে চায়? নাকি লংম্যান সাহেবের ভূত ফের হামলা করেছে! নাকি অন্য কিছু, যা ওর সামনে বলা যাবে না? ফুলমণি বোধ হয় কিছু আন্দাজ করতে পারেননি। হালকাভাবেই তিনি বললেন, 'কী কইবি রে মা?'

'শিগগির এদিকে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও, চেয়ার ছেড়ে উঠে ফুলমণি দরজার বাইরে গেলেন, পরক্ষণেই তাঁর আঁতকে ওঠা গলা শুনতে পেল কুন্তী, 'কী কইছিস তু! কখন মারা গেইনছে?'

বিছনায় শুয়ে কুন্তী কান পেতে রয়েছে। রুমালি নিচু গলায় বলছে, 'ওই একটু আগে। চপলাদিদি ফোন করেছিল। আমাকে বলল, "ফুলমণিকে এক্ষুনি চলে আসতে বল। তোর কুন্তীদিদিকে কিছু জানানোর দরকার নেই। দরকার হলে ওকে একটা ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে দিস।"'

'মো যেইনছি। উ যদি জিজ্ঞেস লয়, বইলবি, ইমাজেন্সি কল এসেইনছিল।'

'তুমি যাও মাসি। কিন্তু, কুন্তী দিদিকে আমি একা কী করে সামলাব? খবরটা শুনলে দিদি হার্টফেল করবে।' বলতে বলতে রুমালি কেঁদে ফেলল।

ডাউন মুক্তি এক্সপ্রেস ট্রেনটা শিসপাহাড়ি রেলওয়ে জংশনে এসে থামল রাত ঠিক একটা উনচল্লিশ মিনিটে। সময়টা পাণ্ডু জানতে পারল, ঘোষকের গলা শুনে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে কিম্পুরুষকে ছাড়া ও আর কাউকে দেখতে পেল না। যাওয়ার দিন ওকে আর কুন্তীকে ভুল করে ট্রেনে তুলে নিয়েছিল কিমিন্দম। সেই অপরাধে কিমিন্দমের চাকরি চলে গিয়েছে। তার বদলে মুক্তি এক্সপ্রেসে আত্মাদের নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পেয়েছে কিম্পুরুষ। লোকটার মুখ খানিকটা ঘোড়ার মতো, কিন্তু বাকি দেহটা মানুষের মতো। তবে, দেখতে কিমিন্দমের মতো ভয়ংকর নয়।

ফেরার ট্রেনে পাণ্ডু একেবারে একা। ট্রেনের ওঠার পর তাই সময় কাটানোর জন্য কিম্পুরুষের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ গল্প করেছে পাণ্ডু। ওরা নাকি জাতিতে কিন্নর। আদি বাসস্থান কৈলাস পর্বতের আশপাশে। যে জায়গাটার কথা বলল, সেটা এখানকার হিমাচল প্রদেশে হবে বলে মনে হয়েছিল পাণ্ডুর। কিম্পুরুষ বলেছিল, ওদের রাজা হল কুবের। ওরা ভালো গাইতে পারে, নাচতে পারে। কিমিন্দম ঘড়ঘড়ে গলায় কী যে বলত, তা বোঝাই যেত না। কিম্পুরুষের কথা সুবেলা, স্পষ্ট বোঝা যায়। ও বলছিল, প্রতি রাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনশো নিরানব্বইটা আত্মাবাহী ট্রেন ছাড়ে পাতালের চেকপোস্টের দিকে। কিন্তু, মাত্র একটা ট্রেন যায় স্বর্গের দিকে। সেই ট্রেনের যাত্রী হল পুণ্যাত্মা। ইদানীং আত্মার সংখ্যা নাকি এত বেড়ে গিয়েছে যে, নতুন পাতাল বানানোর কথা উঠেছে। অনন্তসাগরের নীচে নাগলোকের কাছে। এই প্রথম নাকি বিশ্বকর্মা আর ময়দানব হাত মিলিয়েছেন। দু'জনে মিলে তাঁরা বত্রিশটা লোক তৈরি করবেন। সেটা যে কী অসাধারণ একটা সৃষ্টি হবে, তাই নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আলোচনা চলছে।

আর এক ঘন্টা পরেই...রাত দুটো উনচল্লিশ মিনিটে আপ মুক্তি এক্সপ্রেস নিয়ে কিম্পুরুষ চেকপোস্টে চলে যাবে। মাইকে ঘোষণা শুনতে শুনতেই পাণ্ডু এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোল। বৃষ্টিতে ওর সারা শরীর ভিজে গেল। কিন্তু, আশ্চর্য এক সুরভি বেরতে লাগল শরীর থেকে। ট্রেনে তুলে দেওয়ার সময় ওর হাতে পারিজাত ফুলের একটা মালা তুলে দিয়েছিলেন পরাশর মুনি। তারই সুগন্ধ বেরচ্ছে। মালাটা নিজের গলায় পরে নিয়েছে পাণ্ডু, যাতে কোথাও হারিয়ে না যায়। এমনিতে, স্বর্গ ছাড়া অন্য কোথাও এই ফুল পাওয়া যায় না। কিন্তু, একবার কৃষ্ণ নাকি স্বর্গে গিয়ে পারিজাত ফুলের গাছ চুরি করে এনেছিলেন। তার পর থেকে ইহলোক বাদে সব লোকে এই ফুল পাওয়া যায়। পাণ্ডুর খুব ইচ্ছে, শিসপাহাড়িতে ওর কোয়ার্টারের বাগানে পারিজাতের গাছ লাগাবে।

ভিজতে ভিজতেই পাণ্ডু ওয়েটিং রুমের কাছে এল। আগের বার গভীর রাতে জংশনে এসে মারাত্মক ঠান্ডায় ও হি হি করে কেঁপেছিল। কুন্তী ওর গা থেকে শাল খুলে দিয়েছিল। আজ কুন্তী পাশে নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাণ্ডু ওয়েটিং রুমের ভিতর

ঢুকে পড়ল। ওয়েটিং রুমে সেদিনকার মতোই গিজগিজে ভিড়। সদ্য দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসা সব আত্মা। ঘুমে ঢলে পড়ছে। ওদের জন্য পাণ্ডু করুণাবোধ করল। এক একজনকে একেক লোকে যেতে হবে। কেউ কেউ বহুদিন আগে ইহলোক ছেড়ে যাওয়া প্রিয়জনদের মুখোমুখি হবে। কষ্টের, খুবই কষ্টের সেই অনুভূতি। একটু বসার জন্য ওয়েটিং রুমের ভিতর জায়গা খোঁজার সময় হঠাৎ ও শুনল, ডাগতারবাবু, ইদিকে। তু মোর জায়গায় বোস ক্যানে।'

তাকিয়ে কোণের দিকে পাণ্ডু দেখতে পেল বুধিরাম উঠে দাঁড়িয়েছে। দু'হাত নেড়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বেঞ্চে ওর পাশে অল্পবয়সি একটা মেয়ে বসে আছে। মুখ নিচু করে থাকায়...মেয়েটা ওর বউ কি না পাণ্ডু বুঝতে পারল না। দু'জনের হাতেই হ্যান্ডকাফের মতো কী যেন পরানো। যাওয়ার দিন ঠিক ওই বেঞ্চেই পাণ্ডু বসেছিল কুন্তীকে নিয়ে। কথাটা ভেবে ফের ওর বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বুধিরামের দিকে এগোনোর সময় একবার ওর মনে হল, ছেলেটা মারা গিয়েছিল পরবের দু'দিন পর। ওর মুক্তি এক্সপ্রেসে ওঠার কথা অনেকদিন আগে। এতদিন যায়নি কেন? পাণ্ডু জিজ্ঞেস করল, 'তুই এখনও এখানে!'

বুধিরাম কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'আগেরবার মো যাই লাই রে ডাগতারবাবু। শয়তানের দূত য্যাখন মোকে আর চাঁপামণিকে ধরে নে যাইনছিল, ত্যাখুন পাইলে গিয়েনছিলাম।'

'চাঁপামণি কে?'

পাশে বসা মেয়েটাকে ঠেলা দিয়ে বুধিরাম বলল, 'হাই রে, বসে আছিস ক্যানে? ডাগদারবাবুকে গড় কর।'

শুনে চাঁপামণি উঠে শরীর ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানাল।

পাণ্ডু বলল, 'থাক থাক। তোরা কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলি, বললি না তো?'

বুধিরাম বলল, 'মো আর চাঁপা শিসদ্যেবতার মন্দিরে ঢুইকে লুক্কে ছিলাম।'

এইবার চিত্রটা পরিষ্কার হতে লাগল পাণ্ডুর কাছে। শয়তানের দূত মানে...কিমিন্দম। জঙ্গলে ওদের দু'জনেকে কোথাও রেখে হয়তো অন্য আত্মাদের আনতে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে বুদ্ধি করে ওরা দু'জনে শিসদ্যাবতার মন্দিরে লুকিয়ে পড়ে। হয়তো মন্দিরের ভিতর ঢোকার অনুমতি কিমিন্দমের নেই। অথবা খেয়াল করেনি মোট ক'জন আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে ওঠার সময় গুনতে গিয়ে সম্ভবত ও আবিষ্কার করে দু'জন কম। আর সেই দু'জনকে খুঁজতে গিয়ে ছাইগাদার নীচে কিমিন্দম ওকে আর কুন্তীকে দেখতে পায়। ওকে বুধিরাম আর কুন্তীকে চাঁপামণি ভেবে নিয়ে কিমিন্দম দু'জনকে মুক্তি এক্সপ্রেসে তুলে দিয়েছিল। ভ্রান্তিবিলাসের আসল কারণটা তা হলে এই!

যত তাড়াতড়ি সম্ভব, ওকে শিসপাহাড়িতে ফিরতেই হবে। সকাল হওয়ার আগে তার কোনও উপায় নেই। ওয়েটিং রুমে বসে চাঁপামণি আর বুধিরামের সঙ্গে গল্প করতে লাগল পাণ্ডু। তখনই জানত পারল, চাঁপামণির সঙ্গে বুধিরামের নাকি অনেক দিনের প্রেম। কিন্তু, চাঁপামণির পেটে ঘা হয়েছিল বলে বুধিরামের মা ওকে পছন্দ করত

না। মায়ের চাপে পদ্মমণিকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল বুধিরাম। এরই মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর চাঁপার উপর কুনজর পড়ে বস্তিরই ছেলে বাপটুর। হাসপাতালে একদিন চাঁপাকে রেপ করে সে জঙ্গলে পালিয়ে যায়... এই পর্যন্ত শোনার পর পাণ্ডুর মনে পড়ল চাঁপাকে। আরে, এই মেয়েটার রেপ নিয়েই তো তখন খুব হই-চই হয়েছিল। পেটে টিউমার নিয়ে মেয়েটা হাসপাতালে ভর্তি ছিল। পরে ধরা পড়ে, টিউমারটা ম্যালিগনেন্ট ছিল।

সিস্টার ফুলমণির মুখে পাণ্ডু শুনেছে, বাপটু বলে ছেলেটাকে শুক্তিমতি নদীর চড়ায় মৃত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। সিস্টার আরও বলেছিলেন, ওর লিঙ্গ নাকি কেটে নিয়েছিলেন শিসদ্যাবতা। শুনে তখন বিশ্বাস হয়নি। সত্যিটা কী, জানতে চাওয়ায় বুধিরাম আঁতকে উঠে বলল, 'না ডাগতারবাবু শিসদ্যাবতা লয়। বাপটুর উপর মোর ইতো গুসসা হইয়েনছিল, কুন কইরে উয়ার লিঙ্গ মো কেটে লিয়েনছিলাম। সি সময় চাঁপাও মোর সনে ছিলক। মো জানি, কামটো ভালো করি লাই। পাদরি সাহেব কইল, উ পাপে মোকে লরক যেইতে হবেক। মোর কঠিন সাজা হবেক।' কথাগুলো বলে কাঁদতে লাগল বুধিরাম।

নরকে ও যেতে চায়নি। সে জায়গাটা নাকি ভয়ানক। গির্জার পাদ্রী সাহেবের কাছে নরকের ভয়াবহ বর্ণনা শুনে এসেছে বুধিরাম। তাই তখন পালানোর কথা ভেবেছিল। এবার আর পালনোর উপায় নেই। শয়তানের দূত দু'জনকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিয়েছে। বসে বসে একটু আগে চাঁপাকে ও বলেছে, নরকে যেখানেই ওদেরে নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, দু'জনে কখনও আলাদা হবে না। একসঙ্গে শাস্তিভোগ করবে। শুনে পাণ্ডুর মনটা ভরে গিয়েছে। কী গভীর প্রেম দু'জনর মধ্যে! পরক্ষণেই ওর মনে হল, ভুলটা ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার। তাই বলল, যা ভাবছ, তা হবে না বুধিরাম। মুক্তি সোপান থেকে ওঁরা তোমাদের আলাদা করে দেবেন।'

সেই রাতে কিমিন্দম সবাইকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আজ ওয়েটিং রুমের দরজা খুলে কিম্পুরুষ হাঁক দিল, 'ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। শুনতে পাচ্ছ, ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে? সবাই ট্রেনে গিয়ে বোসো।'

হুড়মুড় করে সব আত্মা ওয়েটিং রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বেঞ্চ ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল পাণ্ডু। সুচন্দ্রার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে ও এক অদ্ভুত গ্লানিতে ভুগছে। সুচন্দ্রা সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতা করছে কি না, সেটা তখন ওর যাচাই করা উচিত ছিল। আসলে সুচন্দ্রা যে মিথ্যে কথা বলতে পারে, সেট ওর মাথাতেই আসেনি। মা যে এই রকম একটা নোংরা চাল দেবে, পাণ্ডু ভাবতেও পারেনি। সুচন্দ্রার কথায় বিশ্বাস করে, ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে পরদিন ভোরে ও চলে গিয়েছিল মেদিনীপুরের হাসপাতালে। ছুটিতে পুরুলিয়ায় গেলে মা সব সময় ওকে বাড়তি দু'তিনটে দিন ধরে রাখত। আশ্চর্য, সেবার কিন্তু মা ওকে অতিরিক্ত একটা দিনও থাকতে বলেনি।

মায়ালোকে সুচন্দ্রাকে টার্মিনাল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল পাণ্ডু। যাওয়ার আগে ও বলে

গেল, 'আমি শুনেছি, ইহলোকে তোদের ফিরতে হবে। কথা দে, কুন্তীকে তুই বিয়ে করবি। ওর অতীত নিয়ে মাথা ঘামাস না পাণ্ডু। তোরা সুখী হলে আত্মা শান্তি পাবে।'

টার্মিনাল থেকে ফেরার পরে সুরোর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল পাণ্ডুর। অসন্তুষ্ট মুখে ও বলেছিল, 'তুই ছিলিস কোথায় রে? মায়ালোকপালের সঙ্গে এতক্ষণ ঝগড়া করে এলাম তোর জন্য। আর তোর পাত্তাই নেই?'

পাণ্ডু বলেছিল, 'সুচন্দ্রা দেখা করতে এসেছিল।'

'তোদের ভুল বোঝাবুঝি তা হলে মিটছে। যাক বাবা, এখন কাজের কথায় আসি। শোন, তোর ইহলোকে ফেরার টিকিট আমি আদায় করে এনেছি। এই নে সেই টিকিট। চেকপোস্টে দেখাবি। ওই সময় ডিউটিতে থাকবেন পরাশর মুনি। জানিস তো উনি কে? বেদ রচয়িতাদের একজন...কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের বাবা। এই টিকিট দেখালেই উনি তোকে ডাউন মুক্তি এক্সপ্রেসে উঠতে দেবেন।'

পাণ্ডু বলেছি, 'থাংকস, সুরো, তুই আমাকে বাঁচালি।'

সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল সুরোর। বলেছিল, 'থাংকস জানানোর দরকার নেই। একটা কথা তোকে বলি, শিসপাহাড়িতে যা অবস্থা, তাতে মনে হয়, এক্ষুনি তোর ফিরে যাওয়া উচিত।'

'কেন কী হয়েছে শিসপাহাড়িতে?'

'লোকপালের দফতরে বসেই পর্দায় দেখছিলাম, শিসপাহাড়িতে সবাই ধরে নিয়েছেন, তুই আর বেঁচে নেই। তোর স্থূল শরীরটাকে ওঁরা দাহ করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। কাল সকালেই তোর শরীর ওরা মর্গে পাঠাবেন। দাহ করার আগে তুই যদি শিসপাহাড়িতে পৌঁছাতে না পারিস, তা হলে কিন্তু আর মনুষ্যদেহ ফিরে পাবি না। তোকে ইহলোকেই ঘুরে বেড়াতে হবে। আর একটা কথা, কুন্তী কিন্তু তোর আগেই শিসপাহাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে। তুই ওর কোয়ার্টারে গেলে দেখা পাবি।'

পাণ্ডু যখন শিসপাহাড়িতে পৌঁছল, তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে ঘন ঘন আলোর ঝলকানি, আর তার পর বাজ পড়ার ভয়াবহ শব্দ। চারদিক এমন অন্ধকার হয়ে এসেছে যে, দু' হাত দূরেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হাসপাতালের গেটের কাছে এসে পাণ্ডু জোসেফের দোকানের দিকে তাকাল। দেখল, শুধু ওরটাই নয়, সব দোকানপাঠ বন্ধ। রাস্তাতেও কোনও লোকজন নেই। হাঁটতে হাঁটতে পাণ্ডু প্রথমে ইমার্জেন্সিতে ঢুকল। ডাঃ দশরথ সেখানে নেই। একটু হতাশ হয়েই তার পর ও আউটডোরে গেল। এই সময়টায় পেসেন্টদের ভিড় থাকার কথা। কিন্তু, কেউ নেই। হলঘর একদম ফাঁকা। স্বাভাবিক, এই দুর্যোগে কে-ই বা হাসপাতালে আসার ঝুঁকি নেবে? নার্সদের রুমে গিয়ে সিস্টার ফুলমণিকে দেখতে পেল না পাণ্ডু।

ফের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনে এসে পাণ্ডু ঠিক করতে পারল না, আগে কোনদিকে যাবে। ডানদিকে মর্গ, আর বাঁদিকে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট। সুরোর কথা মনে পড়ায় ও মর্গের দিকেই এগোল। ঘরে মাত্র একটাই লাশ শোয়ানো রয়েছে। মুখ থেকে চাদর সরিয়ে মৃতদেহটা দেখে ও চমকে উঠল...শম্ভুদার! তখনই চোখ খুলে

শম্ভুদা ওকে বলল, 'ডাগদার, তু এসেছিস? শুন বটে, শিগগির এনআইসিইউতে চলি যা। উরা কইনছিল তুর বডি শুক্তিমতি নদীর ধারে লিয়ে যাবে।'

তার মানে...ওর দেহ এখনও দাহ করা হয়নি। ওর স্থূল শরীরটা তা হলে এনআইসিইউতে আছে! শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হল পাণ্ডু। ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কবে ফিরে এলে শম্ভুদা?'

'কাইল রেতে। আদ্দিন লাশপুরের জঙ্গলে মোর বডি পড়ে ছিলক। লীচের দিগটা ভাম খেয়ি লিছে। উপরের দিগটা পুলিশ কাইল হাসপাতালে লিয়ে এসেনইছে। মোর কথা শুনতি হবেক লাই ডাগতার। তু যা বটে, সময় লষ্ট করিস লা।'

শুনে খুব মন খারাপ লাগল পাণ্ডুর। মর্গ থেকে বেরিয়ে দ্রুত এনআইসিইউতে গিয়ে ও দেখল, বেডে ওর স্থূল শরীরটা শুয়ে আছে। বেডের আশেপাশে চিকিৎসার নানরকম সরঞ্জাম। দেখেই ও বুঝতে পারল, লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছিল। এখনও তা খুলে ফেলা হয়নি। বেডের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সিস্টার ফুলমণি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন অপরিচিত এক মহিলা। তাঁর গলায় স্টেথিসকোপ। হাসপাতালের নতুন জয়েন করেছেন বোধ হয়, ভদ্রমহিলা বললেন, 'চেষ্টা তো আমরা অনেক করলাম ফুলমণি। ভগবান না চাইলে আমরা কী করতে পারি?'

ফুলমণি আক্ষেপ করার ভঙ্গিতে বললেন, 'ভগবান লাই রে চপলা দিদিমণি। শিসদ্যাবতা বুইলেও কেউ লাই। সব বুজরুকি। আর বিশ্বাস লয় বে। শিসদ্যাবতা আর মারাংবুরুর থানে গে অ্যাতো করি কইয়ে আলাম, মোকে লিয়ে যা তুরা। মোর বদলি পাণ্ডু ডাগতারবাবুরে বাঁচাই দে। কুনও ফল লাই? মো ঠাকুর দ্যাবতার সব ছবি নদ্দমায় ফেলি দিবঅ। আইজ থেইকে ঠাকুর দ্যবতা মো মানবক লাই।'

সিস্টার ফুলমণির কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শব্দ করে বাজ পড়ল। চমকে উঠে চপলা দিদিমণি বললেন, 'এ সব কথা বলতে হয় না ফুলমণি। ঠাকুর পাপ দেবে।'

কাছে দাঁড়িয়ে দু'জনের কথোপকথন শুনে বেশ মজাই পাচ্ছিলেন পাণ্ডু। এতদিন সিস্টার ফুলমণি কথা শুরু করতেন শিসদ্যাবতার মাহাত্ম্য দিয়ে। শেষ করতেন মারাংবুরুর আশীর্বাদ চেয়ে। আজ বলছেন, ঠাকুর দ্যাবতার ছবি নর্দমায় ফেলে দেবেন! মানুষের অন্ধবিশ্বাস এই ভাবেই বোধ হয় ভাঙে। শিসপাহাড়ির রহস্যময়তার কথা সিস্টার ফুলমণির কাছে শুনতে শুনতে অনেক সময়ই পাণ্ডু ভেবেছে, একদিন না একদিন অলৌকিক কিছু ওর চোখে পড়বেই। ভেবে ওর হাসি পেল, ও নিজেই আজ আপার্থিব কিছু করে দেখাবে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ...ঝড়-বৃষ্টি ... প্রেক্ষাপট সাজানোই আছে। শুধু ঠিক সময়ে মঞ্চে হাজির হওয়ার অপেক্ষা। তার পর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে শিসদেবতার মহিমার কথা!

বাইরে ফের সশব্দে বাজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কোনও কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেল পাণ্ডু। বোধ হয় বাগানে কোনও গাছ ভেঙে পড়ল। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে সিস্টার ফুলমণির মুখ। শিসদ্যাবতাকে একটু আগে তিনি গাল দিয়েছেন। তাই

বোধ হয়, শিসদ্যাবতা রোষ দেখাচ্ছেন। কী সর্বনাশ হল, তা দেখার জন্য ওঁরা দু'জনেই জানলার কাছে ছুটে গেলেন। সেই সুযোগে পাণ্ডু বিছানায় উঠে গিয়ে নিজের শরীরে মিশে গেল। জানলার কাছ থেকে সরে এসে মনিটর দেখে প্রথমে চিৎকার করে উঠলেন চপলা দিদিমণি, 'ফুলমণি, তোমার শিসদেবতার কী মহিমা দাখো, ডাক্তার পাণ্ডু রেসপন্ড করেছেন! কী আশ্চর্য তাই না? দেখলে তো, মানুষ যদি মন থেকে ডাকে, ভগবান তা হলে সাড়া দেন।'

দু'জনেই দ্রুত পায়ে হেঁটে এলেন বেডের সামনে। সেই মুহূর্তে চোখ খুলে পাণ্ডু বলল, 'এক কাপ গরম কফি পাওয়া যাবে মাদার ফুলমণি? বৃষ্টিতে খুব ভিজেছি।' কথাগুলি বলতে বলতে ও উঠে বসল।

আনন্দে কেঁদে ফেললেন সিস্টার ফুলমণি। আগে মাদার ফুলমণি বলে ডাকলে উনি রেগে যেতেন। বলতেন, একজনই মাদার সম্বোধনের যোগ্য। আর তিনি হলেন মাদার টেরিজা। কিন্তু আজ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুলমণি বললেন, 'তু ফের মোকে মাদার বইলে ডাইকছিস ডাগদার? ডাক, ডাক ক্যানে...তুর যা ইচ্ছো বুলি ডাক। আর তুকে লা বইলব লা।'

চপলা দিদিমণি এগিয়ে এসে হাসিমুখে বললেন, 'সুপার সাহেবকে আগে খবরটা দেওয়া যাক। কী বলেন ডাঃ পাণ্ডু?'

পাণ্ডু হেসে বলল, ' না আগে কুন্তীকে খবরটা দিন। মায়ালোক থেকে পারিজাত ফুলের এই মালা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সবার আগে এই মালাটা ওকে পরিয়ে দিতে চাই।'